1950

926

937
P.926

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

সম্পাদক

দিলীপকুমার বর্ম

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

একত্রিংশ বর্ষ

—এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা—

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সভাপতি)
অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী
অধ্যাপক শ্রীসুনীতকুমার ইন্দ্র
শ্রীদিলীপকুমার কর (সম্পাদক)
শ্রীজয়ন্তপ্রসাদ মৈত্র
শ্রীবংগেন্দু গংগোপাধ্যায়

ছবিব ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রডাকসন সিন্‌ডিকেট
অন্যান্য মুদ্রণ—দি মডার্ণ আর্ট প্রেস
কাগজ সরবরাহ—ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ

Vol. 31

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

মাঘ, ১৩৫৬ :: একত্রিংশ বর্ষ :: ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০

শ্রীদিলীপকুমার কর কর্তৃক সম্পাদিত

সূচী

	পৃষ্ঠা
শুভকামনা	১
কলেজ প্রসংগ	২
ভারতের মুক্তি-সাধনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদান	৯
বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	১৫
আধুনিক বাঙলা কবিতার সম্ভাবনা	২০
রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"	২৪
সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতা	২৯
দু'দিন [গল্প]	৩১
প্রকৃতির নির্বাসন	৩৬
সামান্য একটু মরিচ্ [গল্প]	৪১
আধুনিক ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্ণচন্দ্র	৪৪
আড্ডাধারী সুকুমার	৫০
ইন্‌ট্রোভার্ট [কবিতা]	৫৭
যুগজয়ী [কবিতা]	৫৯
গ্রন্থ সমালোচনা	৬১
আমাদের কথা	৬৪
সম্পাদকীয়	৭৪

THE EDITOR'S GREETINGS	1
THE LIBERAL IDEAL	2
COSMIC RAYS	7
SIR JEHANGIR COYAJEE	11
BENOY SARKAR AS AN EXPONENT OF YOUNG INDIA	14
OIL AND THE MIDDLE EAST	24
"THE WASTE LAND"	28
CULTURAL FELLOWSHIP-BRAJABULI	29
ECONOMICS—OLD AND NEW	32
ASOKA AND THE DOWNFALL OF MAURYYA EMPIRE	39
IN SUPPORT OF THE UNITED NATIONS	45
THE METAPHYSICAL SCHOOL OF ENGLISH POETRY	49
A WEEK OF HISTORICAL CONFERENCES AT DELHI	52
ADDRESS	57
ENGLISH SEMINAR	58
BOOK REVIEWS	59

চিত্র-সূচী

"ওরা কাজ করে·····", "····· প্রতিদিন মোর দেহলিতে·····", অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্রাবস্থায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ, "···উত্তর-জোড়া তুষার চূড়ায়·····", "সমাধি-মন্দির এক ঠাঁই রহে চিরস্থির·····"।

College Union Council (1948-49)
Social Service League (1948-49)
They met the British Debating Team
Presidency College Athletic Committee (1948-49)
Presidency College Hockey Team—1949
Sir Jehangir Coyajee
Professor Benoy Kumar Sarkar
Farewell Gathering

বিজ্ঞাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য চাঁদার হার :—

ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল নিয়ে)	২৷৷০ টাকা
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—	১৷৷০ ,,
ভারতের বাইরে	৪ শিলিং

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক বা কলেজ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে রচনা আহ্বান করা হচ্ছে সাদরে। সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী এবং এই কলেজ ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত পত্রাদি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। উপযুক্ত ডাক-টিকিট-যুক্ত শিরোনামা-লিখিত লেপাফা সংগে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা কাগজের একপিঠে লিখে "সম্পাদক, প্রে. ক প"এর নামে পাঠাতে হবে। রচনা সংগে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা পাঠাতে হবে।

পত্রিকা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশনা বিভাগের সম্পাদকের সংগে পত্রালাপ চলবে।

ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে
(রবীন্দ্রনাথ)

অংকনকাল :—দেড় মিনিট
স্থান :—সমুদ্রতীর গোপালপুর

শিল্পী —শ্রীনন্দলাল বসু

(শ্রীত্রিদিবকুমার কবির সৌজন্যে)

"·····প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছে আলিপনা। প্রতিসন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধ-তৈলে জ্বালায়েছি দীপ।·····"

(রবীন্দ্রনাথ)

শিল্পী—শ্রীঅশোক কৃষ্ণ দত্ত
ষষ্ঠ বর্ষ, আর্টস।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

মাঘ, ১৩৫৬ ঃঃ একত্রিংশ বর্ষ ঃঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০

শুভকামনা

অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ

এই পত্রিকার একত্রিংশ বর্ষ পূর্ণ হইল। যে ঐতিহ্য, যে সাধনা ও যে আদর্শবাদ এই পত্রিকাখানিকে এতদিন সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা চিরদিন অক্ষুন্ন রহুক।

এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ যুগযুগ ধরিয়া যে জ্ঞান ও মনীষার বর্তিকা জ্বালিয়া বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ ও সমগ্র বিশ্ব আলোকিত করিয়াছেন, তাহার মহিমা ও মর্যাদা আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই।

সমাজে, রাষ্ট্রে ও জগতে বিভিন্ন চিন্তার ধারা, বিভিন্ন আদর্শবাদের সংঘাত, বিভিন্ন কর্ম্মপ্রবাহ যতই আলোড়ন বহিয়া আনুক, বহুবৈচিত্রময়, বহু কল্পনাময় তারুণ্যের চাঞ্চল্য যতই প্রবল হউক, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় রত অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দের সমগ্র শক্তি সর্ব্বদা ও সর্বতোভাবে একাগ্র ও একনিষ্ঠ রহিবে, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

স্বল্প অপেক্ষা ভূমাকে, কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবকে, ক্ষনিক অপেক্ষা চিরন্তনকে, মোহ অপেক্ষা সত্যকে, কৌতুক অপেক্ষা জীবনকে যেন আমরা চিরদিন গ্রহণীয় ও বরণীয় মনে করি।

কলেজ প্রসংগ

(রচনা ও নির্বাচন : সম্পাদক, প্রে. ক. প.)

কলেজ পত্রিকা

সরকারী দপ্তরে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার নাম আছে ত্রৈমাসিক হিসাবে কিন্তু গত কয়েক বৎসর ধরেই পত্রিকার পর পর দুটি সংখ্যার প্রকাশের মধ্যে কালগত ব্যবধান এক বৎসরে এসে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধকালীন সরকারী ব্যয়-সংকোচ নীতির বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে কলেজ পত্রিকা যখন নব কলেবর নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করল, তখন সকলেই আশা করেছিলেন যে পত্রিকা-প্রকাশনার কাজ হয়ত ধীরে সুস্থে পূর্বের নিয়মে ফিরে আসবে। তা যে কেন সম্ভব হয়নি তার বিস্তৃত কারণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পূর্বের তুলনায় কাগজ এখন অনেক দুর্মূল্য, (এবং দুষ্প্রাপ্য) তা ছাড়া মুদ্রনও বহুগুণ ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। তাই পূর্বের উৎকর্ষ বজায় রেখে বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশ করা প্রচলিত আর্থিক বরাদ্দ মতে একেবারেই অসম্ভব—শুধু অসম্ভব নয়, অচিন্তনীয়। তাছাড়া, ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের পত্রিকাকে "বিশেষ ক্ষেত্র" বিবেচনা করে সরকার থেকে যখন পুনঃপ্রকাশনার অনুমতি আসে তখন যে সমস্ত মত আমাদের মেনে নিতে হয়েছিল তার মধ্যে একটি প্রধান—পত্রিকার আয়তন একশ' চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং ছয়'শ তিরিশ পাউণ্ডের বেশী প্রত্যেক সংখ্যায় কাগজ খরচ করা যাবে না। বর্তমানে প্রকাশনা-ব্যাপারে ছাত্র-সংসদের কর্তৃপক্ষ যে অর্থ মঞ্জুর করেন, তাতে অবশ্য এই সর্তটি মেনে না চলাটাই কঠিন। এ কথা না মেনে উপায় নেই যে পূর্বের মতো বৎসরে একাধিক সংখ্যা প্রকাশ করতে হ'লে পত্রিকা-বাবদ ছাত্র পিছু কমপক্ষে আরও দুই টাকা ধার্য হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলবার আছে। সংসদের বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রদত্ত অর্থের সুবণ্টন হয়নি। 'রবীন্দ্র পরিষদ' ও 'বিরাম পীঠিকা' এই বিভাগ দু'টির অনুষ্ঠান-প্রাচুর্য এবং ব্যয় বাহুল্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন কিছু বেশী বটে, কিন্তু মঞ্জুর অর্থের চেয়ে অনেক অল্পতেই সংযতভাবে কর্ম পরিচালনা করলে এ দুটি বিভাগের অনুষ্ঠান কর্মসূচী অনাড়ম্বর সম্পূর্ণতার সাথে সমাপন করা যায়—নাট্য বিভাগ পক্ষেও একথা প্রযোজ্য। এই বিভাগগুলিতে নিপুণতাহীন অর্থপ্রদানে যে অর্থসংকোচের সৃষ্টি, তাতে প্রকাশনা বিভাগকে অত্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় যে গৌরবময় ঐতিহ্য পাঠক-সমাজে আমাদের যশ এবং খ্যাতির অধিকারী করেছে সেই ঐতিহ্যকে অনির্বান এবং অব্যাহত রাখতে হলে উপযুক্ত আর্থিক বরাদ্দের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহ (১৯৪৯ ও ১৯৫০)

১৯৪৯ সালের প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ছাত্র-সংসদের সাধারণ বিভাগ এবং সান্ধ্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট গায়ক এই অনুষ্ঠানে

অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতিত্বের কাজ পরিচালনা করেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহে দুইটি 'প্রদর্শনী' খেলা হয়। প্রাক্তন এবং বর্তমান ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বিশেষ করে উপভোগ করা গিয়েছিল ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকদের একটা 'প্রদর্শনী' টেনিস খেলা। খেলায় অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন জনাব আবদুল ওয়াহেব মহ্‌মুদ এবং শ্রীভূপেশ মুখোপাধ্যায়, ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীনলিনী মজুমদার। সিংগল্‌স প্রতিযোগিতায় অধ্যাপক মহ্‌মুদ শ্রীনলিনী মজুমদারের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন।

এবছর ১২ই জানুয়ারী থেকে আরম্ভ করে ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলেজের ১৩৩-৩ম প্রতিষ্ঠাতৃ সপ্তাহ উদযাপিত হয়। ১৩ই জানুয়ারী স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছাত্র ও অধ্যাপকদের মিলিত সভায় একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৪ই প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটি ক্রিকেট খেলা হয়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের 'ইন্দিরা'য় একটি সবাক্ চিত্র দেখান'র ব্যবস্থা করা হয় ১৪ই সকালে। ১৯শে বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ নিজেদের প্রদর্শনীয় আয়োজন করে। ২০শে তারিখে কলেজের ফিজিক্স থিয়েটারে সম্বাৎসরিক সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী অন্যবারের মতো এবারেও একটী সুলিখিত কলেজ 'প্রাসঙ্গিকী' পাঠ করে শোনান। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় স্বর্গত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (১৯৪৯ ও ১৯৫০)

১৯৪৯ সালের বাৎসরিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই জানুয়ারী তারিখে। কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার বিতরন করেন শ্রীযুক্তা সেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীবিনয় সিং সে বছর ব্যক্তিগত 'চ্যাম্পিয়ানশিপ' লাভ করবার গৌরব অর্জন করেন। প্রতিযোগিতা অন্তে শ্রীনরেন বসাক এবং শ্রীবিনয় সিংকে যথাক্রমে ক্রিকেট এবং হকি "ব্লু" দেওয়া হয়। গত ১২ই জানুয়ারী এ বছরের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীকুলদাচরণ দাসগুপ্ত এবং পুরস্কার বিতরন করেন শ্রীযুক্তা জে, ঘোষ। এবার ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করবার সম্মান অর্জন করেছেন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীসন্তোষ কর্মকার। এবার প্রতিযোগীরা অন্যবারের মতো উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারে নি।

কলেজে রিপাব্‌লিক দিবস উদযাপন

গত ২৬শে জানুয়ারী সকালে "রিপাবলিক দিবস" উপলক্ষ্যে ছাত্র এবং অধ্যাপকগণ কলেজের আর্টস-বাড়ির ছাতে সমবেত হ'ন। প্রার্থনা এবং জাতীয়-সঙ্গীত-এর পর

অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সন্ধ্যায় আলোক-মালায় কলেজ-প্রাঙ্গণ সুশোভিত করা হয়।

ছাত্র-সংবাদ

ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা এবার আমাদের কলা বিভাগে ৩২৪, বিজ্ঞান বিভাগে ৮৫৪, একুনে ১১৭৮। বিভিন্ন স্নাতকোত্তর শ্রেণীগুলিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ৭৩।

পঠন-পাঠনার মন নির্ধারিত হয় একালে পরীক্ষার ফল দিয়ে। 'ফলেন পরিচীয়তে' মান-দণ্ড ধরে বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের ছাত্ররা প্রতি বৎসরের মতো এবারেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায়। মধ্য পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ও কলা শাখার শীর্ষস্থানের অনেকগুলিই আমাদের পরীক্ষার্থীরা অধিকার করেন। বিজ্ঞানের মধ্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান এবং প্রথম দশটির মধ্যে আরও তিনটি স্থান আমাদের ছাত্রদের দখলে এসেছিল। উপাধি পরীক্ষায় আমাদের ছাত্ররা অর্থনীতি, ইতিহাস, বাংলা ও উর্দু বিষয়গুলিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন। এ ছাড়া রসায়ন-শাস্ত্র, শারীর বিজ্ঞান ও রাশি বিজ্ঞান বিষয়গুলিতে আমাদের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সম্মান পেয়েছেন। ১৮৪৯ সালের এম্. এ. এবং এম্ এসসি. পরীক্ষায় অনেকগুলি বিষয়েই আমাদের কলেজের ছাত্ররা প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমাদের পরীক্ষোত্তীর্ণদের শতকরা সংখ্যানুপাত অন্য যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী।

আমাদের অভাব-অভিযোগ

প্রতি বৎসরই কলেজ পত্রিকার মারফৎ এবং ছাত্র-সংসদের তরফ থেকে আমাদের ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য কিছুমাত্র ঘোচেনি। দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী এই মহাবিদ্যালয়ে এমন একটি ঠাঁই নেই যেখানে ছাত্ররা একসঙ্গে কোন উপলক্ষে মিলিত হতে পারেন। তা ছাড়া যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-সংখ্যা হাজারের বেশী, সেখানে আমাদের বর্তমান স্বল্প-পরিসর বিরাম-পীঠিকার অনুপযোগিতা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে মনে হয় না। আর্টস লাইব্রেরী হলে গল্পরত ছাত্রদের সংখ্যাধিক্যের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তাঁর মূলে আছে বিরাম-পীঠিকায় স্থানাভাব। বিরাম-পীঠিকায় পত্রিকার এবং সাময়িকীর অপ্রচুর পরিবেশন হয়ত তার আর একটি কারণ। যে কোন আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিরাম-পীঠিকার সংলগ্ন একটা ছোটখাটো লাইব্রেরীর ব্যবস্থা থাকা দরকার। কর্তৃপক্ষকে এই কথা বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বভার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর রইল।

এম. এ. ও এম. এসসি. ক্লাসের ছাত্রদের এই কলেজ মারফৎ পড়বার জন্যে যথাক্রমে পাঁচ টাকা এবং ছয় টাকা বেশী দিতে হয়। সরকারী নিয়মে বৃত্তি নিয়ে যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁদের (কি মধ্য কি উপাধি শ্রেণীতে) কলেজে মাইনে দিতে হয় না। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতকদের বেলায় এই নিয়ম না খাটবার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন

করবার অবকাশ আছে। তা ছাড়াও, বেশী মাইনের পরিবর্তে যখন কলেজে বিশেষ শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা নেই (যে ব্যবস্থা আগে ছিল) তখন অতিরিক্ত কয়েকটি টাকা যা মাইনে হিসেবে নেওয়া হচ্ছে তা কি জবরদস্তিরই সামিল নয়? আমাদের বক্তব্য এই: হয় আরও কয়েকজন অধ্যাপক নিযুক্ত করে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হোক, নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের যে মাইনে দিতে হয় এখানে তার চাইতে মাত্র দু-এক টাকা বেশী নিয়ে কলেজের আনর্স উপাধিধারীদের অন্ততঃ কলেজের সংগে সংশ্লিষ্ট ছাত্র হিসাবে পড়বার সুযোগ দেওয়া হোক।

আমাদের লাইব্রেরী দেশের সব-সেরা লাইব্রেরীগুলির মধ্যে একটি। কিন্তু লাইব্রেরীর বর্তমান অবস্থা প্রতিষ্ঠানের গৌরব বর্ধন অথবা সংরক্ষনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। লাইব্রেরীর বই বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে আসবাব বাড়ানর ব্যবস্থা যে দরকার এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ যথেষ্টভাবে সচেতন নন। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, কিন্তু লাইব্রেরীর বরাদ্দ বাড়ান'র কোন বন্দোবস্ত না থাকায় বহু বিভাগে বহু বিষয়ে অত্যাবশ্যক বইপত্র কেনা হচ্ছে না। ফলে অধুনা অপরিহার্য্য কায়িক উপবাসের সঙ্গে সারস্বত কর্মীর মানসিক উপবাসও অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। সকালে ও সন্ধ্যায় এবং ছুটির দিনে লাইব্রেরী ব্যবহারের কোন সুযোগ না থাকাটা যে কোন আদর্শ শিক্ষামন্দিরের পক্ষে একটা লজ্জার কথা। কিছু কর্মচারী নিয়োগ করলেই কিন্তু এ অসুবিধা ঘুচে যেতে পারে। যে সমস্ত জিনিষগুলির ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সরকারী ব্যয় সংকোচের ক্ষেত্র যে সেগুলি নয় এ সত্য কর্তৃপক্ষ কবে বুঝবেন!

কলেজের পঠন-পাঠনের ঘরগুলির আসবাবপত্র যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যুগে তা একেবারেই অচল। পূর্ববর্তী এক সম্পাদক হেলান দিয়ে বসবার উপযুক্ত ডেস্কের প্রচলন করবার আবেদন জানিয়েছিলেন। অন্ততপক্ষে যে ঘরগুলিতে "সাধারণ ক্লাস" (কক্ষ নম্বর ১, ৩, ২২) হয় সেগুলিকে 'আদর্শঘর' হিসাবে এই নতুন প্রথার প্রবর্তন করা আশু দরকার।

ছাত্র-সংসদ-সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্যে একটি ঘরের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে পদে পদে। তা ছাড়া কলেজ পত্রিকার কাজ-কর্ম এত বেশী যে এর জন্যে আর্টস লাইব্রেরী সংলগ্ন একটা কুঠুরী পেলে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মিত ভাবে কাজ হতে পারে।

"প্রেসিডেন্সি কলেজ রেজিষ্টার" আমাদের একটা গৌরবের জিনিষ। ১৯২৭ সালের পর এর আর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। কলেজের গ্রন্থাগারিক ও কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক যাতে চেষ্টা করে বর্তমানোপযোগী করে তুলতে পারেন তার জন্যে আবেদন জানাচ্ছি।

অধ্যাপকমণ্ডলীতে পরিবর্তন

সম্প্রতি পাঁচজন অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করেছেন—ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসোমনাথ মৈত্র, গণিত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক প্রধান শ্রীচারুশশী চট্টোপাধ্যায় এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। অধ্যাপক মৈত্রের অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ পরিমার্জিত রুচি এবং সর্বোপরি তাঁর বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত সামাজিক গুণাবলী তাঁর সহকর্মী এবং ছাত্রবন্ধুদের অন্তরে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে। গণিতশাস্ত্রের অধ্যপনায় অধ্যাপক দাসের মতো কৃতকার্য্যতা অর্জন করেছেন এমন লোক খুব বেশী নেই। অধ্যাপক চক্রবর্তীর অধ্যাপনা-নৈপুণ্য সর্বজনবিদিত। বহু বৎসর ধরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের গণিত, জ্যোর্তি-বিজ্ঞান এবং রাশিবিজ্ঞান বিভাগের সংগে প্রত্যক্ষভাবে এবং অপরিহার্য্যভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সস্নেহ এবং সহৃদয় ব্যবহার ভুলবার নয়। প্রতিষ্ঠার সংগে অধ্যাপনা করে ছাত্র ও অধ্যাপকদের শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্জন করেছিলেন দর্শন বিভাগের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়। অধ্যাপক মজুমদার নিষ্ঠাবান অধ্যাপক এবং ইডেন ছাত্রাবাসের তত্ত্বা-বধায়করূপে দীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছেন। এঁদের স্থান সহজে পূরণ হবার নয়।

ইংরাজী বিভাগেয় প্রধান অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেছেন শ্রীতারকনাথ সেন। তরুণ অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার সেন সেণ্ট্রাল ক'লকাতা কলেজ থেকে সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের ইংরাজী বিভাগে যোগ দিয়াছেন। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলীতে কোন পরিবর্তন হয়নি। দর্শন বিভাগের অধ্যাপক-প্রধান শ্রীচারুশশী মুখোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করায় তার স্থান পূরণ করেছেন প্রথিতযশা দার্শনিক শ্রীসরোজকুমার দাস। এই বিভাগে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষাল সেণ্ট্রাল কলিকাতা কলেজে বদলী হয়েছেন। সেই সূত্রে অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সিনয়র এডুকেশনাল সার্ভিসে পদোন্নোতি হয়েছে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের স্থানে এসেছেন হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ। অধ্যাপক শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহের সাময়িক অনুপস্থিতির ফলে এই বিভাগের একটি অধ্যাপক পদে কাজ করছিলেন শ্রীকল্যাণ সেন। গণিত বিভাগের অধ্যাপক-প্রধানরূপে এই কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীবিভূতিভূষণ সেন যোগ দিয়েছেন। এই বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকারের বদলীর ফলে তাঁর স্থানে এসেছেন অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রকুমার সেন। সেণ্ট্রাল কলিকাতা কলেজ থেকে অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র এই বিভাগে যোগ দিয়েছেন। ভূ-বিজ্ঞান এবং ভূগোল বিভাগের অংশতঃ-সহযোগী অধ্যাপক দত্ত ভারতীয় সরকারের কোন কার্যভার গ্রহণ করার ফলে অধ্যাপক মেহতা তাঁর কর্মভার গ্রহণ করেছেন। রাশিবিজ্ঞানের অধ্যাপনা সহায়ক শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন রায়ের পদত্যাগের ফলে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায় অস্থায়ীভাবে সেই নিযুক্ত হয়েছেন। পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে এসেছেন শিবপুর এনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে শ্রীব্রজেন্দ্র সেন। রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক-প্রধান শ্রীনির্মল সেন গবেষণার কাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন।

লাইব্রেরী

১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ কলেজ লাইব্রেরীতে মোট ৬৪,৯৬৭টি বই ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের মোট সাময়িকীর সংখ্যা ছিল ১৯,৭২০। ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত

মোট ৪৬১০টি নূতন বই কেনা হইয়াছে। গ্রন্থ এবং সাময়িকীর সংখ্যা মোট প্রায় ১ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। স্থানাভাবে বইগুলির উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হচ্ছে না।

গত বছর আর্টস লাইব্রেরীতে ১ জন সহকারী গ্রন্থগারিক এবং ২ জন (অস্থায়ী) কর্মচারী নিযুক্ত করার ফলে লাইব্রেরীর কাজে কিছুটা শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা করা যাচ্ছে। "কার্ড ইনডেক্স" তৈরী মাত্র আরম্ভ হয়েছে; এতে ছাত্রদের একটা বিশেষ অসুবিধা দূর হবে বলে আশা করা যায়। বই-এর তালিকাগুলিকে বর্তমানোপযোগী করে ছাপিয়ে ফেলা দরকার এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কিছুটা সচেতন হয়েছেন, কিন্তু কাজ মোটেই এগুচ্ছে না

প্রাক্তন-ছাত্র-সংবাদ

সম্প্রতি যাঁরা উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন তাঁদের অনেকেই আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। প্রথমেই নাম করতে হয় রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের। আমাদের কলেজের কৃতি ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম সন্দেহ নেই। ভারতের জাতীয় আয় কমিশনের সভাপতি শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আমাদের কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের গত অধিবেশনে তিনি সাধারণ সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হায়দারাবাদে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের যে অধিবেশন হয়, তাতে সভাপতিত্বের কাজ পরিচালনা করেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমান অধ্যাপক শ্রীযোগীশচন্দ্র সিংহ। তাঁর অভিভাষণটি একাধারে তথ্যসমৃদ্ধ ইঙ্গিতপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস্‌চ্যান্‌সেলর শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস আমাদের কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। গত সেপ্টেম্বর মাসে এফ. এ. ও-র কোন বিশেষ কাজে পৃথিবীর পাঁচজন বিশেষজ্ঞ ওয়াশিংটনে সম্মিলিত হন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক দ্বারকানাথ ঘোষ। অধ্যাপক ঘোষ সম্প্রতি ইউনাইটেড নেশনস্-এ অর্থনীতি বিভাগের সহকারী-ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে যাঁরা বিচারপতির আসন অধিকার করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীব্রজকান্ত গুহ, শ্রীকুলদাচরণ দাসগুপ্ত, শ্রীহিমাংশু বসু আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

বিয়োগ-পঞ্জী

বিগত একটি বৎসরে আমাদের চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে এই প্রতিষ্ঠানের ছয়জন প্রাক্তন অধ্যাপক প্রবরের সঙ্গে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিণত বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। আমাদের কলেজেরই ছাত্র ও শিক্ষক হিসাবে ইঁনি স্বনামধন্য ছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমান সংখ্যায় তাঁর দার্শনিক মতামতের ওপর লেখা একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হল।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ও ইহলোকে নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের ইনি প্রথম ভারতীয় ডিগ্রিধারী অধ্যাপকদের মধ্যে একজন। পরে

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি সরকারী চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। স্থানান্তরে ভারতের মুক্তিসাধনায় তাঁর আবদানের কথা লেখা আছে। সম্প্রতি তাঁর একটা প্রতিকৃতি আর্টস লাইব্রেরী হলে টাঙ্গানো হয়েছে।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন মহাশয়ও পরলোক গমন করছেন। এই কলেজের ইতিহাসের ছাত্র এবং অধ্যাপক হিসাবে ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক রায়বাহাদুর জ্যোতির্ভূষণ ভাদুড়ী আর ইহলোকে নেই। ইনি এক সময়ে আমাদের কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। আমরা তাঁর শোকাচ্ছন্ন পরিবারকে সমবেদনা জানাই।

অধ্যাপক রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র দে মহাশয়ও দেহত্যাগ করেছেন। ছাত্র এবং অধ্যাপক হিসাবে ইনি আমাদের কলেজের সঙ্গে বহুদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে ইনি অবসর গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায়ের অকাল মৃত্যুতে দেশ ও জাতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদানের পূর্ব্বে ইনি প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করছি।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ তাঁর এক বিশ্ববিশ্রুত সন্তানকে হারিয়েছে। জ্ঞান, সাধনা এবং দেশ-সেবার ক্ষেত্রে অপূর্ব তন্ময়তার পরিচয় দিয়েছিলেন স্বদেশী যুগে এই দেশবরেণ্য শিক্ষাকর্মী। তার আংশিক আভাস পাওয়া যাবে এই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অন্যত্র দেওয়া হ'ল।

অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষও আর ইহজগতে নেই। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ইনি তদানীন্তন সরকারের সন্দেহভাজন হয়ে দীর্ঘকাল প্রবাসে নির্যাতন ভোগ করে স্বদেশে ফিরে এসে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেছিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন কৃতি ছাত্র।

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও লোকান্তর হয়েছেন; ইনি আমাদের কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে' রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের সঙ্গে বহুদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সহপাঠী অধ্যাপক ৺বিনয় সরকারের লেখা তাঁরই সম্বন্ধে একটা রচনা এই সংখ্যার স্থানান্তরে প্রকাশিত হচ্ছে।

স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন খ্যাতনামা আইনজ্ঞকে হারিয়েছে। বিদেশী এবং স্বদেশী শাসন-ব্যবস্থায় তাঁর ওপর অনেক গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার ন্যস্ত ছিল। ১৯৪৭ সালে ইনি অস্থায়ীভাবে কিছুদিন পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল হিসাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর আকস্মিক বিয়োগে আমাদের ক্ষতি সহজেই অনুমেয়। প্রেসিডেন্সি কলেজের তিনি একজন প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।

শরৎচন্দ্র বসুর অকাল বিয়োগে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে একটা বিশেষ এবং অপূরণীয় অভাবের সৃষ্টি হ'ল। ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে বিদেশী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলন চালিয়ে গেছেন যাঁরা শরৎচন্দ্র তাঁদের একজন সন্দেহ নেই। তাঁর স্বাধীন দৃষ্টিভংগী, অপরিমিত আত্মপ্রত্যয় এবং দেশের জন্য তাঁর অপূর্ব স্বার্থত্যাগ ভবিষ্যৎ জননায়কদের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা জোগাবে। তিনি 'প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র—সে হিসাবে আমরা গৌরবান্বিত। সমগ্র জাতির সঙ্গে এক হয়ে আমরা তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করছি।

ভারতের মুক্তিসাধনায় প্রেসিডেন্সি কলেজের অবদান

— তৃতীয় পর্যায় —

[রচনা ও নির্বাচন : সম্পাদক, প্রে. ক. প.']

দাসত্বের পংকে নিমজ্জিত জাতির মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটি লোক ঠিক পংকজের মতোই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেন। এঁরাই জাতির গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে যান। এঁরাই সাহসে, বীর্যে, মনুষ্যত্বে, ত্যাগে, দেশপ্রেমে প্রাণহীন পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে উঠে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান এবং গোটা জাতকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার মন্ত্র শিখিয়ে যান, এঁরাই প্রাণ-প্রাচুর্য্যের স্পর্শ দিয়ে মরা জাতকে সঞ্জীবিত করে তোলেন। এঁদেরই সাধনায়, এঁদেরই আত্মবলিদানে দেশমাতৃকার পায়ের শৃংখল খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক যাঁরা জাতীয় মুক্তিযজ্ঞের হোম-হুতাশনে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং প্রতিকৃতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার কাজে আমরা ব্রতী হ'য়েছি। এই মহতী কর্মপ্রচেষ্টার এটি তৃতীয় পর্যায়। যাঁরা প্রতিকৃতি ও তথ্যাদি দিয়ে আমাদের কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতার ওপর নির্ভর করেই আমরা এই কাজে অগ্রসর হয়েছি। পাঠকদের কাছে তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ প্রেসিডেন্সি কলেজের কোন প্রাক্তন ছাত্র বা শিক্ষকের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় যদি তাঁদের জানা থাকে, অনুগ্রহ করে তা পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা যেন আমাদের কর্মভার লাঘব করেন।

[পূর্বপ্রকাশিত :

প্রথম পর্যায় [প্রে. ক. প. পৌষ, ১৩৫৪ পৃঃ ২৭—৩৬]

বংকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপ্লবী বীর শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্ত, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, সহীদ সন্তোষ কুমার মিত্র এবং শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

দ্বিতীয় পর্যায় [প্রে. ক. প. পৌষ, ১৩৫৫, পৃঃ ৩৬—৪২]

রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, রাসবিহারী ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যানন্দ বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত।]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্ম—১২৭০ সালের [১৮৬৩ খৃঃ অঃ] ৪ঠা শ্রাবণ, মৃত্যু—১৯১৩ খৃঃ অঃ।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ পাশ করে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্যে ষ্টেটস্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে সিসেষ্টার কৃষি-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। নানাপ্রকার গুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থেকেও দ্বিজেন্দ্রলাল অক্লান্তভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার পূজা করে গেছেন।

ভারতবর্ষকে দেশমাতৃকারূপে দেখবার মন্ত্রপাঠ করেছিলেন সর্ব্বপ্রথম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্ত্র অনুসরণ করেছিলেন তাঁর জাতীয় সংগীতে। তাই জাতীয় সংগীত-রচয়িতা হিসেবে তিনি ভারত-পূজারীদের কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। তাঁর কাছে "বঙ্গ আমার" শুধু "জননী আমার" ছিলনা, ছিল "দেবী আমার সাধনা আমার"। এ গানটির শেষে তিনি লিখেছিলেন প্রথমে "আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয়-রক্ত করিয়া শেষ"। কিন্তু লোকেন্দ্র পালিত প্রমুখ বন্ধুদের অনুরোধে তাঁকে "হৃদয়-রক্ত শেষ"কে বদলে লিখতে হয় "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।" বিপ্লববাদীদের বীর্য্যের কথা বলতে তাঁর চোখ জ্বলে উঠত, লেখনী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত ["মহা আহ্বানে মায়ের চরণে প্রাণ বলিদানে"], কিন্তু বিপ্লবের প্রতি যে সহানুভূতি তিনি অনুভব করতেন তার মূলে ছিল তাঁর হৃদয়ের একটি অসামান্য প্রবণতা—সে ভক্তি। শরৎচন্দ্র একবার বলেছিলেন একটি বড় সত্য কথা যে, দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যু না হ'লে তিনি আরও কতো অনুপম জাতীয় সংগীত, ভক্তি সংগীত রচনা করিতেন। তবু কতো সংগীতেই না তাঁর এই ভক্তির সুর বেজে উঠেছে—

"ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।"

কখনো তিনি গাইলেন সংস্কৃত ছন্দভঙ্গীতে—

"ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা

* * * *

চল সমরে দিব জীবন ডালি, জয় মা ভারত! জয় মা কালী!"

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মনে প্রাণে পূজারী, তাই তিনি এভাবে জন্মভূমি ও কালীকে সমাসনে বসাতে পেরেছিলেন। তিনি যে দেখতে পেরেছিলেন ভারত আমাদের শুধু অন্নদাত্রী নয়, ভারত আমাদের :

'কর্ম্মজ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম্মধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।'

তাই না তিনি গাইলেন শেষ জীবনে ভারতকে জগজ্জননী ব'লে চাক্ষুষ করে :

"ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী ভারতবর্ষ!"

আমাদের দেশে জাতীয় সংগীতের আদি মন্ত্রদাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যে ওজঃশক্তি ছিল তা দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে যে ভাবে সংক্রামিত হয়েছিল সে ভাবে সংক্রামিত হয়নি আর কোন বাঙালী কবির বাংলা কাব্যে। "বন্দে মাতরমের" পরে অনেকের মতে জাতীয় সংগীত হিসাবে গণ্য হ'তে পারে কেবল দ্বিজেন্দ্রলালের "ভারত আমার" গানটি।

সাহিত্যক্ষেত্রে যে অল্প কয়েকজন অন্তর্দর্শী "আবৃতচক্ষু", উপনিষদের ভাষায় যাঁরা অমৃত সন্ধান ব্রতে আত্মোত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, যাঁরা ইংরাজী দার্শনিক পরিভাষায় "Introvert" হয়েছেন, সেই মুষ্টিমেয় সত্যদ্রষ্টাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল একজন। সেই সত্যদৃষ্টির অঞ্জন প'রেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, আমাদের জাতীয় দৈন্য রূঢ়, অকাট্য বাস্তব হ'লেও ভারতে এ দৈন্যের ছোঁওয়া লাগেনি—জনসংপৃক্ত পথের মতোই আত্মা তার নির্লিপ্ত। তাই তিনি গেয়েছিলেন প্রেমিক কবির সুরে—

"তুমি তো মা সেই তুমি তো মা সেই চির গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন, হারায়েছি সব বিভব গরিমা!"

আর দেখ্‌তে পেয়েছিলেন দেশের মধ্যে অমৃত মন্দাকিনীর এক চিরন্তনী ধারা যাকে তিনি বলতে পারতেন—

"দেবী আমার সাধনা আমার, স্বর্গ আমার আমার দেশ।"

এ তো গেল জাতীয় সংগীত-স্রষ্টা হিসাবে তাঁর অবদান। তা ছাড়াও বাংলায় স্বাধীন সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও তার দান কম নয়। বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিকগুলির মধ্যে অন্যতম "ভারতবর্ষ" তিনিই প্রতিষ্ঠা করে যান।

বিপ্লবী সুশীল সেন

জন্ম—১২৯৯ সাল অগ্রহায়ণ মাস, মৃত্যু—১৩২১ সাল।

শ্রীহট্ট জেলায় বানিয়াচং গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে সুশীলের জন্ম। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মন রাজনীতির দিকে ঝুঁকে ছিল। বাল্যশিক্ষা শেষ ক'রে সুশীল তাঁর দাদার (শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন) সঙ্গে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদে" ভর্তি হ'ন। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনেক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে সংযোগ রাখতেন। এই সূত্রে তিনি অরবিন্দ-বারীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং ক'লকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য হ'ন।

কিশোর বয়সেই সুশীল কেমন তেজস্বী ছিলেন তার পরিচয় পাই অমরা সেই সময়কার একটা বিশেষ ঘটনায়। ক'লকাতা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এক স্বদেশী মামলার বিচার চল্‌ছিল। "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করার অপরাধে বিদেশী সার্জেন্ট হুয়ে সম্মিলিত জনতার ওপর নৃশংসভাবে লাঠি আর বেত চালাচ্ছিল। এই পাশবিক অত্যাচারে স্থির থাকতে না পেরে সুশীল তাকে আক্রমণ করেন। সরকারী কাজে বাধা দেবার দায়ে সুশীলকে অভিযুক্ত করা হয় এবং সেই প্রথম রাজনৈতিক কারণে এক ১৫ বছরের বালকের ওপর বেত্রাঘাতের আদেশ হয়। তাঁকে বিবস্ত্র করে নিয়ে সেই কোর্টেই চৌদ্দ ঘা বেত মারার পর পুলিশ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সুশীল চীৎকার করে জানিয়ে দেন—আরও এক ঘা বাকী আছে। সমস্ত দেশে এই নিয়ে একটা তীব্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়—এমন কি সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্য জনসভায় সুশীলকে অভিনন্দিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সুশীলের বেত্রাঘাত উপলক্ষ্য করে গান রচনা করলেন—"বেত মেরে মা ভুলাবি—আমি কি মায়ের তেমনি ছেলে।"

এই ঘটনায় সুশীল স্বভাবতঃই খুব খ্যাতিলাভ করলেন। এই সময়েই তিনি ৺দেবব্রত বসুর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলেন এবং তাঁরই মাধ্যমে যুগান্তর দলের একজন নিয়মিত সভ্য হলেন। ঠিক তার পরেই যখন ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করবার প্রস্তাব ওঠে, তখন এই কাজের জন্য যাদের নাম আলোচিত হয় তাদের মধ্যে সুশীল অন্যতম।

বিপ্লবী বারীনের বোমার কারখানা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর নিছক সন্দেহের ওপর যাদের অভিযুক্ত করা হয় সুশীল তাঁদের মধ্যে একজন। বিচারে সুশীলের ৭ বৎসর দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হয়, কিন্তু হাইকোর্টে সুশীল নির্দোষ সাব্যস্ত হন এবং মুক্তি পান।

অরবিন্দের পরামর্শে সুশীল দেশে ফিরে গিয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেন এবং গ্রামের স্কুল থেকেই বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রাজনৈতিক কারণে তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে তিনি ভর্তি হন এবং আই. এস. সি পরীক্ষায়ও বৃত্তি নিয়ে পাশ করেন। সরকার এবার আর তার বৃত্তি বন্ধ করেন নি। এই কলেজেই তিনি বি. এস. সি পড়তে থাকেন।

তবে পড়াশুনা সুশীলের কাছে ছিল একেবারেই গৌণ—মুখ্য ছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব-প্রয়াস। প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দু-ছাত্রাবাসে (যতীন মুখোপাধ্যায় কথাচ্ছলে যাকে বলতেন "রেড ফোর্ট") সুশীল প্রভৃতি আরও জন কয়েক যুগান্তর দলের সভ্য যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটা গুপ্ত সমিতি গঠন করে, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিলেন। বর্তমানে যেখানে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার সেইখানে একদিন সকালে সুরেশ মুখোপাধ্যায় নামে এক পুলিসের গোয়েন্দা গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেয়। এই খুনের ষড়যন্ত্রে সুশীল প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ছিলেন।

সুশীলের সমসাময়িক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন—তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে কোন একটা সাংঘাতিক রকমের কাজের পরেও তাঁরা সুশীলের মনে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নি। শোনা যায়, সেই হত্যাকাণ্ডের কিছুক্ষণ পরেই সুশীল ইডেন ছাত্রাবাসে ফিরে আসেন এবং তাঁর এক বন্ধুর ঘরে বসে দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত কয়েকটি প্রিয় গান গাইতে থাকেন।

এই ব্যাপারের পর থেকে সুশীল যতীন মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন আর তাঁর কাছ থেকে নিলেন তিনি বিপ্লবী জীবনের এক নূতন দীক্ষা—কাজের গুরুত্ব নির্বিচারে প্রয়োজন মতো দায়িত্বভার গ্রহণ করা। সহকর্মীদের মুখে থেকেই শোনা যে "যতীন দা" তাঁর ওপরেই বিশ্বাস রাখতেন বেশী এবং তাঁকে যথেষ্ট স্নেহের চোখেও দেখতেন। ১৯১৪ সালে নদীয়া জেলার কোন বিশেষ জায়গায় একটা রাজনৈতিক দস্যুতা শেষ করে সুশীল সদলবলে পুলিসের চোখ এড়িয়ে ফরিদপুর জেলার কোন এক হাটে অবস্থিতি করবার সময় পুলিসের সন্ধানী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যি সত্যি তিনি এবার পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বাঁচানর জন্য পুলিসকে লক্ষ্য করে যে গুলি করেন তা গিয়ে লাগে সুশালের গায়েই এবং সেই আঘাতেই সুশীলের মৃত্যু হয়। মৃতদেহকে গঙ্গাগর্ভে সমাধিস্থ ক'রে সঙ্গীরা ফিরে আসেন। মাত্র ২২ বৎসরে সুশীলের জীবনের অবসান হয়।

বাংলার বিপ্লবী অগ্নিপ্রবাহের মধ্যে সুশীল সেন একটি উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ। স্বল্প-পরিসর জীবনে বৃহৎ ঘটনা খুব কিছু নেই; কিন্তু আছে একটা মনের পরিচয়—সামান্য দু'চারটি ঘটনায় যার প্রকাশ।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম—ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত মধ্যপাড়া গ্রামে, ১৮৮৫ সালের ১৫ই জুন; মৃত্যু—হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীস্থ 'পল্লীমধু' ভবনে ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট।

১৯০০ সালে রংপুর জেলার গাইবাঁধা স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; এফ. এ. পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে। ১৯০২ সালে প্রেসডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পড়তে আসেন। ১৯০৫ সালে এই কলেজ থেকেই প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৪-০৫ সালে ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসের বাসিন্দা ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসাবেই রাজনীতি ও সমাজ সেবায় নৃপেন্দ্রচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। ইডেন হোষ্টেলে কার্জ্জনের কুশপুত্তলিকা দাহ এবং বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব এ সময়কার ঘটনা।

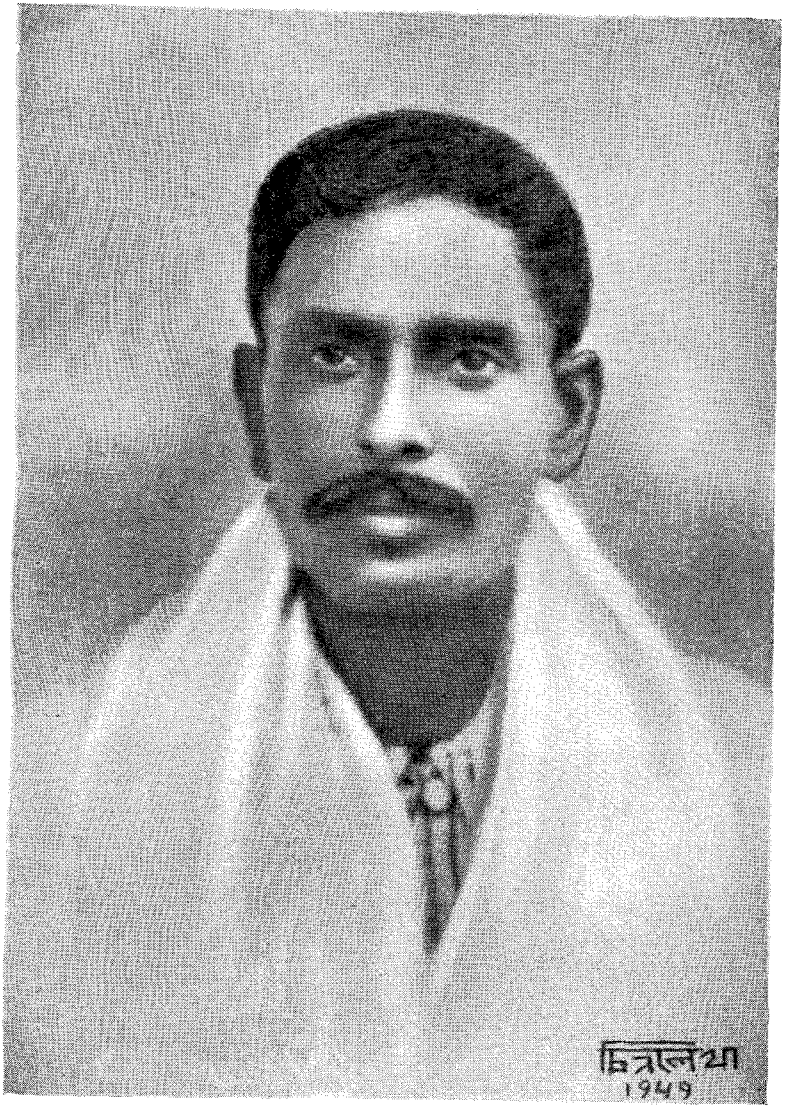

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আবির্ভাব :
১৮৮৫ সালের ১৫ই জুন।

তিরোভাব :
১৯৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট।

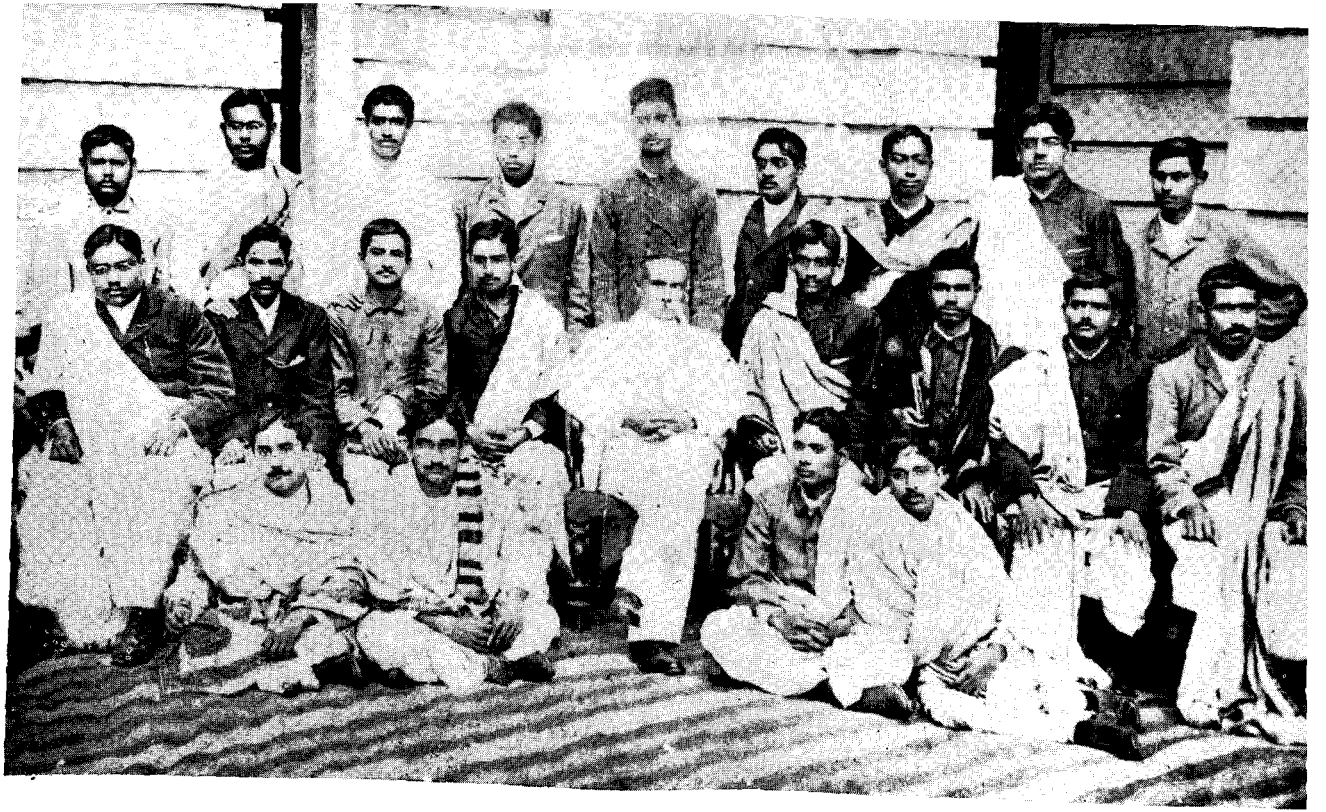

ছাত্রাবস্থায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ

[ছবিখানি আমাদের কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র এবং ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ছবিখানি ১৯০৬-৭ সালে গৃহীত। মধ্যস্থলে তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেব উপবিষ্ট। তাঁর ঠিক পিছনেই শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ দণ্ডায়মান। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনকে ঐ সারির প্রথমেই (বাঁ দিক থেকে) দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য সমপাঠীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে নানাদিকে বিখ্যাত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রথম সারিতে দ্বিতীয় স্থান উপবিষ্ট হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।]

নৃপেন্দ্রচন্দ্রই স্কুল কলেজ বয়কটের জন্য ছাত্রসমাজের নিকট বাংলা আবেদনটির খসড়া প্রস্তুত করেন। বাংলায় তখন বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা হয়ে গিয়েছে। নৃপেন্দ্রচন্দ্রও এম. এ. পরীক্ষা দেবার সংকল্প ছেড়ে আদর্শবাদী আরও কয়েকটি যুবকের সাথে রংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে অবশ্য ঐ বৎসরই স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দ্দেশে তিনি এম. এ. পরীক্ষা দেন।

এর অল্পকাল পরে অধ্যাপক হিসাবে প্রেসিডেন্সী কলেজের সাথে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের যোগ স্থাপিত হয় বিহারে বাঁকিপুর কলেজ ও আসামে সিলেট কলেজে কিছুদিন কাজ করবার পর ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৭ থেকে ১৯২১-এর মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বাংলার বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি ছিলেন ১৯০৭-০৯ ও ১৯১৭ সালে। সরকারী শিক্ষা বিভাগে থেকেও তাঁর নির্ভীক্ ও তেজস্বী আচরণের জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র লাভ করেছিলেন ছাত্র ও সহকর্ম্মীদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং সরকারের বিরাগ।

১৯২১ সালে নৃপেন্দ্রচন্দ্র যখন অসহযোগ আন্দোলনে ব্রতী হলেন, তখন তিনি চট্টগ্রাম কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত। এই সময় থেকে আরম্ভ হল ত্যাগ ও নির্য্যাতনের জীবন। চাঁদপুরের কুলীধর্ম্মঘটের প্রাণস্বরূপ ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র। এই সময় থেকেই তিনি সারা বাংলায় 'মাষ্টার মশাই' নামে পরিচিত হন। ১৯২১ সালে তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভের পর তিনি তদানীন্তন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্র সার্ভ্যাণ্ট (Servant)-এর সম্পাদনা করেন। ১৯২৩-এর শেষের দিকে নৃপেন্দ্রচন্দ্র রেঙ্গুণের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা রেঙ্গুণ মেইল (Rangoon Mail)-এর সম্পাদক হন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর তিরোধানের পর নৃপেন্দ্রচন্দ্র পুনরায় বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন পূর্ণ গান্ধীপন্থী—নো-চেঞ্জার (No-Changer)।

১৯২৬ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক পদে বৃত থাকাকালীন যুব ও ছাত্র-সমাজের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিপ্লবীদের সংগেও তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে নৃপেন্দ্রচন্দ্র নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। একদিকে চল্‌তে থাকে তাঁর ওপর সরকারী দমননীতি, অপর দিকে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন ছাত্র, যুব ও রাষ্ট্রীয় সম্মেলন থেকে আস্‌তে থাকে পৌরোহিত্যের সাদর আমন্ত্রণ। আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনার পূর্ব্বেই ১৯২৯ সালে তাঁর বিরুদ্ধে একযোগে রাজদ্রোহের দায়ে তিনটি এবং মুন্সীগঞ্জে মন্দির সত্যাগ্রহে একটি—এই মামলা দায়ের করা হয়। ফলে, তাঁর একবৎসর কারাবাস হয়। হিজলী বন্দীশালা ও চট্টগ্রামের নির্য্যাতনের কথা নির্ভীক্‌ভাবে প্রচার করবার জন্য ১৯৩৩ সালে আবার তাঁর নয়মাসের কারাদণ্ড হয়। কারাবাস অন্তে নৃপেন্দ্রচন্দ্র এক বৎসর সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। এর পর থেকে তিনি ক্রমশঃ রাজনীতির আবর্ত্ত থেকে সরে আসতে থাকেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সংগে অবশ্য তাঁর যোগসূত্র কোন দিনই ছিন্ন হয় নি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আগ্রহাতিশয্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র ১৯৩৯-৪০ সালে বাগেরহাট কলেজের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্পর্কিত বিলের বিরোধিতা করতে থাকলে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের সাথে পরিচালক সমিতির মতবিরোধ হয়। অনমনীয় নৃপেন্দ্রচন্দ্রও পদত্যাগ করেন।

১৯৩৮ থেকে '৪২-এর আন্দোলনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তিনি বৈদ্যবাটী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র ইংরেজী ও বাংলায় কয়েকটি পুস্তক রচনা করে গিয়েছেন। Ideal of Swaraj : in Education and Government (1922) ; Gandhism in Theory & Practice (1924) ; Asianisn & other Essays ; ভারতের বাণী ও যুগবার্ত্তা ; কাব্যগ্রন্থ—কারার ফুল—[১] রক্তজবা, [২] সন্ধ্যামালতী। তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনী At the Cross-Roads এখন যন্ত্রস্থ রয়েছে।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

জন্ম—১৮৮৭ খৃঃ অঃ, মৃত্যু—১৯৪৯ খৃঃ অঃ ১৭ই নভেম্বর।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের সানিহাটি গ্রামে বিনয়কুমারের জন্ম। কিন্তু এঁর বাল্যজীবন কাটে মালদহে। মাত্র ১৩ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে বিনয়কুমার কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এখানে তাঁর অধ্যয়ন কাল ছ'বছর [১৯০০-১৯০৬] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৫ সালে বি, এ পরীক্ষায় ইতিহাস এবং ইংরাজীতে সর্ব্বপ্রথম হয়ে "ঈষান স্কলারশিপ" পান।

সরকার থেকে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ও ষ্টেট স্কলারশিপ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু স্বাধীনচেতা বিনয়কুমার দুই প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। স্বদেশী যুগে প্রতিষ্ঠিত "জাতীয় শিক্ষা পরিষদে" তিনি বিনা বেতনে কাজ করতে থাকেন। এই সময়ে তিনি মালদা জিলার নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যায়তন গ'ড়ে তুলছিলেন এবং শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান এবং ধারণাকে পাঠকসমাজে প্রচলিত করছিলেন.। এই বিষয়ে তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে—বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা [১৯০৭], শিক্ষা বিজ্ঞানের ভূমিকা [১৯১০], ভাষাতত্ত্ব [১৯১০], ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা [১৯১২], সাধনা [১৯১২]

বাংলায় তথা ভারতে বিপ্লবী রাজনীতির প্রচার এবং প্রসারে যে সমস্ত সংঘ সমিতি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে তার মধ্যে পরলোকগত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটির" নাম আজ জাতি প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছে। এই সোসাইটির অনেকেই পরবর্তী জীবনে শিক্ষাব্রতী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। বিনয়কুমার যদিও ছিলেন অনেকেরই বয়ঃকনিষ্ঠ, তবুও ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মারফৎ বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশে তাঁর কাছ থেকেই প্রথম প্রেরণা আসে। তাঁর বহু ভাষায় জ্ঞান, তাঁর অধ্যয়ন, তাঁর গবেষণা এবং সর্ব্বোপরি জাতির ভিতর বিবিধমুখী শিক্ষাপ্রচারে তাঁর বিশাল চিন্তাধারা দেখলে মানুষটির শক্তি, সামর্থ্য এবং উদ্যমের প্রাচুর্য্যে অবাক হয়ে হেতে হয়। দেশে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং দেশবাসীর মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়ে তুলবার জন্যে কতো প্রতিষ্ঠান যে গড়ে উঠেছিল তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে তার খুব অল্প পরিচয়ই লোক রাখে। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় এশিয়া পরিষদ, বঙ্গীয় জার্মাণ পরিষদ, [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর দুই ভাই অধ্যাপক বিজয় সরকার ও পরলোকগত ধীরেন সরকারের নামের উল্লেখ দেখতে পাই রাউলাট রিপোর্টে], বঙ্গীয় দাঁতে সভা ইত্যাদি তাঁরই হাতে গড়া। এ সব কাজ তিনি করেছেন দেশে, অথচ তিনবারে জীবনের ১৬।১৭ বৎসর তাঁর কেটেছে বিদেশে—ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মিশর প্রভৃতি বহু দেশের বহুস্থান তিনি বারবার পর্য্যটন করেছেন, নিয়ে গেছেন সেখানে ভারতের শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির বাণী, আর সেখান থেকে বয়ে এনেছেন তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বার্তা। সে কাহিনীর আংশিক আভাস পাওয়া যায় তার বিশাল গ্রন্থ "বর্তমান জগত"-এ। শেষ জীবনেও তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশের বাণীমূর্তির রূপ প্রকাশেই নিয়োজিত ছিলেন—ওয়াতুমল প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিষদের ব্যবস্থায়। তখন কিন্তু তিনি স্বাধীন দেশের নাগরিক। এমন নাগরিককে স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষাদূত হিসাবে দেশবিদেশে পর্য্যটন করতে দেখলে আমরা গর্ব্ব ও আনন্দ বোধ করতাম। কিন্তু বিদেশে হাসপাতালে শেষ জীবনে তাঁকে অর্থকষ্টও পেতে হয়েছে—ভারতবাসীর পক্ষে এ কম লজ্জা এবং দুঃখের কথা নয়। শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সময়েও তিনি মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণাম রেখে গেছেন। [স্ত্রী ইভা সরকারের সাথে তাঁর শেষ কথা—"বন্দে মাতরম্। তোমার কি মনে নেই সেই ১৯১৪ সালে একদিন জাহাজে তোমায় গানটি শিখিয়ে দিয়েছিলুম"]

বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শান্তিকুমার ঘোষ
(ষষ্ঠ বর্ষ আর্টস্)

বর্ত্তমানে বাঙলা কবিতা সাধারণ পাঠকের কাছে গণিত বা দর্শনশাস্ত্রের মতই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বাঙলা কাব্য আজ বাঙালীর রস-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ বহুকাল থেকে কাব্যই মানুষের গভীরতম রস-পিপাসা মিটিয়েছে—দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব কোলাহলে দিশাহারা মানুষ কাব্যের মধ্যেই বাস্তব জগতের খণ্ড অভিজ্ঞতার উপরে জগৎ ও জীবনের একটি সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। সুতরাং সাধারণ পাঠক যে আজকাল কবিতার প্রতি এত বিমুখ তার পিছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে।

বাইরের জীবনে যেমন আর কোন রকম দিবাস্বপ্ন বা cultureএর অবকাশ নেই, আজকালকার কবিতা তেমনই তার রস-পিপাসা চরিতার্থ করতে একেবারে অক্ষম। কবিতার নামে আজকাল যে রাশি রাশি 'অতি-আধুনিক' রচনা ছাপা হয়ে থাকে তাকেই বাঙলা কবিতার আসল রূপ ধরে নিয়ে সে কবিতা সম্বন্ধে একরকম উদাসীন হয়ে গেছে। ফলে আজকাল যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা নিজেরাই—কাব্যরসিক কোন সমাজভুক্ত নন—নিজেদের কবিতা উপভোগ করে থাকেন।

একটু মনোযোগের সঙ্গে আধুনিক কবিতার দিকে লক্ষ্য করলেই ধরা যায় যে, সেগুলি লেখকের অন্তরের অগম গহন হতে উৎসারিত হয় নি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা মাত্রেরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হওয়ার প্রয়োজন। এই ধরণের কবিতার বেশীর ভাগই অতিমাত্রায় কৃত্রিম, মস্তিষ্কের নানা অসম্বদ্ধ ভাবে পূর্ণ, বাছা বাছা কতকগুলি বচন বা sloganএর সমষ্টি,—ব্যক্তি-হৃদয়ের কোন গভীরতর অনুভূতি বা রূপ-সৃষ্টির কোন প্রয়াস এতে নেই ব'ললেই হয়, —আছে কেবল বিদেশী সাহিত্যের কয়েকটি আঙ্গিক বা technique-এর অনুকরণ। এই কবিতাগুলির form নতুন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা এখনো পরীক্ষার স্তর পার হয়নি এবং এ পর্য্যন্ত তার মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি,—যাকে জাতির জীবনধর্ম্মের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। এগুলি সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে কবিতাগুলি ভয়ানক রকমের অস্পষ্ট—কতকগুলি বক্র ভগ্ন ও অসম্পূর্ণ রেখার সমষ্টি—একটি সমগ্র অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষ দর্শনের কোন উপলব্ধির পরিচয় এতে পাওয়া যায়

না। একটিমাত্র ছোট অনুভূতি বা উদ্ভট symbolকে নিয়ে খানিকটা ব্যঞ্জনা হয়তো এতে আছে কিন্তু বাকি সমস্তই পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রচনার মধ্যে যে রূপসামঞ্জস্য styleএর লক্ষণ তাকে এই কবিতার লেখকরা স্বীকার করেন না, বরং অপরিচ্ছন্ন ভাষার প্রয়োগ ও ব্যাকরণ-অভিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই style মনে করেন। এমন কবিতা সহজগ্রাহ্য না হওয়াই স্বাভাবিক, তাই একে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য তত্ত্ব-আলোচনার দরকার হয়েছে। এ কথা সত্য যে, আধুনিক যুগে মানুষ কঠিন বাস্তব জগতের মুখোমুখি হয়েছে, তাই কাব্যেও বাস্তব জীবনের অনেকখানি রূপ দেবার দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু কবিতাকে যুগোপযোগী করতে হলে বাস্তবজগতের এই কুৎসিত পরিবেশের মাঝখান থেকেই উৎকৃষ্ট বাণী-বিগ্রহ গড়ে নিতে হবে। তার জন্য যে ছন্দ-মিল সকল রকমের কারুকার্য্য ত্যাগ করতেই হবে এমন কোন কথা ওঠে না।

খাঁটি কাব্য-রচনায় সুবলয়িত ছন্দ-সুষমার প্রয়োজন আছে। ছন্দ শব্দটির মানে—ইংরেজীতে যাকে measure বলে, বাঙলার ছন্দ ব'লতে তাই বুঝায়। গদ্যের একটা rhythm থাকতে পারে কিন্তু ঐ measure নেই। তথাকথিত গদ্য কবিতায় একটি ধ্বনিস্রোত আছে কিন্তু তা ছন্দ তো নয়ই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে rhythm ও নয়। সুস্পষ্ট রূপসৃষ্টির জন্য ছন্দ অপরিহার্য্য,—ভাবের রূপটি যখন বাণীতে মূর্ত্তিমান হয়ে ওঠে তখন সেই বাণীরূপের নিজস্ব উপাদানরূপেই ছন্দের জন্ম হয়। আবার ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতা হয়ে ওঠে না—ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের দীপ্তি, ভাষার জাদুমন্ত্র থাকা চাই। কিন্তু কবিতার পক্ষে ছন্দ যেমন অপরিহার্য্য মিল তেমন নয়। বাঙলা সাহিত্যে মিলহীন ছন্দে কাব্যরচনা কবি শ্রীমধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম করেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি একদিকে যেমন বাঙলা কবিতাকে যতি স্থাপনের স্বাধীনতা দিলেন অন্যদিকে তেমনি পদ্যের পদবন্ধনকে স্বীকার করে বাঙলা ছন্দ সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষ করে গেলেন। কিন্তু সেটা যে সকল রকমের বাঙলা কবিতার পক্ষে স্বাভাবিক সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। মিল ত্যাগ করাটাই বড় নয়—ছন্দের সঙ্গীতগুণ সঙ্গে সঙ্গে বাড়া চাই। মিলহীন কবিতা বাঙালীর কানে কিছুতেই তেমন শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে না। মিলহীন কবিতা বাঙলা ভাষায় কেমন দুর্ব্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে—ইংরাজীর মতো তার অক্ষরগুলি (syllables) সহজেই স্পন্দিত হয় না। যে ভাষায় accent বা স্বরবৃদ্ধির তেমন সুবিধা নেই, সংস্কৃতের মত হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের উপায়ও নেই, সে ভাষায় শুধু ছন্দ নয় মিলও উৎকৃষ্ট কাব্যরস সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ভাষার উচ্ছ্বাস-প্রবণতার জন্য বাক্য যতই ছন্দকে লঙ্ঘন করতে চায়, ততই মিল তাকে সংযত ও সুষমা-মণ্ডিত করতে পারে। একটি সাধারণ নমুনা হিসাবে নীচে কয়েকটি লাইন রচনা করে দেওয়া গেল—কেবলমাত্র তার থেকেই মিল ও ছন্দ কবিতার বাণীরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ

হয়ে উঠতে কতখানি সাহায্য করে তরে আভাস পাওয়া যাবে,—কবিত্ব-বিচারের প্রয়োজন এখানে নেই—

নীল-মিনে-করা আকাশের গায়ে মেঘের বলাকা ভাসে,
ভীরু সজারুর চকিত চলার রোমাঞ্চ লাগে ঘাসে।
অর্কিড্ ফুলে উড়িছে ভ্রমর···গুণ্ গুণ্ তার ছন্দ,
ইথারী হাওয়ায় ভেসে এলো কোন্ ম্যাগ্‌নোলিয়ার গন্ধ!
বনের ওপারে শোনা যায় কোন্ অজানা গানের রেশ—
তিস্তা নদীর উপত্যকা কি উপকথিকার দেশ!

মিল-রচনা কঠিন কিছুই নয়—সত্যকার রস-প্রেরণায় লেখা কবিতায় মিল আপনিই আসে। ছন্দ ও মিলের গণ্ডি যদি আধুনিক জীবনচেতনার একটি বড়ো বাধাই হয়, তাহলে আধুনিক গদ্য তো আছে—সেই গদ্যের প্রকাশ-ক্ষমতার তো অন্ত নেই। তাহলে আর বাক্যগুলিকে শুধু শুধু: পদ্যের মতো চরণযুক্ত করে জোর করে একটি স্তম্ভের রূপ দেবার কি দরকার—গদ্যে তো এগুলি আরো সুন্দর করে ব্যক্ত করা যায়। একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষায় পদ্যছন্দকে প্রায় নিঃশেষ করে, তাঁর শেষ বয়সে কেবলমাত্র ভঙ্গীচাতুর্য্যের লোভে বাঙলা গদ্যকে পদ্যে উন্নীত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই মিলহীন বিনিছন্দের কবিতার মাত্র কয়েকটিতে কাব্য-শ্রী বজায় আছে। তার থেকে অবশ্যই প্রমাণ হয় যে, বাঙলা ভাষায় এরকম কবিতা রচনা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাগুলি বাক্যচ্ছন্দ বা free rhythmএ লিখিত। কিন্তু তার মধ্যে খুব অল্প কয়েকটিতেই (যেমন "পুনশ্চ" কাব্যের 'শিশু-তীর্থ') তিনি চিন্তার আবেগ ছাড়া কাব্যরস সঞ্চার করতে পেরেছেন। যে কয়টিতে পেরেছেন সেগুলি বাইরে অনিয়মিত হলেও ভেতরে ভেতরে ভাবপরম্পরার একটি গভীরতর নিয়ম পালন করে। তার মধ্যে আবেগের এমন একটি আন্তরিক সুর আছে যে ছন্দোবন্ধন ত্যাগ করলেও কোন ক্ষতি হয় না। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আমি আজকাল অনেক সময়ে গদ্য ছন্দে কবিতা লিখি—আর কোন ছন্দে ঠিক এই সকল ভাব বলা আমার পক্ষে সাধ্য নয় বলেই আমার এই অধ্যবসায়। কাজটা কিছুমাত্র সহজ নয় একথা জানিয়ে রাখলুম। সহজ মনে করে যদি প্রবৃত্ত হও তবে হঠাৎ ঘাটের থেকে পড়বে পাঁকের মধ্যে।"

কাজেই এরকম কাব্যরচনা দুরূহ ও সকল রকমের বাঙলা কবিতার পক্ষে উপযুক্ত নয়। আর আজকাল যে সব সাধারণ ছন্দোবদ্ধ মিলহীন কবিতা অজস্র রচিত হয়ে থাকে সেগুলি এবং রবীন্দ্রনাথের ঐ free rhythmএর কবিতা যে এক বস্তু নয় তা বোধ করি বলাই বাহুল্য।

কাব্যের আকৃতি দুই রকমের—পদ্য ও গদ্য। পদ্যে রচিত না হয়েও কোন রচনা কাব্য হতে পারে। কবি-কল্পনার প্রকৃতি ভেদে গদ্য বা পদ্য কাব্যের বাহন হয়। বস্তুপ্রধান কাব্য গদ্যে রচিত হয়ে থাকে। আর যে কাব্যে ভাবের মাত্রা কিছু বেশী সে কাব্য পদ্যরীতিকে আশ্রয় করে। (পদ্য-কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যেও পার্থক্য আছে, কারণ সঙ্গীত মাত্রই শব্দের সুর রচনা—তার সঙ্গে বস্তুর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই।) কাব্যের আকৃতি নির্ব্বাচন কাব্যের প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে থাকে—কবিকে তার জন্য মাথা খুঁড়তে হয় না। কবিতায় মূল উপাদান ঐ যে 'ভাব'—তা আর কিছুই নয়, কবির অন্তর-ফলকে 'বস্তু' যে বিশেষ রূপ বা formএ প্রকাশিত হয় তা-ই। এই form বা গঠন-ভঙ্গিমাই কবিতা—বিশেষ করে গীতিকবিতা (Lyric)-র সব কিছু। এই জন্য গীতিকবিতার অনুবাদ হয় না—সেই অনবদ্য ভাষা সেই style আর থাকে না।

তাহলে কি lyric জাতের কবিতার রস সেই-সেই ভাষা-ভাষী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে? কতকটা তাই। তবে বর্ত্তমান যুগে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, পরস্পর পরস্পরকে বোঝবার যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে,—তার থেকে আশা করা যায় যে, ভাষানির্ব্বিশেষে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই অন্য ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠরচনার রস আহরণ করতে উৎসাহী হবে। কিন্তু তবু আর একটা সমস্যা আছে। একজন ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় কি একজন ইংরাজের মতো ইংরাজী কবিতা হতে আনন্দ বা রস পায়? তেমনি একজন বিদেশী কি বাঙলাসাহিত্যের বৈষ্ণব কবিতার মাধুর্য্য উপভোগ করতে পারে? পারে না, কারণ যে spiritual training ঐ কবিতার রস আস্বাদানের জন্য অপরিহার্য্য তা বিদেশীর আয়ত্তের বাইরে। তবেই বোঝা যাচ্ছে যে lyric কবিতার সর্ব্বব্যাপী প্রচার ও উপলব্ধি সহজ নয়।

কাব্যসাহিত্যের সবচেয়ে দেখবার বিষয় হচ্ছে যে, কবি তাঁর রচনায় নিজের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখতে পেরেছেন কিনা। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজস্ব—অন্য সব কবির সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এখানেই ধরা যাবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রেষ্ঠ কাব্য মাত্রেরই জীবনদর্শন (আত্মদর্শন নয়) হওয়া চাই। মানবজাতির জীবনযাত্রার কাহিনী তাদের সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্য প্রীতি-প্রেমের কলরোল যেন কাব্যে অনুরণিত হয়। তাই যে কাব্যে কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের সুখ দুঃখের উচ্ছ্বাস আছে, যাতে আত্মানুভূতিই প্রবল, সে কাব্য উৎকৃষ্ট সৃষ্টি নয় কারণ মানব সাধারণের হাসিকান্নার সুর তাতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। কাব্যসাধনা সেই কবিরই সার্থক হয়ে ওঠে যে কবি জীবনের খণ্ড ও বিক্ষিপ্তকে প্রেম, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সমগ্র ও অর্থপূর্ণ রূপ দান করতে সমর্থ হন। সে কবির কাব্যের মুকুরে জীবন ও জগতের নাট্যলীলা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে—সৃষ্টি-রহস্যের একটি সুসঙ্গত ব্যাখ্যা বা অনুবাদ তার মধ্যে নিহিত থাকে।

ঐ যে চরিত্র কথাটা পাওয়া গেল, ঐটেই কাব্যবিচারের কষ্টিপাথর। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য যতই কল্পনাপ্রবণ ও রসসমৃদ্ধ হোক না কেন, এই দিক থেকে তার বেশীর ভাগই কৃত্রিম বা artificial, সংস্কৃত কবিরা তাঁদের কাব্যে ভাবকল্পনার চরম উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। তাঁদের ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে কি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি, কি কল্পস্বর্গবিহারী মনের পরিচয়ই না মেলে! তাই সেগুলি great art, ইংরাজীতে যাকে great poetry বলে তা নয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথও (তাঁর গানগুলি বাদ দিলে—কারণ গানের কথা যে স্বতন্ত্র তা আগেই বলা হয়েছে) এক দিক থেকে দেখলে একজন খুব উঁচুদরের রূপকার—artist par excellence। তাঁর কবিতায় যা আছে তা বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনাশক্তির মল্লযুদ্ধ—চরিত্রের কোন পৃথক মূল্য তাতে নেই। শেষের দিকের একটি কবিতায় তিনি যা বলেছেন—

"আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

—তাতে যে স্বীকারোক্তি রয়েছে তা খুবই সত্য।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যজগতের প্রতিষ্ঠা করলেন তা সাধারণ মানুষের জগৎ নয়। বাস্তবজগতের ধূলোমাটির উপরে তিনি একটি পৃথক জ্যোতির্ম্ময় ভাবলোক সৃষ্টি করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যে তত্ত্বচিন্তাকে (abstract ideas) অপূর্ব্ব রঙে রঞ্জিত করে অনবদ্য রূপ দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ ধর্ম্ম বা idealism মানুষের অতিজাগ্রত বাস্তব দেহদশাকে স্বীকার না করে ব্যক্তিজীবনের ঊর্দ্ধে এক বিরাট জাতি-বর্ণ-হীন বিশ্বমানবের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে। তাঁর কাব্যে অধ্যাত্ম-অনুভূতিরই প্রাধান্য রয়ে গেছে—তা যেমন ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে সংযত করে মানুষের সুখদুঃখ বোধকেও তেমনি অন্তর্মুখী করে তোলে। তিনি দীর্ঘ জীবন ধরে তাঁর বিচিত্র ও রাশি রাশি রচনার মধ্যে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা যে তাঁর মতো বিরাট ও স্বতন্ত্র পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক তাতে সন্দেহ নেই; আর সেই আদর্শ তাঁর কাব্যে এমনই অমরী-দুর্ল্লভ রূপ ধারণ করেছে যে সাধারণের পক্ষেও তার মধ্যে বুঁদ হয়ে যাওয়ার কোন বাধা থাকে না। কিন্তু তা যে মানুষের রক্তের সমতালে চলে না,—প্রত্যক্ষ জগতের দুঃখদুর্দ্দশার সঙ্গে কোন রকম বোঝাপড়া যে তাতে নেই,—একথা অস্বীকার করা যায় না। তাই এই কাব্য স্পর্শ করে আমাদের যে-মন চিন্তা করে সেই মনকে, হৃদয়কে নয়। মনে হয় কবি যেন কোন দুর্গম শৈলশিখরের উপর থেকে রূপ রঙ ও রেখার বিন্যাসে অতি সূক্ষ্ম জাল বুনে চলেছেন—ভাষা ও ছন্দের অদ্ভুত কৌশলে অপূর্ব্ব মোহের সৃষ্টি করে যাচ্ছেন।

বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলেও নিরাশ হবার তেমন কারণ নেই। কাব্যের সমাদরের দিন যে একেবারে চলে গেছে তা বলা যায় না। ইতিহাস থেকে বারবার দেখা গেছে যে উৎকৃষ্ট কাব্য দীর্ঘজীবী হয়, কারণ ছন্দের মধ্যেই অমরত্বের বীজ আছে। আর আজকাল বাঙলা কবিতার যে অপরিচ্ছন্ন বিকলাঙ্গ রূপ দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে তাতেও ভয়ের কিছু নেই, যেহেতু কালের প্রবাহে তার কতটুকু চিহ্নই বা থাকবে? জাতি যখন কঠিন জীবনসঙ্কটের সম্মুখীন হয়—যখন তার সমস্ত শক্তি সেইদিকে নিয়োজিত হয়ে থাকে তখন তার মধ্যে উৎকৃষ্ট রসকল্পনার বিকাশ না হওয়াই স্বাভাবিক। সবল ও সুস্থ জীবনচেতনার সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্তে সত্যকার কবিপ্রেরণার সঞ্চার হবে। তখনকার কাব্যে দেখা যাবে প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের বস্তুগত সত্তাকে রসরূপে আত্মসাৎ করবার একটি দ্বিধাহীন শক্তি—পাওয়া যাবে সমাজ ও সংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি। সে কাব্য যেমন একেবারে ভাবসর্ব্বস্ব হয়ে উঠবে না তেমনি পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিকও হবে না।*

আধুনিক বাঙলা কবিতার সম্ভাবনা

শ্রীসুভাষ রায়

(ষষ্ঠ বর্ষ আর্টস)

কাব্যরসপিপাসু বলে দাবী করেন এমন অনেক পাঠকের মনে আধুনিক বাঙলা কবিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে আজকের বাঙলা কবিতা পাঠকের রসপিপাসা মেটাতে সক্ষম কিনা, বাঙালী মানসের উপযোগী কি না।

তাঁদের বক্তব্যের রূপ দেখে স্পষ্টই মনে হয় বাঙলা কবিতার রূপ তাঁরা শুধু মাসিক পত্রিকার মধ্যে মাঝে মাঝে খুঁজে বেড়ান, বাঙলা কবিতার ধারা বোঝার বা কবিতা অনুভব করবার মন গড়ে তোলবার প্রয়াস তাঁদের নেই। একথা বিদগ্ধ-জনমাত্রই জানেন কবিতা অনুভবের মন গড়ে তুলতে হয়, লেখকের 'গভীরতম' অনুভবের কথাও কবিতায় ধরলে সব মানুষের মনে তা নাড়া দিতে পারে না। একদিন এমন ছিল যখন জীবনের অভিজ্ঞতা ও রূপ ছিল অনেকটাই একমুখী, কথক ঠাকুর বসতেন তাঁর শ্রোতাদের মাঝে আর সেই পরিচয়-ঘন আবেষ্টনীর মধ্যে শোনাতেন কবিতা। তবু কি তাঁর কবিতা সকল মানুষের

---

* লেখকের মূল বক্তব্যের একটা বিরুদ্ধ সমালোচনা পাওয়া যাবে পরবর্তী প্রবন্ধে—সম্পাদক।

মন ছুঁয়ে যেত! আজকের সেদিনকার তুলনায় মানুষের জীবন হয়েছে বিচিত্র, অভিজ্ঞতা ধারণা সবকিছু গেছে বদলে। আজকের কবিরা কবিতা লেখেন বিচিত্ররূপে, তাঁদের কবিতা অনুভব করতে হ'লে চাই তাঁদের ধারণা, তাঁদের ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয়। আর সেই পরিচয় পাওয়া যায় না পাঁচমিশালী মাসিক পত্রিকায়, খুঁজতে হয় বর্দ্ধিষ্ণু ও সার্থক কবিদের কাব্যগ্রন্থে। যাঁরা রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, যাঁরা প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা অন্ততঃ একথাটা স্বীকার করবেন যে আজকের জীবনের অভিজ্ঞতা, তার বিচিত্রতার রূপ আছে এঁদের কবিতায়। তাঁদের সফলতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু তাঁদের অস্বীকার করতে চাইলে বাঙলা কাব্যের ধারা ও গতিকে অস্বীকার করতে হয়।

একথা সত্য যে, কাব্যরূপের সঙ্গে জনমানসের সংযোজন ঘটেনি আজো বাঙলা কাব্যে, কবিতা আজো এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু এর সঠিক কারণ খুঁজতে হবে সমাজ ও কবিতার বিবর্তনের ধারায়। আধুনিক বাঙলা কবিতাকে স্বীকার করে নিতে যাঁদের বাধে তাঁরা Art for art's sake মতবাদীদের মত 'Form'-এর নিরিখে কাব্যবিচার করতে চান, 'Content'কে বুঝতে চান না। অথচ কবিতার, তথা সাহিত্যের Form-এর বিচারের কষ্টিপাথর হচ্ছে তা Content-কে ঠিক ঠিক রূপ দিতে পারছে কি-না।

আমাদের দেশে ধনতন্ত্র এক বলিষ্ঠ মধ্যবিত্তসমাজ সৃষ্টি করেছিল, সে সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সনাতনতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিতান্ত্রিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সে যুগের কাব্যে এই বিদ্রোহের রূপ ছিল, তাই সে কাব্য তখন সমাদৃতও হয়েছিল। কিন্তু ধনতন্ত্রের গতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সে ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শের উপর পড়লো আঘাত, মানুষের বাইরের জীবন হলো সংকুচিত। সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলো না যে মানুষ, সে সমাজ থেকে পালিয়ে কাব্যের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে চাইলো। এ-যুগের কবিতায় তাই ফুটে উঠেছে সামাজিক-জীবন বিমুখতা, কাব্য হয়েছে আত্মকেন্দ্রিক—বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাসের সেই সময়কার কবিতায় এর প্রচুর স্বাক্ষর পাওয়া যাবে।

কিন্তু বাঙলা দেশের কবি সেই আত্মকেন্দ্রিকতা ও সমাজবিমুখতায় চিরনির্বাসন নেন নি, আবার উঠে এসেছেন বলিষ্ঠ সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে। আত্মকেন্দ্রিকতার দরুণ কবিতায় যে অস্বচ্ছতা এসেছিল তা হয়ে এসেছে স্বচ্ছ, সহজবোধ্য। "ধূসর পাণ্ডুলিপিতে" যে জীবনানন্দ দাস বলেছিলেন—

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদন জমে; স্বপনের হাতে আমি তাই
আমারে ভুলিয়া যেতে চাই!
সেই সব ছায়া এসে পড়ে
দিনের—রাতের ঢেউয়ে,—তাহাদের তরে
জেগে' আছে আমাদের জীবন;

সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এ স্বপনের হাতে!
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,—
থাকিত না হৃদয়ের জরা,—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা।···· [স্বপ্নের হাতে]

তিনিই দুই হাতে অন্ধকার সরিয়ে বলেছেন,

নব পৃথিবীকে পেতে সময় চলেছে?
হে অবাচী, হে উদীচি, কোথাও পাখীর শব্দ শুনি;
কোথাও সূর্য্যের ভোর গেছে বলে মনে হয়।·····
আমরা অপেক্ষাতুর;
চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পর আরো ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখীদের মত
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় জোগান দিয়ে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই
উড়ে যেতে চাই·····[সূর্য্য প্রতিম]

যে কবি ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে আপনাতে মগ্ন হতে চেয়েছিলেন, যিনি স্বপ্নের হাতে ধরা দিয়ে বাস্তব থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন, তিনি এখানে অনুভব করেছেন নতুন জীবনকে, সে জীবনসৃষ্টির কাজে হাত না লাগাতে পারলেও অনুভব করেছেন সম্ভাবনাকে।

এমনিভাবে সম্ভাবনাকে অনুভব করে সামাজিকে চেতনায় বলিষ্ঠ হয়ে কবিতার রূপান্তরে এগিয়ে এসেছেন বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিরা।

কিন্তু তাতে কি বাঙলা কবিতা সার্থক হয়ে উঠেছে? আজকের মানুষের অভিজ্ঞতা, তার ধারণা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কি রূপ পেয়েছে আধুনিক কবিতায়? একথা অনস্বীকার্য্য যে, আধুনিক কবিতা আজো বিশেষ এক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ, তীব্রতর অর্থনৈতিক সংকটে মানুষের অভিজ্ঞতার যে রূপান্তর ঘটছে, যে নতুন সম্ভাবনাকে আকাঙ্ক্ষা করছে তার কোনো ছাপ এতে নেই। এক সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কবিতায় ছাড়া নতুন সম্ভাবনার রূপ ভাল করে ফোটেনি আর কোন কবির কবিতায়, সমাজ-সচেতন কবিরা আজো পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। গণমানসের সঙ্গে সংযোজনায় সার্থক যে তাঁরা হন নি তার প্রধান কারণ আজকের যে মেহনতকারী জনসাধারণ সমাজসচেতনায় নতুন সম্ভাবনাকে মুখর করে তুলেছে তাঁদের 'আত্মীয়তা' আজো তাঁরা অর্জন করতে পারেন নি।

কাব্যধারণার, কাব্যরূপের এক বিরাট পরিবর্তন না হ'লে আজকের কবির সাথে জনমানসের সংযোজন সম্ভব নয়। বাঙলা কাব্যের সংকট এখানেই।

কোনো দেশের কাব্য সেই দেশের সমসাময়িক কৃষ্টিরই ফলন। আমাদের দেশে পাঁচালি, ছড়া, রূপকথা ইত্যাদিতে যে গনকৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধরা হয় তারো রূপটা সমাজতান্ত্রিক। বুর্জোয়া কৃষ্টির আওতায় আমাদের দেশে যে কাব্য গড়ে উঠেছিল, তার আর উত্তরণ অসম্ভব। কারণ, তা আর কোনো সম্ভাবনার সূচনা করে না। কিন্তু যে গনকৃষ্টি আমাদের দেশে আছে, যার বিবর্তন হচ্ছে আমাদের অজ্ঞাতসারেই তার সঙ্গেও পরিচয় নেই কবির। সাধারণ পাঠক যে তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর ধারণার ছবি স্বচ্ছরূপে খুঁজে পান না আধুনিক কবিতায় তার কারণ এখানেই। কিন্তু তাই বলে আগামী দিনের কাব্য কি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এগোবে? একথা স্বীকৃত সত্য যে কোন দেশের সাহিত্যের অগ্রগতি সেই দেশের পূর্বতন ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই, বাঙলা-কাব্যের অগ্রগতি লক্ষ্য করলেও একথা স্পষ্ট হবে। কোন বিশেষ content-কে রূপ দেবার তাগিদে রচিত হয় কবিতা, সে কবিতার form নির্দেশ করে বিশেষ সামাজিক পরিবেশ, তার ভাষা, তার মানসরূপ। আর, সার্থক কবিতা শুধু content-কে রূপই দেয় না, উত্তরণ ও করে। যেমন কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তন পূর্বতন content ও form নিরপেক্ষ নয়, তেমনি সাহিত্যের content বা form পূর্বতন content ও form নিরপেক্ষ নয়। আগামী দিনের বাঙলা কাব্যের গণকৃষ্টির সঙ্গে সংযোজন হবে পূর্বতন content ও form-এর, রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-ধারাকে স্বীকার করেই। সামন্ততন্ত্রী কাঠামোর ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য থেকেই যেমন গড়ে উঠেছে বুর্জোয়া কাব্য, তেমনি ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া কাব্যের বলিষ্ঠ ধারার মধ্যেই আছে কাব্যের অগ্রগতির সূচনা।

বাঙলা কবিতার গতিপথ তাই পূর্বতন ঐতিহ্যকে স্বীকার করে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে অনুভব করে এগিয়ে চলবে। অর্থনৈতিক সংকটের তীব্রতায় দিশেহারা যে মানুষ, তার আশা-আকাঙ্খা ও অনুভবকে রূপ দিতে হবে আজকের কবিকে, আবিষ্কার করে নিতে হবে সেই ভাষা, সেই কাব্যরূপ, যা সহজে জন-মানসকে স্পর্শ করে। শুধু তাই নয়, কবি সমাজের সর্বাপেক্ষা সচেতন ও ও সংবেদনশীল মানুষ, ; তিনি যেমন অনুভব করেন আজকের দিনের সুখ-দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য তেমনি অনুভব করেন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আরো প্রোজ্জ্বল রূপে। তাই আজকের কবির ভাষায় যেমন ফুটবে আজকের দিনের অভিজ্ঞতা তেমনি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও। সমাজ-সচেতন কবি জনমানসকে সেই সম্ভাবনার অগ্রদূত বলে অনুভব করে উদ্বুদ্ধ করবেন নতুন সমাজ-চেতনায়। কবিতা হয়ে উঠবে 'রসিকজন' সমাজের আশ্রয়স্থল নয়, জাগ্রত জন-চেতনার হাতিয়ার। আমরা সে "কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"

শ্রীসুখময় চক্রবর্ত্তী

(প্রথম বর্ষ, আর্টস)

পৃথিবী বদলাচ্ছে। পুরানো সমাজ ভেংগে পড়ছে, তারই মধ্যে থেকে হচ্ছে নূতনের অভ্যুদয়। এই যে পরিবর্তন, এরই মধ্যে রয়েছে গতি। তাই, গতিকে অস্বীকার করা চলেনা। বের্গসঁ তো গতিকে চরম বলে মেনে নিয়েছেন। অবশ্য তাঁর এই 'গতি' যান্ত্রিক বা উদ্দেশী নয়। যে 'elan vital' বা 'এলাঁ ভিতাল'কে তিনি চরম সত্য বলে বর্ণনা করেছেন, তা' হচ্ছে এক অবিচ্ছেদ্য জীবনপ্রবাহ। এই জীবন-প্রবাহের স্বরূপ ও গতি তা' নিছক গতিমাত্র।

বের্গসঁর এই 'গতিবাদ'এর সংগে রবীন্দ্রনাথের বলাকা-বর্ণিত গতিবাদের অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও, বের্গসঁর মতবাদ ও রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ পুরোপুরি এক নয় একটা মৌলিক প্রভেদ রয়েচে, যেটা পরে আলোচিত হবে।

'বলাকা'র সংগে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের পার্থক্য এতই পরিস্ফুট যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভাবে ও ছন্দে 'বলাকা' সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র ও অনন্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলের মধ্যে সাধারণতঃ রয়েছে এমন একটা সুর যা' প্রশান্ত, যা' কোমল, যা' অচঞ্চল প্রীতিরসাত্মকতার একটা মাধুর্য্য তাঁর করিতাগুলোকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। শেষের মধ্যে অশেষের বাঙ্ময় প্রকাশটুকুই তাদের লক্ষ্য। কিন্তু 'বলাকা'র সুর একটু বিশিষ্ট ছন্দটাও একটু অসাধারণ।

'বলাকা' চলার গান—অবিরাম, অবিশ্রান্ত গতিপ্রবাহ যা' বিশ্বব্যাপী প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তাই 'বলাকা'তে প্রত্যক্ষ রূপগ্রহণ করেছে। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ চিরকালই গতিধর্মী। উন্মুক্ত পথে-প্রান্তরের সংগে তাঁর বন্ধনগ্রন্থি চিরকালই দুশ্ছেদ্য কিন্তু তবুও এই গতির বাণী—এগিয়ে-চলার সুর 'বলাকা'র মতো আর কোন কাব্যেই ফুটে উঠেনি।

পৃথিবীতে দুটো শক্তিই নিরন্তর কাজ করে চলেছে—স্থিতি আর গতি, নিষ্ঠা আর নিষ্ক্রামণ, গতি চাইছে ছুটে বেরিয়ে পড়তে, স্থিতি চাইছে আঁকড়ে ধরে রাখতে। 'Static' আর 'dynamic'-এর দ্বন্দ্ব তাই চিরকালের। কিন্তু পরিণামে জয়ী হচ্ছে তা'রা, যা'রা গতিরই বাহক ও ধারক। গতির মধ্যেই সজীবতা, গতির মধ্যেই প্রাণধর্ম্মের সার্থকতা। "The old order changeth yielding place to new."

এই গতিরই মূর্ত্ত প্রকাশ তারুণ্যের মধ্যে। যৌবনের দিনগুলোতেই ঝংকৃত হয়ে উঠে এগিয়ে-চলার-ছন্দ। বলাকার কবি, তাই, তারুণ্যের উপাসক। 'যৌবন-বেদনারসে

উচ্ছল' দিনগুলি তাঁকে আজও উতলা করে তোলে। প্রাণাবেগ যাদের স্তিমিত, যাদের শিরায় শিরায় নেই উদ্দামতার চাঞ্চল্যের স্পন্দন, তাঁরা কবির অবিমিশ্র কৃপাপ্রার্থী। তাঁর যত সহানুভূতি, যত ভালোবাসা সবই গিয়ে পড়েছে সেই সৃষ্টিছাড়া, লক্ষ্মীছাড়াদের উপর—যারা যুগে যুগে বেরিয়ে পড়েছে পুরানোদিনের শৃংখলকে ভেঙেচুড়ে ধূলি ধূসরিত পথের উপর দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার অভিমুখে।—"Allons! the road is before us." (Whitman) সামনে পড়ে রয়েছে দিগন্ত জোড়া পথ। পিছনে রয়েছে পুরানো দিনের আবর্জনা। 'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির' অবসান প্রায় হয়ে এল তাই, বেরিয়ে পড়ুক ঘরছাড়াদেব দল—

"এসেছে নিষ্ঠুর,
হোকরে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পত্রে চুর।"

পুরাণো পৃথিবীর অবসান প্রায় হয়ে এল। যুগ-পরিবর্তনের লক্ষণ উঠছে ফুটে। বৃহৎ দুঃখবেদনার মধ্যে দিয়ে তাতেই অরুণোদয়ের লোহিতাভ আভাস পরিস্ফুট। এসময়ে, তাই, পুরাণোকে আঁকড়ে ধরা মূর্খতা।—

"বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হ'ল শেষ
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবেনা"

বঞ্চনা উঠেছে বেড়ে। সত্যের পুঁজি এসেছে ফুরিয়ে। তাই, নতুন সমুদ্র-তীরে পাড়ি দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। আকাশের কোণে ঝড়ের সংকেত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আলোকের দিশা হারিয়ে গিয়েছে অন্ধকারের মাঝে। ভেসে আসছে দিগন্তে উদ্বেল তরংগশ্রেণীর কলোচ্ছ্বাস। কিন্তু তবুও, আদেশ এসেছে—

'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল, এসেছে আদেশ
বন্দরের কাল হল শেষ।"

এই যাত্রা করার আকাংক্ষার মধ্যেই রয়েছে চলিষ্ণু মনের ছোঁয়াচ। যারা যাত্রা করবে, তারা যে গতিরই শরীরী প্রকাশ। তাই, কবি প্রথমেই গাইলেন তাঁদের বন্দনা গান—চিত্রিত করলেন, অভিযাত্রীক সবুজের অভিযান।—

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণজরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছিল্ ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল মাল্য-গাছা
আয়রে অমর আয়রে আমার কাঁচা।"

পথে যারা বেরিয়ে পড়েনি, গতির বাণী যাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি, বদ্ধ ঘরের অন্ধ কোণেই যাদের দিন কাটে, আপদ-বিপদকে এড়াবার জন্য যারা অন্তঃপুরচারী হয়ে রয়েছে, তাদের দিকে কবির সহানুভূতি নেই, বরং তাদের দুর্দশায় তাঁর মন কৃপাপূর্ণ। তাই, তাদের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন।—

"ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটী ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধকরা খাঁচায়।"

যৌবনের নিরবিচ্ছিন্ন গতির যে বাণী কবির কাছে এসে পৌঁছেছে, তাই মন্ত্রস্বরে বিঘোষিত হয়েছে রুদ্রের প্রলয়-শংখের নিনাদে। শংখের মধ্যে গতিময় বিশ্বেরই অভিব্যক্তি। এই সুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনি বিঘোষিত হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলবার জন্য। অন্যায় যা', অসত্য যা' তা' গতিরই বিরোধী। যৌবন-পিয়াসী কবির তাই প্রার্থনা :—

যৌবনেরই পরশমণি করাও তবে স্পর্শ।
দীপকতানে উঠুক্ রণি' দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার করে, উদ্বোধনে গগন ভরে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও না আতংক।
দুই হাতে আজ তুল্‌ব ধরে তোমার জয় শংখ।"

স্থিতির মধ্যেও আছে গতি। বের্গসঁ 'duration'-এর মধ্যেও দেখেছেন 'change'। গতিহীন বিশ্বের স্থিতিশীলরূপ তাই কল্পনা করা চলেনা। অনন্ত কালপ্রবাহ বয়ে চলেছে, অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎ তারই মধ্যে। অবশ্য, যাকে বর্তমান বলি সে তো অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝে একটা 'hyphen'বা সংযোগ-রেখা অংশ। এই মুহূর্তে যা' বর্তমান পরবর্তী মুহূর্তে তাই তো অতীত। আর এখনো যা' ভবিষ্যৎ, আর একটু পরে তাই তো বর্তমান। এই তিন কাল তাই বিচ্ছিন্ন নয়। ভবিষ্যতের মধ্যে রয়েছে অতীতেরই প্রভাব, আবার অতীতের মধ্যেই রয়েছে ভাবীকালের সম্ভাবনা। এলিয়টের কথায় তাই, বলতে হয়—

"Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past." (Burnt Norton)

অতীত পথে পথে বেড়ে চলছে ভবিষ্যতের দিকে, জীবনও এগিয়ে চলেছে জানাকে ভেলে রেখে, অজানার সন্ধানে, পেছনকে পেছনে রেখে অন্তহীন ভবিষ্যতের পানে। নিরুদ্দেশ যাত্রার সুর তাঁর চলার রাগিণীতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। কবি তাকে কল্পনা করেছেন, ভৈরবী বৈরাগিণী রূপে।

তাই, গেয়েছেন :—

"হে ভৈরবি, ওগো বৈরাগিণি,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ, সেই চলা তোমার রাগিণী—
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘর ছাড়া।"

এই যে নিরুদ্দেশ চলার রাগিণী, এই তো জীবনের গীতি। এগিয়ে চলাই তো জীবনের ধর্ম। যেখানে এই যাত্রার হবে শেষ, সেখানে হবে জীবনের অবসান। যা গতির বিরোধী, তা প্রাণধর্মেরও বিরোধী। নিরন্তর প্রয়াসের ছন্দেই জীবনের সুর ঝংকৃত। তাই, প্রয়াস যেখানে থমকে দাঁড়াবে, সেখানেই স্থাপিত হবে জড়ের আধিপত্য। তাই, কালভৈরবীর নিরন্তর অগ্রগতি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেও, তখনি—

উচ্ছ্বসিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর আঘাতে।"

ধ্বংসের মধ্যেই রয়েছে নবজীবনের বীজ। দগ্ধশেষ ভস্মরাশির মধ্যে থেকেই জন্ম নেয় সবুজ প্রাণের কিশলয়। সৃজন ও ছেদন চলে পাশাপাশি। যেখানে ধ্বংস নেই, সেখানে সৃজনও নেই। তাই সৃষ্টির মধ্যেই থাকবে, ধ্বংসের প্রেরণা। 'যা কিছু মলিন, যা' কিছু কালো' তার সবই যাবে ধূলোয় মিশিয়ে, কিন্তু এরই মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কালো। তাই, কবি গাইলেন :—

"ওগো নটি, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্যসুন্দরী
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বেরে জীবন।
নিঃশেষে নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।"

অলক্ষিত চরণের, অকারণ, অবারণ চলা কবিকে উতলা করে তুলেছে। 'ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত' বলাকার পক্ষোন্মিঘাতে চঞ্চল বায়ুসমুদ্রের কম্পন কবির কাণে এসে পৌঁছিছে। তাঁর নাড়ীতে নাড়ীতে আজ চঞ্চলের পদধ্বনি অনুরণিত হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের ঢেউ, অরণ্যের ব্যাকুলতা আজ কবির মনের মধ্যে কম্পমান। তাই তাঁর মনে পড়ে সেই কথা :—

"যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে,
নিশীথে প্রভাতে যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে
গান হতে গানে।"

বের্গসঁ বলেছেন, গতিময় বিশ্বকে উপলব্ধি করতে হ'লে, শুধু বুদ্ধি দিয়ে হয় না। দরকার নিজের অস্তিত্বকে এই বিশ্বের অস্তিত্বের সংগে মিশিয়ে দেওয়া, স্বজ্ঞা (Intuition)-র সাহায্য গ্রহণ করা। বুদ্ধি দিয়ে আমরা যা' জানি, তা নেহাৎই অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিপ্রদ। স্বজ্ঞার দ্বারা যে জ্ঞান আমরা পাই, তা'তেই সম্পূর্ণতার সুর ঝংকৃত। এই পর্য্যন্ত অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সংগে বের্গসঁর কোন অনৈক্য নেই। কবিরা সাধারণতঃ স্বজ্ঞায় আস্থাবান হয়েই থাকেন। কিন্তু বের্গসঁ চলাকে দেখেন নিছক চলা হিসাবেই। গতি তার কাছে গতিমাত্র। গতির চরম সার্থকতা গতির মধ্যেই। গতিকে অতিক্রম করে বের্গসঁর দৃষ্টি যায় নি। সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে অপরিবর্ত্তনীয়ের দিকে যাওয়ার প্রয়াসটা, বের্গসঁর চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গতিকে নিছক গতি হিসাবেই বর্ণনা করেননি। গতির ঊর্দ্ধে এক অপরিবর্ত্তনীয়কে পাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না, কিন্তু তা' বলে' চলাটাও উদ্দেশ্যবিহীন নয়। তাই, এই চলাকে তিনি দেখেছেন—অতল আঁধার হ'তে অকূল আলোতে যাওয়ার পথ হিসেবে— অপ্রকাশ হতে সম্প্রকাশে ঊর্দ্ধগমনের সোপান রূপে।

ঐতরেয় আরণ্যকের ঋষি গেয়েছেন :—

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বচ্ছ উদম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।

'চরৈবেতি, চরৈবেতি' এটাই 'বলাকা' কাব্যের মূল সুর। রবীন্দ্রকাব্য এখানে শুধু গীতি-ধর্ম্মীই নয়, গতিধর্ম্মীও বটে। 'বলাকা' কাব্যেব মূল সুর গতির বাণী "বলাকা" কবিতায় যে রকম প্রকাশ পেয়েছে, এমন আর কোন কবিতাতেই হয়নি। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে ঝিলমের উপত্যকাব উপর। তাঁরই মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি গতির যে মূর্তিময় প্রত্যক্ষরূপটুকু দেখেছেন, তা'ই এই কবিতাটাকে একটা বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছে।

শূন্যের প্রান্তরদিয়ে কাজের বিদ্যুৎছটা তুলে, যে হংসশ্রেণী অনির্দ্দেশ্য লক্ষ্যের দিকে উড়ে চলে গেলো, তাদেরই পক্ষবিধুননে তিমির-মগ্ন গিরিশ্রেণীর মধ্যে বেগের আবেশটুকু সঞ্চারিত হল। তারাই, সুপ্তির রাজ্যে জাগ্রৎ জীবনের সুরটুকু এনে দিল। আর তাতেই, কবি স্বজ্ঞার সাহায্যে উপলব্ধি করলেন, বিশ্বময় গতির অবাধ আধিপত্যকে। কবির নিজের কথাতেই বলতে ইচ্ছে হয়—'বলাকা'বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার (৩৬ 'বলাকা') মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না। কিন্তু বলাকার পাখা সে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, সেটাই এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলোর মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে।"

পৃথিবীর প্রতিটি জিনিষের মধ্যেই রয়েছে গতির এক দুর্বার উন্মাদনা।

এই উন্মাদনাই পর্ব্বতকে বৈশাখের মেঘ হতে প্রণোদিত করে তোলে, তরুশ্রেণীকে মাটির বন্ধনটুকু অস্বীকার করে গতিসমুদ্রে দিশাহারা হতে অনুপ্রাণিত করে তোলে। কিছুই, তাই, থেমে নেই। সবাই চলছে—কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে। নিরুদ্দেশ যাত্রার পথ—তার তো অবসান নেই :—

"You road. . . .

I believe you are not all that is here". . . (Whitman)

তাই বাসাছাড়া পাখীর উদ্দেশ্যহীন উড়ে চলার ছন্দে, ঝংকৃত হয়ে ওঠে আবেগচঞ্চল গতিময় বিশ্বের বাণী :—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।"

সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতা

তরুণ সরকার

(চতুর্থ বর্ষ, আর্টস)

কাব্যের নদীতে যে জোয়ার-ভাঁটার খেলা চলে, সাহিত্যের ছাত্রেরা সে-সত্যের খবর রাখেন। কখনো ফুলে-ফেঁপে-ওঠা, কখনো শীর্ণ স্রোত। মনে হয় ইংরেজি কবিতার এখন ভাঁটার সময় চলছে। অথচ দশ-পনের বছর আগের কথা মনে করুন; ইংরেজি কাব্যের আকাশে অনেক নক্ষত্রকেই তখন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় মনে হচ্ছিল; অডেন, ডে লুইস, স্পেণ্ডার। এঁরা যে সকলেই নিভে গেছেন এমন নয়, কিন্তু পূর্ণ জ্যোতির স্থিরতায় পৌঁছননি' কেউই; বিভিন্ন কারণে সকলেই কিছুটা পথভ্রান্ত, খণ্ডিত। কেন এমন হ'ল ? আধুনিক ইংরেজি কাব্যের মর্মগ্রাহী পাঠক এ প্রশ্ন করতে পারেন, করছেনও। এবং এ-প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে গত পনের-কুড়ি বছরের ইংরেজি কাব্যের গতি-প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়ত কিছুটা সাহায্য কবতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইংলণ্ডে যে-কাব্যধারার সূত্রপাত হয়, জর্জিয়ান কবিতার সঙ্গে তার ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সে নতুন কাব্য জাতে ছিল কালাপাহাড়ী : তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয়কে একদিকে যেমন সে প্রচণ্ড আঘাত করছে, অন্যদিকে আপন বৈনাশিক বুদ্ধি ও মূল্যবোধগত অন্তঃসারশূন্যতাকেও বিদ্রূপে জর্জ্জরিত করতে ছাড়ছে না। জীবনের পুবোনো মূল্যবোধ পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু শূন্যস্থান ভরানোর জন্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো নতুন বিশ্বাস, কোনো নৈমিতিক প্রত্যয়। তাই এলিঅটের ভাষায় 'waste and void, waste and void' : পোড়ো জমি আর ফাঁপা মানুষ, ফণিমনসা আর শীতের হলুদ পাতা। কিন্তু শূন্যস্থান

ভরানোর প্রয়োজন প্রখর হ'য়ে দেখা দিল ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে। বিশ্বব্যা অর্থনৈতিক সঙ্কট ও স্পেনের গৃহযুদ্ধ—এই দুই সমস্যার সন্নিপাত ইংরেজ কবিকে অ নৈরাজ্যবিলাসী থাকতে দিল না, বাধ্য করল কোনো নিশ্চিত জীবনদর্শনের ছায় আশ্রয় নিতে। ইতিমধ্যে রাশিয়াতে সাম্যবাদ যথেষ্ট শিকড় ছড়িয়েছে: তার ঋজুত আবেদন বিপ্রলাপিত কবির কাছে কম নয়। কিন্তু নিজেদের অন্তরকে যথেষ্ট যাচ না ক'রেই ১৯৩০ সালের অনেক কবি সাম্যবাদকে গ্রহণ করলেন। এর ফ ইংরেজি কবিতায় অনেকদিন পর আবার বিশ্বাস ও আশার সুর ফিরে এল বে কিন্তু যে ফাঁকিটুকু র'য়ে গেল তা' পরে ক্ষতি করল অনেক। অডেনের 'Th Orators' স্পেণ্ডারের 'Poems' এবং ডে লুইসের 'The Magnetic Mountain প্রভৃতি গ্রন্থে সাম্যবাদ ও কবিতার সংশ্লেষণের প্রয়াস দেখা গেল। কয়েকটি কবিতায় এই সংশ্লেষণ সার্থক হ'য়ে দেখা দিলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হ'ল ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার সূত্র ধরে'ই বোধ হয় আজকের দিনের ইংরেজি কবিতার বন্ধ্যাত্বের কারণ খুঁজতে হবে। অবশ্য সব কবিই যে সাম্যবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, বয়স্ক কবিদের অনেকেই ধর্ম্মবিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সমস্যার সমাধান করলেন: এলিঅট নোঙর ফেললেন Anglo-Catholicism-এ, এডিথ সিটওয়েলের অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতায় ক্রাইষ্ট, উপনিষদ আর মানবতা এক হ'য়ে গেল।

১৯৩০ সালের পর তা'হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইংরেজ কবিরা দু'ভাগে বিভক্ত: সাম্যবাদ-প্রভাবিত একদল, অন্যদল ধর্মমুখী। কিন্তু কোনো দলই উল্লেখ-যোগ্য কিছু সৃষ্টি করতে পারলেন না। তথাকথিত সাম্যবাদী কবিদের কাছ থেকেই আমরা আশা করেছিলাম বেশী, কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে হতাশ করলেন। দু'তিনটি বই প্রকাশের পর, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া ঘনাতে না ঘনাতেই, কেউই আর সাম্যবাদ নিয়ে খুসী থাকতে পারলেন না। অনেকে কবিতা লেখাই বন্ধ করলেন, কেউ খুঁজলেন ব্যক্তিগত ধর্ম কিংবা mysticism-এর আশ্রয়। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে সাম্যবাদকে তাঁরা চিন্তা দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, আবেগ দিয়ে করেননি। সাহিত্যজগতেও ফ্যাশানের হাওয়া দেয়, ১৯৩০ সালে সাম্যবাদটাই ছিল ফ্যাশান। আর ফ্যাশানের মোহ ছাড়া অন্য তাগিদাও ছিল: অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ধন-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের কাছে সাম্যবাদ ছিল 'the nearest port in a storm'। সঙ্কট যখন কেটে গেল, সাম্যবাদে আগ্রহও সঙ্গে সঙ্গে ঢিলে হ'য়ে আসতে লাগল। অডেন ছুটলেন আমে-রিকায়, চিন্তার বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে স্পেণ্ডারের কবিতা দুরূহ হ'তে সুরু করল, ডে লুইস যদিও সবচেয়ে স্থিতধী, তবু তাঁর কলমের রসের ধারা শুকিয়ে আসতে লাগল। অন্যদিকে এলিঅটের 'Four Quarlets' যদিও তাঁর নিজের পরিণতির

ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ইংরেজি কবিতার ধারাকে এগিয়ে দেওয়ার কাজে তার কোনই দান নেই। এবং ইদানীংকার সিটওয়েলের কাব্য যদিও প্রাক্তন সিট-ওয়েলের কাব্যের চেয়ে অধিকতর শ্রীমণ্ডিত, তবু তাঁর প্রদত্ত সমাধান বিশেষভাবেই তাঁর, আধুনিক অন্য কোন ইংরেজ তাঁর চিন্তার সহযোগী হ'তে পারবে কিনা সন্দেহ।

বর্ত্তমানে যে ইংরেজি কাব্যে মহৎ বা উল্লেখযোগ্য কোনো সৃষ্টি হচ্ছে না, তার আংশিক কারণ তাই ইংরেজ কবিদের অক্ষমতা : কোনো সুস্থ, বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গ্রহণের অক্ষমতা। কারণ শুধু প্রাকরণিক নিপুণতার দ্বারাই মহৎ কবিতার সৃষ্টি হয় না, মহৎ কবিতা অপেক্ষা রাখে মহৎ বিশ্বাসের। অথচ আধুনিক ইংরেজের জীবনে তেমন বিশ্বাসের যে কোনো অবকাশ নেই এমন কথা ভাবাও অসঙ্গত। কারণ যুদ্ধের মধ্যে, Battle of Britain-এর নিঃসঙ্গ সংগ্রামে ইংলণ্ডবাসী যে তিতিক্ষা ও আশাবাদের পরিচয় দিয়েছিল তা' আশ্চর্য। আর যুদ্ধের পর দেউলিয়া জাতীর জীবনকে স্বাবলম্বী করবার চেষ্টায় তার যে অতুলনীয় নিষ্ঠা, কষ্টস্বীকার ও অধ্যবসায় তা' ততোধিক বিস্ময়কর। বরং এইটাই অসঙ্গত যে ইংরেজ কবি এই পটভূমিকায় থেকেও জীবন সম্বন্ধে আশান্বিত হ'লেন না। ম্যাকনীসের 'Holes in the sky' পড়লাম, তিনি অস্থির, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, সুস্থ হতে পারছেন না। অডেনের 'The Age of Anxiety'তে নিখুঁত কবিকর্ম অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, কিন্তু বইটির বিভিন্ন সুর যেখানে এসে মিলেছে, সেটি হতাশার সুর :

> " Man has no mean; his mirrors distort;
> This greatest arcadias have ghosts too;
> This Utopias tempt to eternal youth
> Or self-slaughter."

সহস্র বিপদের মাঝে যে-জাতি একা দাঁড়িয়েছিল, নিঃস্ব হ'য়েও যে-দেশ ভেঙে পড়ছেনা সে-দেশের, সে জাতির কবির কি এর বেশী আর কিছু বলবার নেই ?

দু'দিন

শ্রীমনোজকুমার পাল

(তৃতীয়বর্ষ—বিজ্ঞান)

সরু বারান্দাটা। এককোণে গোটাদুই ষ্টীলট্রাঙ্কের ভগ্নাবশেষ। উপরে খানকয়েক অব্যবহার্য ছেঁড়া কাপড়। একপাশে একটা তুলো-বেরকরা অপুষ্ট বালিশ। খোলা দরজার বাইরে গৃহস্থালির কয়লা স্তূপীকৃত। চোখে পড়ে সবুজ মসের পুরু আস্তরণে ঢাকা চুণবালিবিহীন দাঁত বেরোন নড়বড়ে পাঁচিলের একটুখানি। এক কোণে ভাত খাচ্ছে মিনতি। বারান্দার

মাঝখানে অনাবশ্যক জায়গা জুড়ে ঠ্যাং মেলে চা'ল ঝাড়ছেন ওর ঠাকু'মা। সামনে গুটীদুই চড়াইপাখী ছড়িয়ে পড়া চা'লের প্রত্যাশায় মুখ উঁচু করে ব'সে।

—'কেমন আছ, ও ঠাক্‌মা?' কাছে যেয়ে ত্রিপদী বেঞ্চিখানার একটা কোন দখল ক'রে বসি।

—'আরে ওটায় বসিস্ নি। প'ড়ে হাত-পা ভাঙ্গবি? ব'স এখানটায়।' ঠাকু'মা আঁচলটা বারদুই নিজের পাশে মেঝেতে বুলিয়ে জায়গাটা নির্দেশ ক'রলেন। সুতরাং সাবেক আসন ছেড়ে নেমে ব'সতে হ'ল।

—'ছুটী ক'দিন? এলি কখন্? কালকে বুঝি?' ঠাকু'মার একসঙ্গে একঝুড়ি প্রশ্ন।

জবাব দিই, 'ছুটী মোটে দু'দিনের। কালই যাব। আর এলাম ত' এই মাত্তর। এখনও বাড়ী যেয়েই পৌঁছুই নি। কাল এসেছি, তুমি বিশ্বাস করো ঠাক্‌মা। তা' হ'লে এই পুরো একদিন তোমাকে না দেখে আমি থাকি? তুমিই বলো। কি ঠাক্‌মা?' ঠাকু'মার দিকে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসি।

—'হ্যাঃ। বুড়ির কি আর আছে সে বয়েস?' ফোঁস ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করেন 'ঠাকু'মা। অর্ধশতাব্দী আগেকার এক ষোড়শী তার উদ্দাম প্রাণপ্রাচুর্য আর অঝোরঝরা চপল হাসি নিয়ে জেগে ওঠে মনশ্চক্ষে। অদূরে ভাতের থালার উপরে স্থির হ'য়ে থাকা মিনতির আঙুলগুলোর পানে দৃষ্টি মেলে ব'সে থাকি।

হঠাৎ মিনতির দিকে চেয়ে বলেন ঠাকু'মা—'কি রে, হাঁ ক'রে ব'সে রইলি যে। ছেলেটা এলো না খেয়ে-দেয়ে। হাত ধুয়ে কিছু খেতে-টেতে দে।' স্বরটা বিরক্তিতে ঝাঁজালো।

—'কেন ব'সে আছে জান, ঠাক্‌মা? আমার সামনে লজ্জায় ওর ভাত মুখে উঠ্‌ছে না। যে রাক্ষুসে হাঁ। দেখে ফেলি যদি।' হাল্কা ঠাট্টায় আবহাওয়াটাকে হাল্কা ক'রে দিতে চেষ্টা করি।

—'হ্যাঁ, ভারী ত' লজ্জা। ব'লছে ওকে গলা ধ'রে।' নিজের কথায় নিজেই লজ্জিত হ'ল বুঝি মিনতি। ফরসা গাল দু'টো রক্তিম হ'য়ে উঠল ক্ষণিকের জন্যে। শেষফল রাগটা প'ড়ল ভারতের উপরে। আমার দিকে মুখ ক'রে গোগ্রাসে গিলতে সুরু ক'রল। খাওয়া শেষ ক'রে হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকল মিনতি।

—'কিরে, নতি, দে কি দিবি।' ঘরে ঢুকি আমিও।

—'দেবে কি ছাই। বুড়ি ত' ব'লেই খালাস। আছে ও বেলার বাসি ভাত। খাবে?'

'তুই যা খেলি ওই ত'? তা' দে না', বলি অম্লান বদনে, 'কই ওঠ্।'

উঠবার লক্ষণ দেখায় না মিনতি। 'নিজের বাড়ী আছে। গিয়ে খাওগে না।' হ্যাংলা কোথাকার।' ঝংকার দিয়ে ওঠে ও।

অনেকক্ষণ থেকে একটুকরো কাপড় নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রছিল ও। জিজ্ঞেস করি, 'কিরে ওটা? টেবিল ক্লথ ক'রবি? দে, একটা ছবি এঁকে দিই।'

অনাবিল খুসিতে ওর মুখটা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ডাগর চোখ দু'টো আনন্দে ছোট হ'য়ে আসে। সত্যি দেবে এঁকে? বড় ভাবনায় প'ড়েছিলুম, কাকে দিয়ে এঁকে নেব।' আকুতিতে ভেঙে পড়ে মিনতি। ফুল লতাপাতা—পানির দাদা যেমন এঁকে দিয়েছে পানিকে। না, তার চেয়েও ভাল হওয়া চাই কিন্তু। উঁহুঁ, ও কি হ'চ্ছে। দুষ্টুমি ক'রে খারাপ ক'রে দেবে বুঝি? তা' হ'লে কিন্তু ফেলে দেব ও কাপড়টা। বারে, বেশত' হল ফুলটা!' ও বক্‌বক্ ক'রেই চলে।

—খাটিয়ে নিচ্ছ এত ক'রে। অথচ সেই কতক্ষণ থেকে ব'লছি খিদে পেয়েছে। হাতের কাজের প্রতি এত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অনুযোগ করি।

—'বড্ড জ্বালাতন কর তুমি, দেবীদা। তুমি যা' তা' খেতে চাইলেই বুঝি আমি দিতে পারি। বলো তুমিই।'

এই সব মুহূর্তগুলো আসে বহুদিন অন্তে ক্বচিৎ কদাচিৎ যখন নিতান্ত সহজ মিনতির একান্ত স্পষ্ট ক'রে বলা কথাগুলোও দুর্বোধ্য মনে হয়। কেমন যেন এই কথাগুলো। বাইরে থেকে যেমন দেখি, তারা ঠিক তেমন নয়। হাল্কা তাদের ওজন। কিন্তু তাদের গভীরত্ব মনকে অভিভূত ক'রে দেয়,। কাছে থেকেও কেমন যেন না বোঝাবার ব্যবধানে স'রে যায় মিনতি। তবুও ভাবতে ব'সে দেখি দূরের মিনতি কাছের হ'য়ে এসেছে। আশ্চর্য!

সন্ধ্যেবেলা অন্ধকার শয্যায় শুয়ে জানলা দিয়ে চেয়েছিলুম বাইরে। মা এলেন পাড়া বেড়ানো শেষ ক'রে।

—'দিন দিন যত বড় হচ্ছিস্, তত তুই কি হচ্ছিস্ বলত', দেবি।' স্বরটা ঝাঁজালো। বুঝতে পারি জরুরি কোন কিছুর ভূমিকা শুরু হ'ল সবে। সুতরাং একটা কৃত্রিম নিঃস্পৃহতার ভাব নিয়ে বাইরে চেয়েই শুয়ে থাকি!

—'ছিঃ ছিঃ, আজও আমরা বাপ মা বেঁচে রয়েছি। একটু লজ্জাভয়ও ত' থাকে মানুষের।'

নিঃস্পৃহতা রক্ষা করা আর সম্ভব নয়। বিরক্তিভরে মুখ ফিরিয়ে বলি, 'কেন কি হ'ল?'

—'ও বাড়ীতে কেন গিয়েছিলি তুই আজ আবার?'

—'মিছে কথা। আমি যাই নি।'

—'দেখ্, আমাকে বোকা ঠাওরাস্ নে। বুড়ি মিছে ব'ল্লে।'

হতাশ হ'য়ে বিছনায় গা এলিয়ে দিলাম। এমন স্বপ্নময় সায়াহ্নের যে একটা সম্পূর্ণ ছন্দোবৈচিত্র্যময় কবিতা গড়ে উঠছিল মনে নির্মম আঘাতে তা' টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে

গেল। ছোট্ট একটু ব্যথা জেগে ওঠে প্রাণে—প্রতিবাদের লেশবিহীন, অসহায়তার কারুণ্যে ভরা। আগেকার দিনে এজন্যে রাগ হ'ত, দুঃখ হ'ত, মনে আস্‌ত প্রচণ্ড একটা নালিশ। এখন বুঝি এ ঘট্‌বেই। ক্ষণিকের এইটুকু অবসরে এই যে সুন্দর এসে ধরা দেয় মনের মধ্যে, এই যে ভেঙ্গে শতখণ্ড হ'য়ে হারিয়ে যায় তা' দুনিয়ার অর্থহীন অবাঞ্ছিতের তাড়নায়—একেই জীবনের সত্য ব'লে মেনে নিয়েছি এখন। তবু ব্যথা বাজে।

—'বুড়ির কি তেজ। আমার মুখের সামনে হাত নেড়ে মুখ নেড়ে কথা বলে। মিনতির ঠাকুরমার পক্ষে এ অমার্জনীয় অপরাধ। সে বিদ্যায় মায়ের পারদর্শিতা অনেকদিনের। পাড়ার মেয়েমহল থেকে তিনি যোগ্যতার সার্টিফিকেটও পেয়েছেন এজন্যে। অতএব আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে তাঁর।

—'তা এই ভর্‌সন্ধ্যেয় ব'লে রাখ্‌ছি, বাপু ঘরে যার সোমত্ত মেয়ে তার এত দেমাকও ভাল নয়। আর মেয়েও ত' তেমনি। নাক-লজ্জা-ছায়া ব'লে কিছু যদি থাকে। নিত্যদিন সাঁঝ প্রদীপ দেখানো হ'লে পাড়া বেড়িয়ে ফেরেন! দেখা যাবে ও মেয়ের—

দার্শনিক নিঃস্পৃহতায় তখন মন ভ'রে উঠেছে আমার। মনে হ'চ্ছে জগৎ মিথ্যে মানুষ মিথ্যে; তার ঘরকন্না, ঝগড়াঝাঁটি এত' দুদিনের খেলাঘরের মত অর্থহীন। আশ্চর্য হ'য়ে যাই আমি। যখন দশটা-পাঁচটা অফিস ক'রে কলেজ সেরে মহানগরীর রাজপথ বেয়ে মেসে ফিরি, তখন সেই পরিচিত নোংরা স্যাঁতসেঁতে গলির মধ্যে মেসবাড়িটায় বন্ধুবান্ধবদের তাস পাশা দাবা আর একঘেয়ে বহু পুরাতন অশ্লীল ঠাট্টাবিদ্রূপের কল্পনায়ও মন কেমন বিরূপ হ'য়ে ওঠে। তখন মনে পড়ে বাড়ীর কথা—মা বাবা আছেন। আমার আছে ছোট ভাই বোন। সে বাড়ী আশৈশব পরিচিত এই বাড়ী। কি ভাবতে বিস্ময় লাগে,—সেই মনে পড়া বাড়ীর স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের তফাৎ ও র'য়েছে কত। তখন মনে হয় শ্যামশ্রীময়ী পল্লীর বুকে এ বুঝি আমার 'ছায়া সুনিবিড় শান্তি নীড়'। এখানে সহরের আলোকবাহুল্য নেই। আছে শান্তস্তিমিত আধো অন্ধকার, আছে সব ভুলানো ঘন শ্যামরূপ। অথচ বহুদিন অন্তে প্রতিবারেই গাঁয়ে ফিরি। প্রতিবারেই দেখি, আছে সবই; কিন্তু তার সঙ্গে আরও র'য়েছে সংসারে হাজার রকমের টুকিটাকির অবাঞ্ছিত প্রশ্ন, আছে নিতান্ত অর্থহীন ঝগড়াবিবাদ—পারিবারিক এবং সামাজিক। প্রতিবারেই ভুল ভেঙ্গে যায়। তবুও যখন ক'লকাতায় ফিরি তখন দিনান্তে আবার এই ভুল ক'রতেই যেন ভাল লাগে। কী অদ্ভুত হ'য়ে গেছে জীবন। ভুলের অবলম্বনে মনকে আশ্বস্ত করবার অর্থহীন চেষ্টা চারিদিক জুড়ে।

ওদের আর আমাদের বাড়ীর মাঝখানে ছোট্ট একটি পুকুর। পুকুর ঘুরে ওদের বাড়ীর সামনে দিয়ে ষ্টেশনের রাস্তা। পড়ন্ত রোদে ব্যাগ হাতে চ'লেছিলাম। জানলা

দিয়ে ডাকল মিনতি। আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম, নিজের সম্পূর্ণ অজান্তে এই ডাকটুকুরই প্রত্যাশা ক'রছিলাম এতক্ষণ। সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও নিরাসক্ত কণ্ঠে বলি, 'গাড়ীর সময় হ'য়ে গেছে।'

—'তা হ'ক গে, এসো না। বাবা বাড়ী নেই। ঠাক্‌মা ঘুমচ্ছে। ঝগড়া ক'রবে না কেউ তোমার সঙ্গে।'

কাল্পনিক অনিচ্ছা দেখিয়ে পথ ছেড়ে ঘরে উঠি। অনেক গল্প হ'ল, ক'লকাতার গল্প। জাদুঘরটা কেমন, চিড়িয়াখানায় কি কি জন্তু আছে, ময়দানটা কত বড়, আমাদের 'বকগাড়ীর মাঠের' চেয়েও বড় কি না, ইত্যাদি অনেককিছু—যার জবাব ইতিপূর্বে কতবার দিয়েছি; তবুও ওর আশা মেটেনা যেন। ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ বড় মায়া হয়। মাতৃহীন অল্পশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—নিজের চেষ্টায় চিঠিপত্তরগুলো লিখতে শিখেছে শুধু চলনসই মত। কত ওর জানবার ইচ্ছে, দেখবার সাধ। কাঁচামনের সে সব আগ্রহ মেটাবার নেই কোন সম্ভাবনাই। ওর বয়েসী সহরের মেয়েদের দেখেছি—চলনে বলনে ওর থেকে কতো আলাদা।

হঠাৎ বলে মিনতি, 'কাল তোমার জন্যে চা আনিয়ে রেখেছি। বোস একটু। ও চ'লে গেল রান্নাঘরে। ব'সে ব'সে একটুক্‌রো কাগজের উপরে হিজিবিজি দাগ কেটে চ'লেছি। কাগজ এবং কালির আঁচড়। মনে প'ড়ছে অফিসের কথা। কাল কাল হরফে ভর্তি রাশীকৃত কাগজের অন্তরালে ব'সে কাগজের ওপরে কালির অক্ষরে মোটা মোটা টাকার অঙ্ক লিখে চ'লেছে দুঃস্থ কেরাণী, যার পকেট নাড়া দিলে তিনটি কি চারটি তাম্রমুদ্রা শব্দ ক'রে ওঠে—দিনান্তে বাসায় ফেরবার ট্রাম ভাড়া হয়ত।'

মিনতি চা নিয়ে এল। হাতের কাগজটা দেখিয়ে বলি, 'বলত', নতি, এটা কী জন্তুর ছবি হ'লো? এই যে গণেশ মার্কা পেট আর টেকো মাথা?

মিনতি কাগজের উপরে ঝুঁকে প'ড়ে সবিস্ময়ে বলে, 'জন্তু কে ব'ল্লো। মানুষ ত' একটা।'

—ঠিক চিনেছিস্ ত'। অনেকটা আমাদের অফিসের বড় কর্তার মত দেখ্‌তে! চিড়িয়াখানার কথা বলছিলি ত' তখন? এই রকমের জন্তুগুলোকে সেখানে খাঁচায় পুরে রাখলে কেমন হয় বল্‌ত'?'

মাঝে মাঝে বড় ভুল হ'য়ে যায়। এ সব অর্থহীন বাজে বক্‌ছি মিনতির সঙ্গে; মিনতি কী বুঝবে এসব কথার? ক'লকাতার নামে ওর চমক লাগে। সওদাগরি অফিসের ত্রিতল বাড়ীটাকে ও সম্ভ্রম ক'রবে। কিন্তু বুঝবে না তার মর্মবেদনা।.....

ট্রেণ চ'লেছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে ব'সে আছি। টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা সব। আপাত চোখে মনে হয়, একটার থেকে আর একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে টের পাই, এরা ছন্দোহীন খাপছাড়া নয় মোটেই। একটার সঙ্গে আর একটার

যোগসূত্র নেই হয়ত'। তবুও সবগুলো মিলিয়ে গ'ড়ে উঠ্‌ছে যেন একটা বিনিসুতোর মালা! জীবনের এই দু'দিন সমস্ত জীবনের অসংখ্য দিনের ভীড়ে নিতান্ত নগণ্য। এ দুদিনে যা ঘটল তাও ত' ছেঁড়া ছেঁড়া—বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন। তবুও এরা সত্যি। সুদীর্ঘ জীবনের সামগ্রিক রূপটাও নিহিত রয়েছে যেন এদের খণ্ডরূপের মধ্যেই।.....

জানলার বাইরে সবুজ দিগন্তটা ঘুরছে চক্রাকারে। লাইনের দুপাশের পাছপালা ছুটে চ'লেছে পিছনে। মিনতি প'ড়ে রইল পিছনে। প'ড়ে রইল কে ব'লেছে! জলস্থল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত ক'রে যে অফুরন্ত জীবনপ্রবাহ সেই প্রবাহের মুখে ভেসে চ'লেছে গ্রহ উপগ্রহ, অগণন জ্যোতিস্কপুঞ্জ, নীহারিকামণ্ডলী—ভেসে চ'লেছি তুমি-আমি মিনতি.....গতির একটা উন্মাদনা আছে। মন্থর রক্তধারায় জাগে অভিনব উদ্দীপনা। জীবনের 'ফিলসফি' যায় ব'দলে। প্রত্যহের মামুলিপনায় যাকে মনে হ'য়েছিল রুদ্ধ পংকিল জলাশয়, হঠাৎ সেখানে অনুভব করি স্বতঃস্ফূর্ত জীবনধারা।.....

অভ্যস্ত শব্দভুলে গাড়ীটা উঠে প'ড়ল একটা ব্রিজের উপরে। জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকাই। চোখে পড়ে গ্রীষ্মের শীর্ণ নদী বর্ষার অফুরন্ত জলপ্রবাহে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে।

প্রকৃতির নির্বাসন

অরুণকুমার দত্তগুপ্ত

(৬ষ্ঠ বর্ষ আর্টস (পরীক্ষার্থী)

ইংরেজ কবি কুপার বলিয়াছিলেন—"ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন পল্লী, আর মানুষ রচনা করিয়াছে নগর।" শুধু তাহাই নয়। ভগবানের সৃষ্ট পল্লীকেও মানুষ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। আধুনিক সহুরে বাবুদের মজলিসে একজন গ্রাম্যচাষার উপস্থিতি যেমন অসহ্য ঠেকে, আধুনিক নগর-সভ্যতার সভায় 'অসভ্য' পল্লীকেও তেমনি একটা উপদ্রব বলিয়া মনে হইতেছে। অতি-উৎসাহী খৃষ্টান মিশনারীদের মত আজিকার সভ্যতা গ্রামকে গ্রামত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া নগরধর্ম্মে দীক্ষাদান করিবার জন্য যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, পল্লীকে সহর করিয়া তোলাই নবসভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য করিয়াছে। সেজন্য সভ্যতার নিযুক্ত কর্ম্মীরা পল্লীর আনাচে কানাচে তাঁবু গাড়িয়া বসিতেছে, বনজঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া পরিকল্পনানুযায়ী সহর রচনা করিয়া যাইতেছে, কলকারখানা বসাইতেছে, পচা ডোবা আর জলা মাঠ ভরাইয়া গল্‌ফ্‌ ও ফুটবল খেলার মাঠ তৈয়ারী করিতেছে, এমন করিয়া গ্রামাঞ্চলকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেছে যে, রাজহাঁসগুলির সাঁতার দিবার জন্য এতটুকু জলখণ্ড মিলিতেছে না, বসিয়া থাকিতে থাকিতে উহাদেরও ক্যানসারে ধরিতেছে। 'উৎসুক হংসনাদ' বড় একটা শোনা যায় না, পাখীডাকা তালতমালকুঞ্জগুলি একে একে অদৃশ্য হইতেছে; মধ্যদিনে

পাখী গান বন্ধ করিলে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের যেখানটায় রাখাল মোহনবেণু বাজাইতে থাকিত, সেখানে এখন কলের ভেঁপু বিশ্রী কাব্যবিগর্হিত সুরে মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিতেছে। যেপথে গরুর গাড়ী কঁ্যাচ কঁ্যাচ করিতে করিতে কোন এক গাঁয়ের বধূকে বাপের বাড়ীর উদ্দেশে লইয়া যাইত, সেখানে হয়ত একটি বাস চলিয়াছে পাকারাস্তার উপর দিয়া, আর তারই ভিতরে অগণিত যাত্রীর ভিড়ের মাঝখানে চুপ করিয়া বসিয়া ঘামিতেছে একটি কিশোরী, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া যে আর কখনো গ্রামে আসিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। কবি পাগলের মত চেঁচামেচি করিয়া মরিতেছেন পল্লীর এই অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া। গ্রাম মরিলে কবিতা মরিবে,—গ্রামের এই ছায়াকুঞ্জ, এই স্তব্ধ কালোদীঘির জল, এই শস্যক্ষেত, এই মেঠোরাস্তা, এই পাখীর ডাক, এই শ্যামলতা, এইগুলিই যে কবিতার জন্ম দিতেছে! সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, অপরিষ্কার ঘরের মেঝে ঝাড় দিতে দিতে অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক সময় প্রয়োজনীয় দুই একটা জিনিষও আমরা ফেলিয়া দিই। তেমনি সমগ্র পল্লীপ্রান্তকে এই যে আধুনিক সভ্যতা তাহার বিরাট অদৃশ্য ঝাড়ু দিয়া সাফ করিতে সুরু করিয়াছে, সেখানে পল্লীব বনঝাড় আর কচুরীপানার মধ্যে প্রকৃতি বলিয়া যে অশরীরী বাস করে তাহাকেও বিদায় দেওয়া হইতেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দেবতা, কালিদাসের 'তমালতালীবনরাজিনীলা' তন্বী, রবিঠাকুরের 'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়' যে গ্রাম্যপ্রকৃতি তাহাকে আমরা নির্ব্বাসনদণ্ড দিয়াছি আমাদের বিচরণভূমি হইতে, অসভ্য বর্ব্বর বন্যপ্রকৃতি আমাদের রুচি ও চাহিদার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া বিদায় লইতেছে, আমরা চোখ বুজিয়া তাহার ছাড়পত্র মঞ্জুর করিয়া দিতেছি।

মানুষ চায় নিজের ভাগ্যকে নিজে গড়িয়া তুলিতে। এমন একদিন ছিল যখন কবে কাহার ঠাকুরদাদা সাহেবদের কাছ হইতে বড় একটা খেতাব পাইয়াছিলেন কিংবা বাঘের সঙ্গে একাকী খালিহাতে যুজিয়াছিলেন সেকথা সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেই অনেকে দিন কাটিয়া যাইত। সেদিন নাই। বাপঠাকুরদাদার টাকায় পরের উপর টেক্কা মারিয়া চলিতে আজকালকার বুদ্ধিমান্ ছেলেরা লজ্জা অনুভব করে, পূর্ব্বপুরুষের নাম ভাঙাইয়া খাইতে এখন আর বুক বেশী উঁচু হইয়া উঠে না। ঠিক তেমনি আধুনিক সভ্যতা ভগবানের দেওয়া সম্পদ্ ভাঙাইয়া খাইতে যেন সরমবোধ করিতেছে। সেজন্য যাহা যেমনি আছে ঠিক তেমনটি থাকিলে চলিবে না। সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকে মানুষ নিজের স্বপ্নের মত নূতন করিয়া সৃষ্টি করিবে। সৃষ্টির এই যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা ইহার হাত হইতে দুনিয়ায় কোন কিছুই বাদ পড়িতে পারে না—পল্লী না, এমনকি ভগবানও না। কিন্তু যে গ্রাম মানুষ সৃষ্টি করিতেছে সে-গ্রাম ভগবানের সৃষ্ট নহে, কুপার যে পল্লীপ্রান্তের কথা বলিয়াছিলেন, এ সেই পল্লীপ্রান্ত নহে। এখানে পাখীর গান আর ফুলের সুগন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কপোত-কপোতীর নীড়রচনা পর্য্যন্ত সবকিছুতেই মানুষের হাত পড়িয়াছে। যাহাকে আমরা এতদিন নৈসর্গিক বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, সেই নৈসর্গিকের এতটুকু চিহ্ন এখানে পাইবনা। আধুনিক সহরের মত

আধুনিক পল্লীপ্রান্তও মানুষের হাতের কাজ। এখানে মানুষ নিজের বৈশিষ্ট্যকে রূপদান করিয়াছে, ভগবানের মালমশলা লইয়া মানুষ নিজের কারখানা বসাইয়াছে, নিজের ভালোলাগার মত করিয়া সবকিছু সে সৃষ্টি করিবে। এতদিন কাব্যে যে প্রকৃতির বর্ণনা আমরা পড়িয়াছি, সে প্রকৃতিকে আধুনিক পল্লীতে খুঁজিয়া পাইবনা। যদি কোনদিন লণ্ডন কিংবা প্যারীর হট্টগোল হইতে আত্মরক্ষার সংকল্প করিয়া শান্ত প্রকৃতির অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়ি, তবে এমন একদিন আসিতেছে যেদিন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়াও গ্রামকে খুঁজিয়া পাইবনা, পাগলের মত ছুটিতেই থাকিব; তবু ভবিষ্যতের পরিকল্পিত গ্রামের কোন ছায়াবীথি হইতে রবীন্দ্রনাথ-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-কালিদাসের প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিবেনা। যাহাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলি, মানুষের হস্তশিল্পের মাঝখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাইব কি করিয়া?

দেখা যাইতেছে যে, বছরের পর বছর নগরের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে, সহরের সীমানা গ্রামের বুকের উপর আসিয়া পড়িতেছে, গ্রামের অধিকার খর্ব্ব ও সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আজ মানুষের সীমাহীন চাওয়ার কাছে পল্লীর পরিত্যক্ত মাঠ ও মরানদী বিরাট অপচয় বলিয়া ঠেকে। নগরের ক্ষুদ্র পরিসরে মানুষ সুস্থ স্বচ্ছন্দ সৌন্দর্য্যময় জীবনযাপন করিতে পারিতেছে না। কলকারখানা আর হাটবাজারে মিলিয়া অনেকখানি জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে পৃথিবীর মহানগরীগুলির বুকে। তদুপরি কলের ধোঁয়া, সংক্রামক ব্যাধি এবং অশান্ত কোলাহল মিশিয়া যে বিষ মানুষের পাড়ার অভিমুখে প্রবাহিত করিয়া দিতেছে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা ক্রমেই যেন দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। মানুষের উপর গিয়া পড়িয়াছে মানুষ, তাহাদের উপর চাপিয়াছে যন্ত্রদানব, আবার উহার পায়ের উপর গিয়া পড়িতেছে নূতন নূতন মানুষের দল। যন্ত্রসভ্যতার ঘাঁটি নগর, পল্লীর স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া নিজের বিশিষ্ট কর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এই সভ্যতা। আমেরিকায় উপনিবেশ গঠনের জন্য একদা য়ুরোপ আফ্রিকাকে নিজের পল্লীগৃহ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া বলপূর্ব্বক সমুদ্রপারে চালান দিতে উদ্যত (এবং সমর্থ) হইয়াছিল। যদি ভাবিয়া দেখি, তবে বুঝিব তাহার চেয়েও করুণ পল্লীর নিগৃহীত জীবনের কাহিনী—পল্লীকে বন্দী করিয়া যন্ত্রসভ্যতার উপনিবেশ স্থাপনের কাজে কাফ্রীদাসদের মত নিযুক্ত করিবার বেদনাময় আখ্যায়িকা। সে যাহাই হোক, বর্ত্তমান সভ্যতার দৃষ্টিতে পুরাতন পল্লীঅঞ্চলগুলি অপচয় মাত্র। আধুনিক 'সভ্য' জীবনযাপনের জন্য যেসব সামগ্রী আবশ্যক সেগুলি বহির্জগতের সম্পর্কশূন্য গণ্ডগ্রামে বসিয়া ব্যবহার করা কোন আধুনিকের ইচ্ছা নয়। লণ্ডন-প্যারী-কলিকাতায় হাঁফাইয়া উঠি, অসুখ বিসুখে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, সৌন্দর্য্য-পিপাসু চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিব এমন সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাই না। এজন্য পল্লীতে গিয়া বাস করিতে চাহি, 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' একথা বলি। অথচ গ্রামে শিয়ালের ডাক সহ্য করিতে পারি

না, সাপ খোপের উপদ্রবে ভয় পাই, বাঁধানো রাস্তাঘাট আর ফুটবল খেলার মাঠ না দেখিলে ক্ষুব্ধ হই। সুতরাং আধুনিক সভ্যমানুষকে ঘরে স্থান দিতে হইলে পল্লীর পক্ষে জাতিবিসর্জ্জন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তাহাকে সহর সাজিতেই হয়। কবির প্রকৃতি আধুনিক পল্লীতে থাকিতে পারে না, তাহার রাজ্যপাট ধীরে ধীরে লোপ পাইতে বসিয়াছে। য়ুরোপ আর আমেরিকায় তো একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলা চলে, এশিয়া এবং আফ্রিকাতেও উঠিল বলিয়া। মানুষ সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যন্ত্র সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে নগরের সীমা একটু একটু করিয়া সমগ্র পল্লীঅঞ্চলের উপর প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করিতে হইলে সারা দুনিয়াটাকে একটা পরিকল্পনানুযায়ী সাজাইয়া গুছাইয়া না নিলে চলিবে না। ভাবীকালের পল্লীতে যত্রতত্র শৃগাল ও নেকড়ের ডাক শোনা যাইবে না, মানুষের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া বন্য জগতকে মানুষের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে হইবে, মানুষ দয়া করিয়া চিড়িয়াখানায় অথবা কৃত্রিম যে সব বনভূমিতে স্থান ঠিক করিয়া দিবে তাহাকে মানে মানে সেইখানেই আশ্রয় লইতে হইবে। যাহা কিছুর সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় তাহাকে বিদায় দিতে বড় মায়া হয় জানি। বন্যপল্লীকে এভাবে নির্ব্বাসিত করিতে আমাদের যে কষ্ট হইবেনা তাহা নহে। কেহ কেহ অবশ্যই কাঁদিয়া বলিবেন—

"দাও ফিরে সে-অরণ্য, লও এ নগর"

কিন্তু তাই বলিয়া যুগের গতি আমরা রোধ করিতে পারিব না। নাগরিক এ সভ্যতা মানুষেরই রক্তদিয়া গড়া, মানুষেরই সাধনার দ্বারা লব্ধ, মানুষেরই পরিশ্রমের ফল। যদি বলি আমরা ইহা চাই নাই, তবে আমরা ভুল করিব। আজ যাহা দেখিতেছি তাহা আমরাই একদা দেখিতে চাহিয়াছিলাম। যদি অস্বীকার করি, যদি ফিরিয়া যাই, তবে আমাদের লজ্জার সীমা থাকিবে না। আমাদের হার হইবে। আমরা বাঁচিতে পারিব না। বরঞ্চ, পল্লীর অস্বাস্থ্য দুর করিয়া সেখানে স্বাস্থ্য আনয়ন করিতে হইবে, পল্লীর অশিক্ষার অন্ধকারে শিক্ষার প্রদীপমালা জালাইয়া দিতে হইবে, পল্লীর বিবর্ণ মুখে রক্ত সঞ্চার করিতে হইলে আধুনিক সভ্যতার ঔষধ দিয়াই তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে। মহানগরীর বিষাক্ত জীবনের মাঝখান হইতে মানবতাকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে যেখানে বসাইব সেখানে তাহার দেহ মনের যাবতীয় উপকরণ যোগাড় করিয়া আনিতেই হইবে, কবিতার খাতিরে গ্রামের অস্বাস্থ্যকর ডোবা আর জঙ্গল বাড়িতে দেওয়া চলে না।

এই যে সভ্যতার দ্বারা পল্লীকে নগরোপম করিয়া তোলা, ইহাকে কি সত্যই প্রকৃতির নির্ব্বাসন বলা যায়? আসলে যাহা কিছু মানুষের ছোঁয়া হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতেছে শুধু মাত্র সেই সবকেই প্রাকৃতিক বলার বিশেষ তাৎপর্য্য নাই। কৃত্রিম অকৃত্রিম সবকিছুর

মধ্যেই প্রকৃতি বাস করিতেছে। স্রষ্টার সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সৃষ্টি—ইহাদের যে দুইটি নিজস্ব প্রকৃতি তাহারা বিভিন্ন নহে, ইহারা একই প্রকৃতির বিভিন্নরূপ। এই মাঠ, এই নদী এই ছায়াতরু, এই দীঘির স্তব্ধ জল, এই বিহঙ্গ-কুজন—ইহাদের মধ্যে আজ যে-প্রকৃতিকে দেখিলাম, কাল যখন এই মাঠে কারখানা বসিবে, এই নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইবে, সেই ছায়াতরু কাটিয়া আকাশস্পর্শী বাড়ী উঠিবে, মজাদীঘি ভরাট হইয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠ নির্ম্মিত হইবে, এই বিহঙ্গকুজনকে নির্ব্বাক্ করিয়া রেডিও বাজিতে থাকিবে, তখন ঐ রূপান্তরের মধ্যেও একই প্রকৃতি জাগিয়া থাকিবে। কেহ কেহ এই রূপান্তরকে মনে মনে সহ্য করিতে পারেন না; যাহাতে তাঁহারা অভ্যস্ত উহাকেই 'নৈসর্গিক' আখ্যাদান করিয়া বসেন; আর অনিবার্য্য বিশ্বনিয়মবশতঃ যখন ঐ অভ্যস্ত পৃথিবীর চিত্রপটে রং বদলাইতে থাকে, তখন বর্ণের সাথে চিত্রপটটাও বদলাইয়া গিয়াছে বলিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দেন। আসলে চিত্রপটটা ঠিকই আছে, ছবিটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে মাত্র। ঐ ছবি প্রকৃতি নহে; উহা প্রকৃতির আপনাকে প্রকাশিত করিবার একটি বিশিষ্ট পন্থা। চিরনূতনা চিরযৌবনা প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে। যিনি পল্লীর বুকে সভ্যতার কর্ম্মশালা দর্শন করিয়া প্রকৃতির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া হাঁক ছাড়িতেছেন, তিনি ছবিটাকেই প্রকৃতি বলিয়া ভুল করিতেছেন।

নগর-সভ্যতা গ্রামকে সহর বানাইয়া তুলিতেছে, তুলুক্, তাহাতে এত অস্বস্তি ও আপত্তির কারণ কি? আমরা তো বুঝিতেছি যে, সহস্র বছর পরে দুনিয়ায় পল্লী বলিতে যাহা বুঝি এমন কোন কিছুর অস্তিত্বই থাকিবে না। তবু সেখানে মানবতা বাঁচিয়া থাকিবে, মানুষের অমরতার সাধনা চলিতে থাকিবে, মানুষের সুখের জন্য মানুষ প্রাণ দিবে। সেখানে কি স্বাস্থ্য থাকিবে না? সেখানে কি সৌন্দর্য্য থাকিবে না? সেখানে কি অসীমের পূজা বন্ধ হইয়া যাইবে? সেখানে কি মানবহৃদয় পাষাণ হইয়া থাকিবে? যদি সেদিনের পৃথিবীতে 'অরণ্য' না থাকে, তবে খাঁচার পাখীর গান শুনিয়াই কবি কবিতা লিখিবে; যদি বনফুল না ফোটে, তবে পার্কের ফুল লইয়াই সনেট রচিত হইবে; বিলাতের লেক-অঞ্চল যদি আপন নৈঃশব্দ্যে বঞ্চিত হইয়া ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, তবে খালি গায়ে খালি পায়ে না বেড়াইয়া মোটরে চড়িয়াই প্রকৃতির শিক্ষালাভ করিতে হইবে। প্রকৃতি সেখানেও বাঁচিয়া থাকিবে। পাকারাস্তা, মোটর, সুসজ্জিত বাগান-বাড়ী, রক্ষিত কৃত্রিম বনভূমি ও পর্ব্বত, চিড়িয়াখানার পাখীর গান, কলকারখানা, সিনেমা-রেস্তোঁরা—এই সবের মাঝখান হইতেই নূতন প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিবে, আগামীকালের মহাকাব্য রচিত হইবে তাহাকেই ভিত্তি করিয়া। প্রকৃতি নির্ব্বাসিত হয় নাই, প্রকৃতির নির্ব্বাসন দেওয়া অসম্ভব।

সামান্য একটু মরিচ্

দেবব্রত চন্দ্র
(ষষ্ঠ বর্ষ, বিজ্ঞান)

রেনল্ড আসছে। কতদিন বাদে রেনল্ড ফিরে আসছে!

দুদিন! আর দুদিন বাদেই রেনল্ড এসে পড়বে। হয়ত দরজার সামনে, সিঁড়ীর নীচে তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হবে!

আনার বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল।...দুদিন...আটচল্লিশ ঘণ্টা...কিন্তু এ যে তার কাছে আটচল্লিশ বছরের সমান!

কি দরকার ছিল তাকে অত তাড়াতাড়ি জানাবার? অপেক্ষাকাতর যৌবনের শেষ স্বপ্নায়িত ফুলশয্যার পূর্ব্বে কাল রাত্রির এ কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান!.....

কিন্তু ফ্রান্সে এই নাকি নিয়ম—অন্ততঃ আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে স্ত্রীকে স্বামীর প্রত্যাগমনের সংবাদ জানাতে হবে।

কিন্তু আনার বেলায় এর কি দরকার ছিল? আনার একনিষ্ঠ অপেক্ষা-খণ্ডিত দিনগুলির খুঁটিনাটিট পর্য্যন্ত প্রত্যেকের বিদিত!

ভয় ও আনন্দের অস্বস্তিতে আনা শিউরে উঠল। প্রশস্ত টেবিলটার ওপাশ থেকে অফিসারটি তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করলেন "হ্যাঁ, তোমার স্বামী—প্রাইভেট্ রেনল্ড আসছে।" আনা কি শুনতে পাচ্ছে না?

তবে?

তবে আনার মুখটা এত রক্তশূন্য মনে হচ্ছে কেন? সযত্নবিন্যস্ত গোঁফের ওপর আল্‌গা ভাবে হাত বুলিয়ে অফিসারটি আবার সুরু করলেন, "জার্মানীর ঐ অংশটা এখন আমাদের মিত্র আমেরিকানদের অধিকৃত। তারাই প্লেনে বন্দী ফরাসীদের এখানে পাঠাচ্ছে।"

...আর সন্দেহের অবকাশ নেই, নির্ভুল ভাবে শুনেছে আনা। প্রতিটি রোমকূপ কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছে, আনা স্পষ্টই অনুভব করতে পারছে হিমশীতল রক্তে উষ্ণতার সংক্রমণ। নিষ্কম্প শিখার মত উজ্জ্বল হাসিতে আনার মুখ ভরে উঠল। অফিসারটিকে একটা ধন্যবাদও সে জানাল, কিন্তু তার আবেগোচ্ছল কণ্ঠের কম্পিত অস্ফুট শব্দ একমুঠো ঝরা পাতার ক্ষীণ মর্মরিত শব্দের মত তার পাতলা ঠোঁট দুটোর মধ্যেই মিলিয়ে গেল। "অজস্র ধন্যবাদ," আবার সে নিজেকে বলতে শুনল। অফিসারটি একটু হাসলেন।

* * * * *

দুদিন! নিঃসঙ্গ কর্মহীন দীর্ঘদিনের শেষে আনা আবার কাজ পেয়েছে! রেনল্ডকে অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে।

মাত্র দুটো দিন রয়েছে হাতে! তা হোক্, নিজের সবল বাহুর ওপর আনার পূর্ণ আস্থা আছে। একটা মুহূর্ত্তও না নষ্ট করে আনা কাজে লেগে গেল কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে।

ওদের বাড়ীটা যদিও বড় নয়, তবুও দুটো দিন আর এমন কি বেশী! দু'টো পুরো দিন আনা বাড়ীটার পেছনে লেগে রইল, ধুয়ে মুছে তক্‌তকে করে ফেললো। ···শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন আনা···।

আনার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে প্রতিবেশিনীরাও বুঝি পেয়েছে সূর্য্যলোকের আভাস! কে জানে, এমনি আকস্মিক ভাবে হয়ত তাদের জীবনে আসবে এই সৌভাগ্যেরই ত্বরিত পুনরাবৃত্তি। ওরাও হাসিমুখে এগিয়ে এল আনাকে সাহায্য করবার জন্যে।

কিন্তু এ যে আনার নিজের কাজ। রেনল্ডকে অভ্যর্থনার প্রস্তুতি অপরের সেবায় ক্ষুণ্ণ করতে পারে কি আনা? আনা নিজেই সব করবে!

আজ রেনল্ড আসবে, দুপুরের আগেই আনাকে সব গুছিয়ে ফেলতে হবে।

খাবার? হ্যাঁ, কালই তো সে গিয়েছিল মুদীর দোকানে, মাংসের দোকানে। সমস্ত কুপন ফেলে আনা এনেছে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী। অতগুলো কুপন দিতে দেখে মোটা কসাইটার চোখদুটো গোল হয়ে উঠেছিল। কি হাসিই না পেয়েছিল আনার! কি গর্ব্বিত-ভাবেই না বলেছিল, "হ্যাঁ, সব মাংসটাই চাই আমার"। জীবনে এমন দিন কি আর রোজ আসে!

সবই ঠিক আছে কি? আনার শঙ্কা, আনার অস্বস্তি যাবার নয়। আবার সারা বাড়ীটার একপাক সে ঘুরে নিল। না, ঠিক আছে খাবার ঘরে টেবিলটা দুজনেরই মত সাজান হয়েছে। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অনভ্যস্ততায় কোথাও ত্রুটি নেই তো? না, এই তো দুটো বড় বড় 'সুপ্‌প্লেট্' সে রেখেছে, দুটো তোয়ালে, সবই দুজনের জন্যে! একাজে কি ভুল হতে পারে আনার? তবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে সে সমস্ত ঘরগুলোর সজ্জা বিশ্লেষণ করতে লাগল। হ্যাঁ, চুল্লীর পাশে সাবেক কালের মত দুটো ইজিচেয়ার রাখা হয়েছে।··· সব ঠিক আছে···স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস আনার বুক থেকে বেরিয়ে এল।

একি! সকাল যে গড়িয়ে এল দুপুরে! আর বড় জোর মিনিট পনেরো। আনার বুক দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। সিঁড়ী বেয়ে সে নীচে নেমে এল।

খোলা দরজার সামনে এই সিঁড়ীর নীচে হবে তাদের ঈপ্সিত সাক্ষাৎ।

কিন্তু বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস মাঝে মাঝে মানুষের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করে দিতে চায়। আনন্দের অসহনীয়তায় ছোট একটুখানি অন্যমনস্কতা গোপন রন্ধ্রপথে মনের

মধ্যে এসে বহু কষ্টের উপচারে এনে দেয় মারাত্মক কোন ত্রুটি। শিব পূজার আয়োজনে বিল্বপত্র সংগ্রহে অন্যমনস্কার ভ্রান্তি। আনা মরিচ্ আনতে ভুলে গেছে অথচ রেনল্ড মরিচ্ ছিটোনো 'স্যালাড্' কি ভালই বাসে। এতদিন অর্দ্ধাশন আর অনশনের পর বাড়ীতে এসেও রেনল্ডের প্রথম ভোজ কি বিস্বাদ হয়ে যাবে সামান্য একটু মরিচের অভাবে?

এক ঝট্‌কায় কোমর থেকে তোয়ালেটা খুলে ফেলে আনা ছুটল মোড়ের দোকানে।

দরজা খুলে রেনল্ড ডাকল, "আনা! আনা!" প্রত্যুত্তরে বিমূঢ় রেনল্ড শুধু নিজেরই গলার প্রতিধ্বনি শুনল। বিশ্বাস করতে পারছে না রেনল্ড, আনা নেই। তবে? তবে বোধ হয় আনা জানে না রেনল্ডের আসবার কথা। তাই বা মন্দ কি! আনা হয়ত এতক্ষণ খাচ্ছে, আর রেনল্ডের কথাই ভাবছে!

চুপি চুপি রেনল্ড খাবারের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

আনা নেই—বিস্মিত বিমূঢ় রেনল্ড বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখল আনার স্বহস্তসজ্জিত ডাইনিং টেবিলটা দুজনের মত সাজানো! আনা তো জানত না রেনল্ড আসবে, জানলে সে নিশ্চয় বাড়ীতে থাকত!

তবে?

চরম আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত করবার জন্যেই বোধ করি রেনল্ড দেখল সাদা নরম বিছানার ওপর আনার হাতের কাজ করা দুটো বালিশ, পাশাপাশি সাজান।

কেন এল রেনল্ড? কেনই বা সে বেঁচে রইল! জার্মানদের হাতে বোমায় থেঁৎলে মরাও যে ছিল ভাল।

রেনল্ড সিঁড়ী বয়ে নেমে এসে দেখল খোলা দরজার সামনে আনা।

তৃতীয়ার ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের মত একখানি হাসি লেগে রয়েছে আনার মুখে, কিছু একটা বলবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার ঠোঁট দুটো ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে।

আনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেনল্ড আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। সাপের মত ক্রূর হিংস্র নিষ্ঠুর দৃষ্টি রেনল্ডের চোখে। আনার হাসি মিলিয়ে গেল। আতঙ্কে তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

কিছু বলবার কিছু বোঝবার আগেই সে অনুভব করল মাথায় একটা ভীষণ আঘাত। সে প'ড়ে গেল দরজার সামনে!

ঘুমিয়ে পড়েছে আনা, তার সমস্ত চেতনা ঝিমিয়ে আসছে—সে বুঝতে পারছে না কি হোল, কেন এমন হোল।

স্তিমিত প্রায় চেতনার মধ্যে আনা শুধু শুনতে পাচ্ছে—রেনল্ডের ভারী বুটের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।*

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

আধুনিক ভারতীয় দর্শন ও কৃষ্ণচন্দ্র

অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার

সাধারণের মুখে এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যেমন দ্রুত ও বিস্ময়কর, দর্শনের তেমন নয়। বরং দর্শনশাস্ত্র হাজার বছরের পুরোণো ভাবধারাগুলিকে আজও আঁকড়ে ধরে আছে আর পুরোণো ভাব নতুন ভাষায় প্রকাশ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। সাম্প্রতিক ভারতীয় দর্শনের প্রতি অভিযোগটি আরও গুরুতর। বিদেশে দর্শনের আলোচনা-ক্ষেত্রে দেখতে পাই নানা নতুন মতের আবির্ভাব, যেমন ন্যায়িক ধ্রুববাদ (Logical Positivism), নব্য মানবিকতাবাদ (Neo-humanism), সর্বাস্তিবাদ (Existentialism) প্রভৃতি। কিন্তু অতি-আধুনিক ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন তত্ত্ব বা মতবাদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষ্ণচন্দ্রের দার্শনিক চিন্তাধারা এই অভিযোগের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দার্শনিক জগতে কৃষ্ণচন্দ্র অন্যতম চিন্তানায়ক। অবশ্য দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যতখানি মৌলিকতা দেখিয়েছেন ততখানি স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা পাননি'। তার কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়নি'। তিনি নিজে গোপনে লোকলোচনের অন্তরালে দর্শনের সাধনা করে গেছেন; মিছিলের সামনে এসে জোর গলায় নিজের মত প্রচার করবার প্রবৃত্তি তাঁর কোনদিনই ছিল না। অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা তাঁর মতবাদ নিয়ে সভাসমিতিতে আলোচনা করলে অথবা জনসভায় তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করবার ব্যবস্থা করলে তিনি বিপন্ন বোধ করতেন। কৃষ্ণচন্দ্র মাত্র দুখানি বই প্রকাশ করেছেন—একখানি *Studies in Vedantism* (Calcutta University 1909), অন্যটি *Subject as Freedom* (Amalner, Bombay, 1930); এই বই দু'খানির অনেক জায়গা দুর্বোধ্য। তাঁর মতবাদ অবশ্য নানা পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রচনায় যে সব ভাব (concept) ব্যবহার করেছেন তা অনেকক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব এবং সাধারণের কাছে সহজবোধ্য নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের দার্শনিক মতবাদের মূলসূত্রগুলি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে। তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যবহৃত আঙ্গিকে (technique) দীক্ষিত না হ'লে তাঁর মতবাদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সহজ নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয়; কিন্তু কোন মতই তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করেন নি'। বিশেষত পাশ্চাত্য মতবাদ বিনা বিচারে গ্রহণ করাকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখেছেন। দর্শনের বিচার ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু বৌদ্ধিক বিচারের মধ্যে তিনি ব্যের্গসঁ-র মত ভ্রষ্ট, খণ্ডিত তথ্যমাত্র দেখেননি'। অপরদিকে অতিবুদ্ধি প্রয়োগের যে ধ্বংসকর পরিণাম দেখতে পাচ্ছি ন্যায়িক

ধ্রুববাদে (Logical Positivism), কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন সেই ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আসল কথা কৃষ্ণচন্দ্র বুদ্ধির সাহায্যে সকল তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর দর্শনে বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটেনি। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা বের্গসঁ-প্রদর্শিত বোধি-বাদ (intuitionism) ও রাসেল-প্রদর্শিত শুদ্ধ প্রত্যক্ষবাদ (pure empiricism) —এ দুটোর মধ্যবর্ত্তী।

তত্ত্ববিদ্যার (Metaphysics) বিভিন্ন দিক বিচার করবার পূর্বে "দর্শন" বলতে সত্যিই আমরা কি বুঝব—এই প্রশ্ন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। রাধাকৃষ্ণন্ ও ম্যুরহেড্-সম্পাদিত *Contemporary Indian Philosophy*—পুস্তকে নিজের দার্শনিক মতবাদের আভাস দিতে গিয়ে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার নাম "The Concept of Philosophy"। কৃষ্ণচন্দ্র দর্শনের (Philosophy) তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুটি ভুল পথ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। একদল লোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত উৎসাহী যে তাঁরা দর্শনকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেলে দিতে চান; কাণ্ট আংশিক ভাবে এইদিক থেকে অপরাধী। অন্য একদল চিন্তানায়ক আছেন যাঁরা দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করবার প্রেরণা নিয়ে বিজ্ঞানকে দর্শনের কোঠায় ফেলে দিয়েছেন। এই গোষ্ঠীতে আছেন এডিংটন, জীন্স্, ও এই মতের অন্যতম ব্যাখ্যাতা সি, ই, এম, জোড্। জোড্ তাঁর *Philosophical Aspects of Modern Science*—বইটিতে দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকেরা যতই গভীর থেকে গভীরতর বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ততই তাঁরা দার্শনিকের জগতের মধ্যে গিয়ে পড়ছেন। প্রসঙ্গক্রমে এডিংটনের Universal Logos, Symbolic World, ও জীনস্-এর Mathematical Mind প্রভৃতি তত্ত্ব নিয়ে জোড্ আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেন এই দুটো পন্থাই ভুল পন্থা; এই দুটি পথ অনুসরণ করলে আমরা কোনদিনই 'দর্শনে'র তাৎপর্য্য বুঝতে পারব না। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শন-ঘেঁষা মনোভাবের সমালোচনা করেছেন এমন চিন্তাশীল লেখক অনেক আছেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের আলোচন-পদ্ধতি এঁদের সকলের চাইতে ভিন্ন। শ্রীমতী স্টেবিং তাঁর *Philosophy and the Physicists*—বইতে এডিংটন ও জীন্স্-এর মতবাদ আলোচনা প্রসংগে বলেছেন যে এঁদের মত আমরা ততটুকু-ই গ্রহণ করব যতটুকু তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানী (Physicist) হিসাবে আমাদের দেবেন। ঈশ্বর বা পরলোক সম্বন্ধে তাঁদের যদি কোন মত থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু সে-মত এডিংটন ও জীন্স্-এর ব্যক্তিগত মত। কাজেই শুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে তাঁদের প্রবেশ করবার অধিকার নেই। রাসেল তাঁর "On the Scientific Method in Philosophy" * নামক প্রবন্ধে বলেছেন যে দর্শনের পক্ষে বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি গ্রহণ করাই প্রশস্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের অনু-

* Russell: *Mysticism and Logic and other essays* pp. 100-119.

সন্ধানের ফলগুলি দর্শনের বিষয়বস্তু হতে পারে না। জ্ঞানরাজ্যের যাবতীয় বিষয়বস্তুর সমন্বয় করে দর্শনশাস্ত্র গড়ে ওঠে না। জ্ঞানরাজ্য থেকে বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়েছে দর্শন। কৃষ্ণচন্দ্র যে অর্থে "দর্শন" (Philosophy) কথাটি ব্যবহার করেছেন, রাসেল অবশ্য সে অর্থ গ্রহণ করেন নি। তবু দুজনেই এই বিষয়ে একমত যে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে তথ্য (fact) কিন্তু একটি তথ্যের সঙ্গে অপরটির সমন্বয় হচ্ছে কিনা, অথবা তথ্যের জ্ঞান-সম্ভাবনা (knowability) কতটুকু—এ সকল প্রশ্ন বিজ্ঞান-রাজ্যের বাইরে। রাসেল-এর আলোচনার মধ্যে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলগুলির সমন্বয় ও সামঞ্জস্য ঘটালেই তা' দর্শন হয়ে ওঠে না। কৃষ্ণচন্দ্র এই মতের অন্যতম সমর্থক। রাসেল-এর যুক্তি হচ্ছে এই: ব্যাপক ও স্থির সিদ্ধান্ত বলে' আজ বিজ্ঞান যাকে গ্রহণ করছে আগামী কাল সেই সিদ্ধান্তের রূপান্তর ঘটতে পারে; কারণ বিজ্ঞানীর গবেষণার ফল কি দাঁড়াবে তা আগে বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে। বিজ্ঞান কতকগুলি বিশেষ ধরণের তথ্য নিয়ে কাজ করছে এবং আজ যে প্রত্যয় বা উপলব্ধি ঘটেছে তারই প্রতিষ্ঠাভূমিতে সে আগামী কালের তথ্যের সংযোজন করছে। কাজেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে বিজ্ঞানের আলোচনা চলতে পারে না। কৃষ্ণচন্দ্র রাসেল-এর সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হলেও তাঁর যুক্তি স্বতন্ত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মতে দর্শনের (Philosophy) আলোচ্য বিষয় স্বয়ংসৎ বস্তু (self-subsistent object)—এ বস্তু বিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু থেকে আলাদা।

কৃষ্ণচন্দ্রের মতে চরম সত্তা বিষয়ী (Subject) বা বিষয় (Object) —কোনোটিই নয়। চরম সত্তা অনির্দ্দেশ্য (Indefinite); তা হচ্ছে সম্বিৎ (Consciousness)। এই সম্বিৎ-এর স্তরভেদ দেখানোই কৃষ্ণচন্দ্রের মৌলিক, নিজস্ব দান। কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন অনির্দ্দেশ্য সম্বিৎ যখন নির্দ্দিষ্টরূপে প্রতিভাত হয় তখন তার প্রকাশের চারটে স্তর লক্ষ্য করা যায়: মূর্ত্ত চিন্তা (empiric thought), শুদ্ধ বিষয়গত চিন্তা (pure objective thought), আধ্যাত্মিক চিন্তা (spiritual thought), এবং অতিক্রান্ত চিন্তা (transcendental thought)। প্রথম পর্য্যায়ের আলোচনা হচ্ছে বিজ্ঞানের লক্ষ্য। শেষ তিনটি স্তর দর্শনের আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণচন্দ্র দ্বিতীয় স্তরের আলোচনার নাম দিয়েছেন "Philosophy of the Object" তৃতীয়টীর নাম "Philosophy of the Subject" এবং চতুর্থটির নাম "Philosophy of truth"।

বিজ্ঞান বিশ্লেষণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর চরম সত্তাকে পাবার চেষ্টা করে; কাজেই বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছে তথ্য (fact) কিন্তু সত্য (truth) নয়। 'সত্য' যখন বিষয়রূপে আলোচনার বস্তু হবে তখনই আমাদের চিন্তন দর্শনের কোঠায় এসে পড়বে। দর্শনের জগৎ হচ্ছে শুদ্ধ চিন্তার জগৎ। দর্শনের বিষয়বস্তু অনেক সময় সাধারণের কাছে কাল্পনিক বলে মনে

হ'তে পারে; কিন্তু আসলে তা কাল্পনিক নয়। দার্শনিক চিন্তা কতকগুলি বচনের (judgment) সমষ্টিমাত্র নয়। কারণ, বাচনিক সত্তা (judgmental content) বিজ্ঞানের রাজ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও দর্শনের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বচনের সাহায্যে প্রকাশ করতে হয়, তবু মনে রাখতে হবে যে সে বচনগুলি 'existential judgment' নয়। যাঁরা মনে করেন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সংগ্রহ করে একটা সমন্বয় সাধন করাই দর্শনের কাজ তাঁরা আসলে ভুল করেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের তফাৎ মৌলিক—এখানে রয়েছে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর তফাৎ। দর্শন বিশ্লেষণ করে স্বতঃসিদ্ধ, স্বাশ্রয়ী বস্তুর সত্তা; বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বাশ্রয়ী নয়, তা হচ্ছে মূর্ত্ত (empirical) বিষয়। দর্শনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তাই কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন: "Philosophy is self-evident elaboration of the self-evident and is not a body of judgments. The self-evident is spoken, but *is not spoken of.*"*

কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন বলতে কখনই জ্ঞানরাজ্যের সামগ্রিক সমন্বয় (total synthesis) বোঝেন না। তাঁর মতে দর্শনের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা আছে। এই সীমারেখা অতিক্রম করে জীবনের সমস্ত প্রকাশ ও পরিচয়কে দর্শনের রাজ্যে ঢুকিয়ে নিলে দর্শনের অমর্য্যাদা করা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন:

"There is the problem of piecing together the results of the sciences into a world-view. The synthesis wanted is sometimes imagined to be the generalisation of the primary laws of the sciences into more comprehensive laws. To suppose, however that it can be accomplished by philosophy without the employment of the distinctive technique and method of science would be nothing short of a presumptuous folly."

আগেই বলা হয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্রের মতে দর্শনের কাজ হচ্ছে স্বয়ং-সর্বস্ব বিষয়ের (self-subsistent object) বিশ্লেষণ ও বোধ। এই 'বিষয়' অবশ্য জ্ঞানের (knowledge) বিষয় নয়, এ হচ্ছে সাধনার (meditation) বিষয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সাধনা হচ্ছে অবেদ্য, স্বাশ্রয়ী বিষয়ী (Subject) বা সম্বিৎ (Consciousness)-কে উপলব্ধি করবার সাধনা। এই সাধনার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে আমরা যাতে বিভ্রান্ত না হই, সেজন্য কৃষ্ণচন্দ্র ধর্ম, বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও দর্শনের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট করে টেনেছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর দর্শনে চরম সত্তার (ultimate reality) কি পরিচয় দিচ্ছেন? আগেই বলা হয়েছে চরম সত্তা, কৃষ্ণচন্দ্রের মতে, বিষয়-বিষয়ীভেদ বহির্ভূত এক অনির্দ্দেশ্য সম্বিৎ। এই সম্বিৎকে বাস্তব (real) বলা চলে না। কারণ বাস্তব-অবাস্তব এই ভেদ বাচনিক জ্ঞানের (judgmental knowledge) ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ অথচ অনির্দ্দেশ্য চরম সত্তা (the Indefinite) বাচনিক জ্ঞানকে অতিক্রম করে আছে। তা ছাড়া, বাস্তব-অবাস্তব এই

* *Contemporary Indian Philosophy.* p. 75.

জাতীয় বিরোধাত্মক কথা জ্ঞানলাভের পরে ব্যবহার করা যেতে পারে; তার আগে নয়। এই প্রসঙ্গে কাণ্ট-এর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের মতের তুলনা করা যেতে পারে। কাণ্ট বলেছেন চরম সত্তা অজ্ঞেয়। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেন যা অজ্ঞেয় তাকে সৎ (real) বলা চলে না। চরম সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র যে সব কথা বলেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর দার্শনিক চিন্তার উপর কাণ্ট-এর দর্শন এবং জৈন দর্শনের স্যাদ্‌বাদ ও অনেকান্তবাদ সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

কাণ্ট-এর মতে দর্শন আমাদের যা দেয় তা হচ্ছে বাচনিক জ্ঞান; সে জ্ঞান অব্যভিচারী ও সার্বিক হতে পারে কিনা তাই কাণ্ট-এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। কাণ্ট-এর মতে আত্মা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়; কারণ জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়োপত্তা (sense-datum) ও ভাবসূত্রের (categories) সমন্বয়। কাণ্ট জ্ঞাতা বা প্রমাতা অর্থে 'আত্মা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। আত্মাকে জানবার যতই চেষ্টা করিনা কেন আত্মা কখনই ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয় হয় না। যদিও আত্মা বা প্রমাতা সকল বিষয়-জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে তবুও প্রমাতা নিজে জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। আমি চোখের সাহায্যে সব কিছু দেখি অথচ আমার চোখকে দেখতে পাই না; তেমনি প্রমাতা সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য ভিত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান থেকেও অবেদ্য। প্রমাতার সাহায্যে বিষয়ের জ্ঞান সম্ভবপর হয়; কাজেই প্রমাতা বিষয়রূপে জ্ঞেয় হয় না। এই হল কাণ্ট-এর বক্তব্য। কৃষ্ণচন্দ্র এ মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে আত্মা 'বিষয়'রূপে অজ্ঞেয় হ'লেও একেবারে অজ্ঞেয় নন। অন্যরূপে আত্মাকে জানবার উপায় আছে। এই জানা অবশ্য চিন্তনের সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত নয়। কৃষ্ণচন্দ্র তার *Subject as Freedom* (1930) বইটিতে বিষয়ের সম্পর্ক থেকে অসঙ্গ বিষয়ী কত রকমে মুক্তি লাভ করতে পারে তারই আলোচনা করেছেন। মনোবিজ্ঞানী যে প্রাথমিক অনুভূতির (primary sensation) আলোচনা করেন তার সঙ্গে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচ্য চিন্তন (thought) এবং বিষয়ীর (subject) সামঞ্জস্য সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের বিচার করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। এ বিষয়ে কাণ্ট-এর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র বৌদ্ধ, বৈদান্তিক ও দক্ষিণী হেগেলীয় মতবাদের সমালোচনা করেছেন।

প্রশ্ন হতে পারে: বিষয়-বিষয়ী ভেদ থেকে মুক্ত অনির্দ্দেশ্য সম্বিৎকে উপলব্ধি করা যায় কি ভাবে? এইখানেই কৃষ্ণচন্দ্র দার্শনিকের জীবনে সাধনার উপযোগিতা অপরিহার্য্য বলে স্বীকার করেছেন। একথা স্পষ্ট করে কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, যে মৌলিক তত্ত্ব থেকে আমাদের জ্ঞানের উদ্ভব হচ্ছে তাকে নির্দ্দিষ্ট করে জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কিছুই বলতে পারি না। কাজেই তাকে অনির্দ্দেশ (Indefinite) বলা হয়েছে। অনির্দ্দেশ্য কেন নির্দ্দিষ্টের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করল এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। তবে অনির্দ্দেশ্যের উপলব্ধি সম্ভবপর। কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে এ বিষয়ে কোন অস্পষ্ট রহস্য নেই।

অনির্দ্দেশ্য যদিও নির্দ্দিষ্ট বিষয়-জ্ঞানের মধ্যে ধরা দিতে চায় না তবুও সকল বিষয়-জ্ঞানের মধ্যে এই অনির্দ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে। অনির্দ্দেশ্যের পটভূমিকায় আমাদের নির্দ্দিষ্ট বিষয়-জ্ঞান সম্ভবপর হচ্ছে। কিন্তু অনির্দ্দেশ্য ও নির্দ্দিষ্টের সীমারেখা কোনদিনই স্থির নয়; তা ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে। নির্দ্দিষ্ট বিষয়কে যেমন মননক্রিয়ার সাহায্যে জানতে পারি, অনির্দ্দেশ্যকে পাবার চেষ্টা করলে পেছনে তাকাতে হবে। অনির্দ্দেশ্যকে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে বস্তু-বিষয় থেকে আমার চিন্তাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে প্রমাতার উপর ন্যস্ত করা; এ সাধনার জন্য যে মননের প্রয়োজন তা নেতিবাচক (negative)।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকাশিত প্রথম বই হচ্ছে *Studies in Vedantism* (1909)। এই বইতে তিনি বেদান্তের ইতিহাস আলোচনা করেন নি'; বেদান্তের তত্ত্বগুলির উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। বেদান্তে মনোবিজ্ঞান, বেদান্তের চরম তত্ত্ব ও বেদান্তের তর্কশাস্ত্র (logic)—এই তিনটি বিষয়ের আলোচনায় তিনি নতুন তথ্যের ও নতুন ভাবের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তাঁর বইটির ভূমিকায় লিখেছেন যে এই বইটি হল 'বেদান্তের ভিত্তির উপর নতুন সৃষ্টি; অবশ্য সে সৃষ্টির সার্থকতা ও যাথার্থ্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে' (problematic constructions on Vedantic lines)। দার্শনিকের চিন্তারাজ্যে স্বাধীনতা আছে; কাজেই এ জাতীয় নতুন সৃষ্টিতে পূর্বসূরিদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন কথা নেই (exegetical interpretation inevitably shades off into philosophic construction; and this need not involve any intellectual dishonesty)। অন্যত্র বলেছেন: "A true philosophic system is not to be looked upon as a soulless jointing of hypotheses; it is a living fabric which, with all its endeavour to be objective, must have a well-marked individuality." * কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শনে এই স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য আছে যা তাঁর চিন্তাকে অন্য পাঁচজন দার্শনিকের চিন্তা থেকে পৃথক্ করে রেখেছে। *Studies in Vedantism*—গ্রন্থে তিনি বৈদান্তিক মায়াবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের, বিশেষত কাণ্ট, হেগেল ও হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মতের যে তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন, তাতে কৃষ্ণচন্দ্রের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় মেলে। বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি হিউম ও তাঁর শিষ্যদের চিন্তাপ্রণালীর বিচারও করেছেন। তাঁর একটি প্রবন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র মায়াবাদের তিনটি স্তর দেখিয়েছেন এবং অনির্বচনীয় খ্যাতিবাদের সঙ্গে মায়াবাদের সামঞ্জস্য কোথায় সেদিকেও তিনি ইঙ্গিত করেছেন।†

* *Studies in Vedantism* p. ix.

† *Proceedings of the First Indian Philosophical Congress*, 1925, pp. 45-57.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাণ্ট-এর দর্শন সম্বন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র যে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছিলেন তা দর্শনানুরাগী ব্যক্তির কাছেই অমূল্য সম্পদ। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কাণ্ট-এর দর্শনে কি কি রূপান্তর ঘটতে পারে তারই বিচার করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। এই বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে কেয়ার্ড, প্রিচার্ড, নরম্যান কেম্প-স্মিথ্ ও পেটন্ প্রভৃতি কাণ্ট-ভাষ্যকারদের চাইতে কৃষ্ণচন্দ্রের দান কোন অংশে কম বলে গ্রহণ করা যাবে না।

কৃষ্ণচন্দ্র যুক্তির তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে জ্ঞানরাজ্যের সকল বস্তুকে বিশ্লেষণ করে সত্যের সন্ধান করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্যে তিনি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রেখেছেন অথচ মৌলিক চিন্তাও পরিবেশন করেছেন। দর্শনের সঙ্গে জীবনের নিবিড় যোগাযোগ আছে—এই সত্যটি অনুভব করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র। তাই একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে ভাবীকালের সাধকদের কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন যথেষ্ট আনন্দ দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে। বহু বছর পূর্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁর অভিভাষণে কৃষ্ণচন্দ্র বলেছিলেন যে, কেবল রাষ্ট্র বা সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, চিন্তার রাজ্যেও আমাদের স্বরাজ অর্জ্জন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আজ আমরা পেয়েছি; কিন্তু চিন্তার দৈন্য আমাদের জাতীয় জীবনকে কলুষিত করে রেখেছে। প্রাচীন ভারতে চিন্তার যে প্রসার, প্রভাব ও মর্য্যাদা ছিল আজ তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। তাই আজ আমাদের চিন্তাজগতে উত্তর-সাধকের কর্ত্তব্য হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার মূল সূত্রটিকে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখা। এই দিক দিয়ে স্বাধীন চিন্তার পথকর্ত্তা এবং জাতীয় প্রচেষ্টার অন্যতম প্রবর্ত্তক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

আড্ডাধারী সুকুমার

(১৯০৩—০৭)

অধ্যাপক—বিনয়কুমার সরকার

[**পরিচিতি** :—স্বর্গীয় সুকুমার চট্টোপাধ্যায় সে যুগে প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তিকালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন এবং কর্মদক্ষতার গুণে বাংলা সরকারের রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল পদে উন্নীত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা পুষ্পরাণী দেবী "পুণ্যকাহিনী" নামক পুস্তকে পিতার স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি শ্রদ্ধার সহিত সুকুমারবাবুর জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং পিতৃবন্ধুগণের কয়েকটি রচনাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই রচনাগুলির মধ্যে সুকুমারবাবুর সতীর্থ বিশিষ্ট বন্ধু অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ের

"আড্ডাধারী সুকুমার" লেখাটি আমরা কলেজ ম্যাগাজিনের এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। এই লেখাটির মধ্যে অতি অল্প পরিসরে অধ্যাপক সরকার কেবল সমসাময়িক মেধাবী ছাত্রগণের নামই উল্লেখ করেন নাই,—সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগের নানা আন্দোলনের বিষয়েও সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যিক ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক স্বর্গীয় নরেশচন্দ্র ঘোষ, প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও সাহিত্য দার্শনিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত; বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি মনীষিগণ অর্ধ শতাব্দী পূর্বে কলেজে এবং হস্টেলে কিভাবে ছাত্রজীবন যাপন করিতেন, বর্তমান সময়ের ছাত্রগণ তাহা পড়িয়া কৌতুক অনুভব করিবেন।]

১৯০৩ সালের জুন মাসের শেষাশেষি। ইডেন-হিন্দু হস্টেলের নয়া বাড়ীর দোতলায় সিঁড়ির সামনের বারান্দা। বনোআরি খাবারওয়ালার চাঙারিতে লুচি তরকারি, মাংস, সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি মাল সাজানো। সম্মুখে খেলার মাঠ।

জিতেন বাগচির সঙ্গে একটা ছোকরা দাঁড়াইয়া রসগোল্লা খাইতেছে। পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কীরে তুই আবার কে?" বলিল:—"সুকুমার চ্যাটার্জি।" "কোথ থেকে?" "মেদিনীপুর।"

"তুই কে?" "বিনয় সরকার।" কোথ্ থেকে? "মালদা।"

ব্যস্। এই সুরু।

জিতেন অঙ্ক কষে। বাড়ী তার বহরমপুরে। অঙ্ক কষিয়েদের দলে ছিল ময়মনসিংহের নরেশ ঘোষ। সে অবশ্য হষ্টেলে থাকিত না। আর একজন, সারদা মাইতি। বাড়ী বীরভূম; ওর ঘর ছিল পুরনো বাড়ীর দোতলায়। সুকুমার ইত্যাদির সঙ্গে তার দহরম-মহরম ছিল বেশ। একালে নরেশ ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। সারদা পাটনার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। জিতেনও অঙ্কের প্রফেসর। অল্প বয়সে মারা যায়।

আমাদের এই আড্ডার "খুড়ো" ছিল মনোরঞ্জন মৈত্র। নয়া বাড়ীর নীচের তলায়,—নাইবার কলের কাছে ছিল তার ঘর। কাজেই তেল মাখিবার সময় গুলতান জমিত তার ঘরে দস্তুরমতন। ফরিদপুরের ছোঁড়া। একটু-একটু "বাঙাল"-"বাঙাল" আওয়াজ। তবে নরেশের মত নয়। নরেশের "চ-টা" আর "জ-টা" কোন দিনই মেরামত হইল না। মনোরঞ্জন ছিল সংস্কৃত পণ্ডিত। যখন-তখন সুকুমার আসিয়া বলিত—"চ, খুড়োর ঘরে গিয়ে সংস্কৃত শ্লোক শুনে আসি।" নরেশ আর সারদাও অনেক সময় হাজির থাকিত। রীতিমত পণ্ডিতী পাঠ। লোক জুটিত ঢের। কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ ইত্যাদি বইয়ের কথা মনে পড়িতেছে। কিছুদিন প্রোফেসরি করার পর মনোরঞ্জন ডেপুটি হইয়াছিল।

রংপুরের অতুল গুপ্ত হষ্টেলে থাকিত না। প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দায় সে ছিল এই আড্ডারই অন্যতম ধুরন্ধর। সুকুমার ফাঁকে-ফাঁকে অতুলের তর্কাতর্কি শুনিতে

আসিত। অতুলের কথার ঢঙ ছিল টানা-টানা। এখনো প্রায় সেই রকমই আছে। হাইকোর্টের আওয়াজ শুনি নাই। ঘরোআ বৈঠকের বলা-কওয়ার টানই বলিতেছি। হস্‌টেলে তার বড় বেশী আনাগোনা ছিল না। গম্ভীর গোছের দার্শনিক। একালেও প্রায় তাই। বোধ হয় প্রমথ চৌধুরীর ("বীরবলের") সঙ্গে গা-ঘেঁষা-ঘেঁষি করিয়া কিঞ্চিৎ কিছু সামাজিক মানুষ হইয়াছে।

হষ্টেলের বাসিন্দা ছিল নলিন চক্রবর্ত্তী। পুরানো বাড়ীর দোতালায়। দর্শন-পড়ুআ। আড্ডাধারী ছিল মন্দ নয়। সুকুমারের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা চালাইত। দেশ তার বগুড়ায়। একালে উকিল। সুকুমার একদিন নলিনকে বলিল—"বিনয়টা বাংলা সাহিত্যে আনাড়ি, দেতো একবার রবি বাবুর কিছু শুনিয়ে।" মোহিত সেনের সম্পাদিত একটা বই হইতে নলিন পড়িতে আরম্ভ করিল—"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত" ইত্যাদি। যতই পড়িতেছে ততই আমি মাত্ হইতেছি। মুখে আর রা বাহির হইতেছে না। যাকে বলে অবাক্। শেষ পর্য্যন্ত শুনিলাম ঃ—"আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা।" যেই থামিল আমি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম, আনন্দে আর বিস্ময়ে। ভাবিলাম আরও বোধ হয় খানিকটা আছে। দেখিলাম আর নাই। আমি ত হতভম্ব। আমার ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখিয়া নলিন ও সুকুমার একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"কীরে, বাংলা সাহিত্য কিছু নয়? না?" জবাব দিলাম ঃ—"হাঁ কবিতা বটে। "আর্ট" (শিল্প) বটে। ঐ রকম ভাবে হঠাৎ এসে থেমে গেল? উঃ কী বাহাদুরি;" তখন সুকুমারের সঙ্গে আমরা সকলে প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিকে (১৯০৩-০৪)।

১৯০৪ সালের কথা। হস্‌টেলের ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া সুকুমার, মনোরঞ্জন, নলিন আর অন্যান্য সকলকে লম্বা গলায় বলিতেছে ঃ—"সারদা মাইতি কী ব'লেছে শুনেছিস?" আমি ওখানে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"কৈ? অনেকদিন তো তার টিকি দেখা যায় না?" "শোন্। বল্‌ছে ঃ—'ভাই, বিবেকানন্দ হষ্টেলে বিবেকের আনন্দ হ'লো কিনা জানি না। কিন্তু উদরানন্দ তো হয় নি। তাই আবার অধম-তারণ বি'দ্দু হষ্টেলেই পুনর্মূষিকো ভব'।" সেই সময় মেছুআবাজার ষ্ট্রীট আর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা 'ছাত্রাবাস কায়েম হয় বিবেকানন্দর নামে। বিবেকানন্দের মৃত্যু ১৯০২ সালে।

জলপাইগুড়ির শান্তিনিধান রায় একদিন সুকুমারের সঙ্গে হাত-পা নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছে। বকাবকির মুদ্দা ঃ—"বোলপুরের শান্তিনিকেতনে রবিঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।" সুকুমার বলিল ঃ—"চল একবার গিয়ে দেখে আসি।" শান্তি হষ্টেলেই থাকিত। আজকাল চায়ের বেপারী। রবিবার ব্রাহ্মসমাজের গান শুনিয়া আসিত আর বলিত ঃ—'সমাজে গেলে আমি বেশকিছু ইম্পেটাস (উদ্দীপনা) পাই।"

দর্শন-পড়ুআ মনোমোহন বসুর সঙ্গে সুকুমার বকাবকি করিতেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দায়। সেখানে হাজির ছিল রাখাল ব্যানার্জী (একালের মহেঞ্জোদড়োর

উদ্ধার কর্ত্তা) আর বিজয় বসু (একালের মেঅর)। সকলেই বলিল :—"আরে বিনয়, আমাদেরকে একদিন তোর ডন সোসাইটির তীর্থে নিয়ে চল্। শুনে আসি সতীশ মুখার্জির বক্তৃতা। দেখি কার পাল্লায় পড়েছিস।" পরের দিন হষ্টেলের কল-তলায় বিশ-পচিশ জনের হৈ-হৈ-রৈ-রৈ'র ভিতর সুকুমার সকলকে বলিতেছে :—"জানিস্ ডন সোসাইটীতে বিনয় কী পড়তে যায়? সুখও কিছু নয়, দুঃখও কিছু নয়। বাঃ, মানুষগুলা গাছ-পাথর নাকি রে? সুকুমার পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামীর গীতা ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিয়াছিল। ছাপরার রাজেন্দ্র-প্রসাদ, মনোমোহন ইত্যাদি অনেকেই ছিল। "রাজেন্দর" আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়িত। হষ্টেলে থাকিত নয়া-বাড়ীর নীচের তালায়। রাধাকুমুদের তদ্‌বিরে সে ডন সোসাইটীতে আমাদের গুরু-ভাই। আজকাল রাজেন্দর ডমিনিয়ান-ভারতের খাদ্য-সচিব। রাধাকুমুদ মুখার্জি বয়সে ও ক্লাসে আমাদের অনেক বড়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভা হইতে একদিন সুকুমার মনোরঞ্জন, নরেশ, শান্তি ইত্যাদির সঙ্গে ফিরিতেছি। সন্ধ্যার পর। শীতকাল। ১৯০৩ কিম্বা ১৯০৪। আপার সারকুলার রোডে তেল কল, সুড়কির কল, ময়দার কল ইত্যাদি কলের আবহাওয়া ধোঁআয় আর ধুলায় সকলেরই চোখ কট-কট করিতেছে। অস্থির হইয়া সুকুমার বলিল :—"এই জন্যই তো গবর্মেণ্ট প্রেসিডেন্সি কলেজটাকে কলিকাতা হইতে সরাইতে চায়। খুব ভাল প্রস্তাব নয় কি? ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র কলিকাতা, রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র কলিকাতা। এইখানে কি লেখাপড়ার কেন্দ্র রাখা উচিত? লেখাপড়ার জন্য চাই রাঁচি ইত্যাদি স্বাস্থ্য-কর নির্জন জায়গা।" ইত্যাদি। আমি বলিলাম উল্টা :—"হট্টগোলের আর ধুলাময়লার ভিতরই ব্যবস্থা করা উচিত লেখাপড়ার জন্য। পোষাকি আবহাওয়ায় মানুষ তৈয়ারী হয় না। মানুষ গড়িবার জন্য বনে জঙ্গলে, লোকজনের বাহিরে যাওয়া ঠিক নয়।'

তখনকার দিনে দেশের ভিতর চলিতেছিল বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের তদন্তসংক্রান্ত তক্কাতক্কি। সতীশ মুখার্জি, গুরুদাস ব্যানার্জী, সুরেন্ ব্যানার্জি, ("বেঙ্গলী"), মতি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা) ইত্যাদি সকলেই কমিশনের বিরুদ্ধে।

রবি বাবু "স্বদেশী সমাজ" পড়িলেন দু-দুবার। কলিকাতার ছেলে ছোকরা মহলে হুলুস্থুল। জিতেন, সুকুমার, শান্তি, নলিন ইত্যাদি সকলেই বহুমুখে তারিফ করিতেছে। সুকুমার জিজ্ঞাসা করিল :—"কীরে, বিনয়, তুই যে কিছু বলছিস না?" "ভাই, দুটোর কোনাটাতেই যাই নি।" "কেন?" ডন সোসাইটীর বারণ না কি রে? "তা কেন হবে? সতীশবাবু নিজেইতো হাজির ছিলেন, দুবারই। হারাণ চাকলাদার, রাধাকুমুদ, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রাজেন্দ্র ইত্যাদি ডন সোসাইটীর অনেকেই দু-দুবার শুনে এসেছে।"

১৯০৪ সালের বর্ষাকালে চৌরঙ্গীর মাঠ থেকে ফিরিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সুকুমার বলিতেছে :—"ধর্ম্মতলার খবরের কাগজের অফিসের দেওয়ালে কী ছাপা দেখলাম জানিস্? ওয়ার ইমিনেণ্ট। লড়াই বাধো-বাধো।" "সে আবার কী?" মনোরঞ্জনকে

সুকুমার বলিল :—"বিনয়টা আদার বেপারী, জাহাজের খবর রাখেনা।" খুব গল্প-গুজব চলিতে লাগিল। ১৯০৪ সালের কথা। রুশ ভাল্লুক ছাগলকে গিলিতে আসিতেছে।

বাংলাদেশকে দু-টুকরা করিবে ইংরেজ জাত। বাঙালীর বাচ্চা তা সইবে না। টাউন হলে বিলাতী মাল বয়কটের জন্য সভা হইল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য। বঙ্গ বিপ্লবের সূত্রপাত। ঠিক যেন লড়াই। পরের দিন কলেজে সুকুমার, শান্তি ইত্যাদি সকলে জিজ্ঞাসা করিল :—"তোকে তো টাউন হলে দেখ্‌লাম না। তুই আবার বিলাতীমালের ভক্ত হলি কবে? ডন সোসাইটীতে তো সতীশ বাবু স্বদেশী জিনিষের দোকানও খুলেছেন। সেখানেরা তোরা কেনা-বেচার করবার ও তো শিখছিস্?"

আমি তখন হিন্দু হষ্টেল ছাড়িয়া দিয়াছি। সতীশ বাবু, রাধাকুমুদ মুখার্জী, রবি ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব-উপাধ্যায় আর পণ্ডিত মোক্ষদা সামাধ্যায়ীর সঙ্গে থাকি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপকার একটা মাঠওয়ালা বাড়ীতে। মাঠটা পাস্তের মাঠ নামে পরিচিত। বাড়ীটার নীচের তালায় 'ফিল্ড অ্যাণ্ড আকাডেমী' ক্লাব। সেই ক্লাব ছিল বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজয় চ্যাটার্জি (ব্যারিষ্টার), রজত রায় (ব্যারিষ্টার), সুবোধ মল্লিক (জমিদার) ইত্যাদি জননায়কদের আড্ডা। দোতলায় ছিল সতীশ-ব্রহ্মবান্ধবের "মেস"। সুকুমার, মনোমোহন, শান্তি ইত্যাদি দুএকবার আমাদের এ মেসে ঢু' মারিয়া গিয়াছিল। আমার হষ্টেল ছাড়াটা সুকুমার, মনোরঞ্জন ইত্যাদির পছন্দ-সই ছিল না। বলিয়াছিল :—"হষ্টেলে থেকে গেলেই ভাল করতি।" যাহা হউক সতীশ বাবুর "বাথানে" ব্রজেন শীল, বিপিন পাল, রবি ঠাকুর, হীরেন দত্ত, গুরুদাস ব্যানার্জি, আশু চৌধুরী (ব্যারিষ্টার), মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী (জমিদার) ইত্যাদি সেকালের ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ-যমের আসা' যাওয়া ছিল। এই অধমের চৌকিতেও অনেকেই বসিয়া গিয়াছেন।

কলেজ স্কোয়ারে "স্বদেশী" সভা। বক্তৃতা করিল সুকুমার। জিজ্ঞাসা করিলাম :—"কী বল্‌লি?" সুকুমারের জবাব :—"কাল কলেজে অতুল বল্‌ছিল, 'দেশটা বড় হ'য়ে গেছে। যেখানেই যাই সকলেই কিছু না কিছু নতুন বলে। আমার পক্ষে বিশেষ কিছু বল্‌বার দরকার হয় না।' ঠিক সেই সুরেই আমিও গেয়ে এলাম।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে "ষ্টুডেন্টস ম্যাগাজিন" বাহির হইল (১৯০৫)। সুকুমার, খুড়োকে' অতুলকে, নলিনকে, আমাকে, যাকে পায় তাকে ডাকিয়া বলিতেছে—"আরে তোদের কাছে এই মাসের ষ্টুডেন্টস্ ম্যাগাজিনটা আছে? থাকে তো দে। বড্ড জরুরি। না থাকে তো এই একটা দিচ্ছি। নিয়ে যা। ঘরে বসে এটাকে দুম্‌ড়ে-মুচড়ে কালী পেন্সিলের দাগ লাগিয়ে কালই ফেরৎ দিবি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাণ্ড কী রে সুকুমার? কী হয়েছে?" "আরে ভাই, পুলিশ নাকি প্রেসিডেন্সি কলেজের উপর চটেছে। প্রিন্সিপাল এই কাগজ আর বের করতে দেবে না।" "তাহলে কাগজটাকে দুম্‌ড়ে-মুচড়ে কালী-পেন্সিলের দাগ লাগিয়ে ফেরৎ দিতে বলছিস কেন? "প্রিন্সিপ্যলকে শ'দেড়-দুই কপি

ফেরৎ দিতে হবে। দেখাবো যে, আমরা কাগজটা এখনো বেশী বিলি করিনি। যেগুলো বিলি হয়েছিল সে-সবই ফেরৎ নিয়েছে। তাহলে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব পুলিশের কর্তাদেরকে ঠাণ্ডা রাখতে পারবে।" এই সংখ্যাতে সরকারী শাসন সম্বন্ধে নরেশ সেনগুপ্তর কড়া সমালোচনা ছিল এক প্রবন্ধে। নরেশ সেনগুপ্ত আমাদের চেয়ে বয়সে ও ক্লাসে বেশ-বড়। বোধ হয় রাধাকুমুদের সহপাঠী। একালে উকিল ও গল্পিক।

সেই বৎসরই পূজার ছুটির পর বিশ্ব-বিদ্যালয় বয়কটের ধুম। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কায়েম হইতেছে। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের জন্য তোড়জোড় চলিতেছে। পার্সিভ্যাল সাহেব এম-এ ক্লাসে ইংরেজি পড়াইতে-পড়াইতে কালো মুখ লাল করিয়া দেশের লোকগুলাকে বেশ-কশে ঘুষা জুতা লাগাইলেন। পার্সিভ্যালের গালগুলা আমরা খুবই ভালবাসিতাম। এই গালাগালিগুলিও বেশ লাগিল। ক্লাসের পর সুকুমার বলিতেছে—"দেখলি, তোর দিকে তাকানো আর চোখ রাঙানো? প্রেসিডেন্সী বয়কট করতে চাস্। তার মানে, পার্সিভ্যাল বয়কট? পার্সিভ্যাল সাহেবের চেয়ে বড় মাষ্টার পেয়েছিস আর কাউকে? এ কি পার্সিভ্যালের সহ্য হয়? দেশের লীডারগুলা ছেলেগুলাকে প্রেসিডেন্সি হ'তে ভাগিয়ে নিয়ে পরকাল নষ্ট করাতে চায়? কাজেই পার্সিভ্যালের জুতো।"

হস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। ডন সোসাইটিতেও সতীশবাবু তাঁকে ডাকিয়া লইয়া বক্তৃতা দেওয়াইয়াছিলেন। একদিন পণ্ডিত মশায় ডাকিয়া পাঠাইলেন তাঁহার ঘরে। মনোরঞ্জন আর সুকুমার সঙ্গে গেল। ঘরে গিয়া দেখিলাধ—শীতলা গাঙ্গুলি (একালের ডেপুটী) ও অন্যান্য দু-একজনকে। একটা সরকারী চিঠি হাতে দিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"এই নেও ষ্টেট-স্কলার্শিপের পরোআনা। আই হোপ ইউ উইল কাম ব্যাক্ অ্যাজ সিবিলিয়ান।" সুকুমার আর মনোরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে বলিল—"ওটা দিয়ে আর কী হবে? বিনয় ষ্টেট-স্কলার্শিপ নেবেনা ঠিক ক'রেছে। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"এ আবার কী কথা? কে এমন পরামর্শ দিল?" সুকুমার বলিল—"ও কারুর পরামর্শ শুনে না। এমন কি ল-কলেজ পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমরা ওকে কতবার বলেছি—'অন্ততঃ বি-এলটা পাশ ক'রে রাখ। ভবিষ্যতে কখন কী হয় বলা যায় না। তোর নিজেরই হয়ত খেয়াল বদলে যাবে। উকিলিটা তো স্বাধীন ব্যবসা।" সুকুমার আইন পাশ করিবার জন্য আমাকে অনেক উস্কাইয়াছে। বলিত—"পরে পস্তাবি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলা বয়কট করার প্রস্তাব জননায়কগণের সভায় মঞ্জুর হইল না। গুরুদাস বাবু ছোকরাদেরকে ডাকিয়া বলিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করার দরকার নাই। আমরা একটা নয়া বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ গড়িয়া তুলিতেছি।" সুকুমার "দেখলি? গুরুদাস বাবুর মাথা? সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ও ছাড়িবেন না। অথচ জাতীয় শিক্ষা পরিষৎও খাড়া করাইবেন। তোদের ডন সোসাইটির প্রেসিডেণ্টই তো তিনি।

সতীশবাবুর মেজাজ এখন কোন্‌দিকে রে? তোদের চালগুলা ভেস্তে যাচ্ছে দেখছি!"

হষ্টেলে সুকুমারের ঘরে মহা হট্টগোল। কোঁদলের বিষয়—ন্যাশন্যাল কলেজ। বলিতেছে—"ন্যাশন্যাল কলেজ, ন্যাশন্যাল কলেজ শুনতে-শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল তোদের ঐ কলেজে কে যাবে পড়তে? ইতিহাসও পড়াবে অরবিন্দ ঘোষ, ইংরেজিও পড়াবে অরবিন্দু ঘোষ। এক অরবিন্দর নামে কলেজ চলবে কদিন রে, গাধা? ব্রজেন শীলও মাষ্টার হচ্ছেন না, রামেন্দ্র ত্রিবেদীও মাষ্টার হচ্ছেন না। মোহিত সেনও মাষ্টার হচ্ছেন না, প্রফুল্ল রায় জগদীশ বোসও মাষ্টার হচ্ছেন না। কলেজের নাম হবে কিসে? মোক্ষদা সামাধ্যায়ীকেই বা কে চেনে? রাধাকুমুদ আর রবি ঘোষ তো ছোক্‌রা মাত্র। ঝালে-ঝালে-অম্বলে সবে ধন নীলমণি অরবিন্দ ঘোষ!"

১৯০৬ সালে হষ্টেলের পুরানো বাড়ীর নীচের তলায় থাকে বঙ্গেন্দু মুখার্জী। বাড়ী কৃষ্ণনগর। তাকে আমরা ডাকতাম বাংলার চাঁদ বলিয়া। তখন আমাদের এম-এ চলিতেছে। সুকুমার মনোরঞ্জনকে বলিল—"মজার কথা শুনেছিস? বাংলার চাঁদের কাণ্ড? সেদিন টিপিং সাহেব (প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক) এসেছিল হষ্টেল দেখতে। যেই বঙ্গেন্দুর ঘরে ঢোকা আর যাবে কোথায়? অমনি বঙ্গেন্দু জলের কুজোটা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে খেলার মাঠের ভিতর ধুপ ক'রে ফেলে দিলে। টিপিং তো অবাক্! ব্যাপার কী? খৃষ্টিয়ান ঢুকবে হিন্দুর ঘরে? যে ঘরে খাবার জল থাকে?" খুড়োর ঘর ছিল তখন আড্ডাধারীতে ভরপুর। হো-হো হাসিতে গুলজার হইল।

বঙ্গেন্দু, খুড়ো আর আমি সুকুমারের ঘরে গুলতান করিতে-করিতে একসঙ্গে পড়া মুখস্থ করিতাম। কার্লাইলের "সার্টার রেসার্টাস", শেক্‌সপীয়ারের 'সিম্বেলিন' অথবা পোপের 'এসে অন্ ম্যান' ইত্যাদি মাল পেটে ঢুকিত। ১৯০৬ সাল। পাড়ার ছোঁড়ারা আমাদের চেঁচাচেঁচি আর হাতাহাতিতে অস্থির। "ত্রাহি মধুসূদন" ডাক ছাড়িতেছে। বলাবলি করিতেছে—"সুকুমারটাকে এই ঘর ছাড়াতে হবে।" সুকুমার কী করে? বাধ্য হইয়া বলিতেছে—"ছাখ্ তোর দার্শনিক ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা আর চলবে না। দে ওসব বাদ। দেখবি আর গণ্ডগোল হবে না। তুই যেখানে-সেখানে ফিলিজফি ঢুকাবি। এইজন্যই ত হাতাহাতি। ওসব আমারও বরদাস্ত হবে না, বঙ্গেন্দুরও বরদাস্ত হবে না। মনোরঞ্জন একটু-আধটু তোর দিকে যায় বটে। কিন্তু ফিলজফি নিয়ে ঢলাঢালি করে না। তোকে ডন সোসাইটি বড্ড বেশী পেয়ে বসেছে।"

একদিন মনোরঞ্জনকে সুকুমার বলিল—"বিনয়ের বাতিক দেখেছিস? গবর্মেণ্ট পার্সিভ্যালকে দিয়ে সন্ধ্যার সময় কমার্সের ক্লাস খুলেছে। ও গিয়ে সেই ক্লাসেও ভর্ত্তি হ'লো। ফিরে ফির্ত্তি ইকনমিক্‌স্ মুখস্থ করচে নতুন করে। যেখানে পার্সিভ্যাল সেইখানেই বিনয়। মায় ফিলজফির ক্লাসেও যায় পার্সিভ্যালের প্লেটো পড়ানো শুনতে।" সুকুমার, মনোরঞ্জন, অতুল, নলিন, সকলেই অবশ্য পার্সিভ্যাল-ভক্ত। পার্সীভ্যালের নামে আমাদের

সকলেরই জিভের জল পড়িত। তবে এই সম্বন্ধে হাসিঠাট্টার সামগ্রী ছিল এই অধম।

১৯০৭ সালের মাঝামাঝি। কেহ গেল উকিলের দিকে, কেহ মাষ্টার হইল কলেজে, কেহ হাকিমি করিতে চলিল। সুকুমারের সঙ্গে একদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা। তখন থাকি ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের গলিতে—আবার সতীশবাবু, রাধাকুমুদ, রবি ঘোষ ইত্যাদির দলে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপর সুকুমারকে পাকড়াও করিলাম। বলিলাম —"ভাই, ন্যাশন্যাল কলেজের একটা ছোকরা এসে আমাকে ধরেছে তাকে টাকা সাহায্য করতে হবে। টাকার জন্য ধরে আমাকে? আমি করবো টাকা সাহায্য? বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। ত্যাখ্ তো তোর পকেটে কী আছে?" এই বলিয়াই আমি সুকুমারের পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিলাম। যা-কিছু পাওয়া গেল লইয়া বলিলাম—"আচ্ছা এইটাই হোক মাসিক।" উচ্চবাক্য না করিয়া সুকুমার বলিল—"তাই হবে, কিন্তু কোনদিন আমার বাড়ীতে আস্‌তে পারবি না। আর ডাকে আমি কিছু পাঠাতে পারব না। রাস্তায়-ঘাটে যদি দেখা হয় কিছু পাবি।" ব্যাস। ও তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। এই অধম ন্যাশন্যাল কলেজ ঢুকিয়াছে মামুলি সেবক হিসাবে। খালি পা আর খালি গা। জামাও নাই, জুতাও নাই। বিলকুল কপর্দ্দকহীন।

ইন্‌ট্রোভার্ট

শ্রীসুধীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
(চতুর্থ বর্ষ,—আর্টস্)

অপরিচ্ছন্ন মনের কম্‌প্লেক্স নিয়ে
চাতুর্য্য প্রকাশের মাধ্যম এ নয়।
আমি স্বয়ম্ভু—একথা বলার অবিনয়
নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যাক।
বৃত্তটির আয়তন বেড়ে বেড়ে
প্রাণ পা'ক দীর্ঘ কলেবর।

আমি সাধনা করেছি অনন্তকাল
নিরাসক্তি-যোগ।
আজ তার হিসেব করি—
যোগ-ভাগ-পূরন-বিয়োগ।

পরিবেশের সংগে আমার বিচ্যুতি,
আমার একান্ত অসহজ আত্মরতি
মননে আনে গভীর সূর্য্যমুখীনতা।

অনেককাল থেকেই আমি বৈরাগী—
আমার এ পরিচয় সার্থক না হলেও সত্য।
বার্ট্রান্ড্ রাসেল আমাকে অপছন্দ করেন,
মনে জমে ওঠে দুর্মর দৈন্যবোধ ;
তবু স্বভাবের অভাব ত অনস্বীকার্য্য।

কিন্তু আমারো একটি বহিঃসত্তা আছে,
দিন আনি দিন খাই—
সনাতন সাময়িক আমি।
আমারো মনে শ্রান্তি নামে
নিশীথের শিথিল বাতাসে ;
অবসন্ন চেতনায় কালো স্বপ্ন
ঘোলাটে গন্ধ বয়ে আনে।
হলুদ আর সবুজ যেখানে বন্ধুভাবে
কানাকানি করে কথা কয়,
সহরতলীতে আসে দিবসেরও কোলাহলে
পাহাড়তলীর নিরালা বুণো ঘ্রাণ,
আমার সামনে সেখানে পড়ে থাকে
সুমসৃণ পিছল সড়ক।
পাথেয় আমার অধিক নেই,
মনের পরিধিও একান্ত পরিমিত ;
একটি প্রতীকের তাই প্রয়োজন।
ভেতরে ভেতরে আমি তারি সন্ধান করি।
বিষণ্ণ বাতাসের দারুণ ঝাপটায়
অনেককাল থেকেই আমি আবৃত চোখ।

যুগ জয়ী

শ্রীমনোমোহন সাহা
(দ্বিতীয় বর্ষ—বিজ্ঞান)

কিসের কবি তুমি ?
প্রেমের বাঁধাবুলির,
গতযুগের বুকভাংগা ক্রন্দনের,
আর চাঁদের যে আলো মাটিতে পড়ে না
পড়ে শুধু মনে,—
শুধু তার কবি তুমি।
রাঙা সূর্যকে সাদা করে' দেখ তুমি।
এখনও হংসমিথুনের ভাবে বিভোর ;
এখনও ওদের মিলনের অভিসারকে
অর্ধ-জাগর স্বপ্নে দেখ—
অবাস্তব,—তবুও।
কিন্তু কেন ?
চোখে কি পড়ে না
ঐ কালো পীচের রাস্তা,
অন্ধকারে কালো পিশাচের
প্রেতময় ভয়াল চাহনি,
আর দিগন্তের ওই রক্তছেঁড়া মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুতের ঝিলিক—
যা একান্ত বাস্তব
বড় রূঢ় সত্য ?
তুমি নিস্তেজ কেন ?
সূর্য হতে যে রাঙা আলো নিশানা দেয়
রক্তের ভবিষ্যৎকে,
তাও কি রক্তে আনে না উন্মাদনা ?
তোমার গরমরক্তে ?

আজ হতে ভুলে যাও সব ;
পিছনে কাঁদুক তোমার বাসরঘর,
পায়ে দলে যাও তুমি
প্রেমের আবেদনকে ;
প্রেয়সীর চোখের জল
সংকেত আনুক তোমার মনে কালভাঙ্গা ঝড়ের।
চলে যাও কবি,
অনন্তকালের তরে
যে কাল আসেনি
সেই ভবিষ্যের লাগি
মিথ্যা দুর্গন্ধ হতে
অবাস্তব চাঁদের আলো থেকে।
রূপার ঝিলিক হতে মুখ লুকাও তুমি,
তোমার পিচ্ছিল পথে
দুর্গমের মধ্যে অগ্রসর হও তুমি।
যুদ্ধের এ পৃথিবীতে প্রেমের প্রয়োজন নেই।
যুদ্ধ।
যতদিন এর প্রয়োজন না মেটে।
হাতে হাতে মিলাবে
কিন্তু অংগুরীয়ের জন্যে নয়,
ভীষণ অগ্নিক্ষরা অস্ত্রের আদানপ্রদান শুধু
যা ধূলিসাৎ করবে সাম্যের অভাব
ভরাবে এ পৃথিবীকে মুক্তির গানে।
সেই পৃথিবী—
যা তোমার স্বপ্নে এখনও ঘুমন্ত
তাই হবে বাস্তব—সত্য।
আগামীকালের সূর্য-সারথির রথে চড়ে'
আসবে সেই স্বয়ম্বরা,
বরণ করবে তোমাকে।—

শুধু তোমার রক্তের প্রতীক্ষা।
এগিয়ে এস।
এগিয়ে যাও।
তোমার শিরায় শিরায় রক্তের ডাক আনো,
আনো ঝঞ্ঝার বার্তা,
এগিয়ে যাবার গান ধ্বনিত হোক তোমার কণ্ঠে
জয় করো এই যুগকে
যুগের কলংককে।

গ্রন্থ সমালোচনা

মাধুকরী, মাটির মাধুরী ও যাযাবর—শ্রীসুধীর গুপ্ত *

প্রচুর অবকাশ এবং অপরিসীম ধৈর্য সম্বল করে এ-কালের কবিতার বই পড়বার প্রয়াস পেতে হয়। এই দুইয়ের অভাব সত্ত্বেও শ্রীসুধীর গুপ্তের উপহৃত তিনখানি কবিতার বই তাড়াতাড়ি করে পড়ে ফেলবার সুকৃতি সঞ্চয় করেছি। পড়বার আরম্ভ ও সমাপন, এর মাঝখানটার কালগত ব্যবধান দীর্ঘ ও দুঃসহ বলে বোধ হয়নি। একথা গোপন করতে চাইনে যে, যাঁরা নামের মহিমায় বিশ্বাসী আমরা তাঁদেরই ঘরের লোক। কাব্যের শরীর ও আত্মা নিয়ে একই রস-পরিব্যক্তি। নাম সেই কাব্যশরীরের বিগ্রহ বা 'ইষ্টার্থ-ব্যবাচ্ছিন্না পদাবলীর' অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। নাম ও নামীর অভেদ সম্পর্ক কল্পনা করে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সে-কালে তত্ত্ব-রসিক বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলে মনে হয় না।

মাধুকরী নামটিকে ঘিরে রয়েছে একটা অ-বস্তুসক্ত নিষ্কিঞ্চন সর্ব্বত্যাগী অথচ সর্ব্বাত্মযোগী আনন্দরসচেতনা। আমাদের এ-কালের এই গুপ্ত-কবি ব্যাপ্ত চরাচর থেকে প্রাণরস-চঞ্চল আনন্দের মাধুকরী করেছেন। 'মাধুকরীতে' মধুকরের নির্ব্বাধ স্বচ্ছন্দ গতি এবং শ্রবণ-সুভগ মধুপ-গুঞ্জন, অর্থাৎ কল্পনার অবারিত তরঙ্গায়িত প্রসার এবং শব্দসঙ্গীতাশ্রিত ছন্দোহিন্দোল, দুই-ই আছে। মাধুকরী বৃত্তির সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ভাবরসবিশুদ্ধির অভাবও এখানে নেই। যেখানে,

"অন্ধ-গলির রন্ধ্র-বিহীন ঘরে
স্বপন-লোকের সোনার মেয়ের তরে
স্বর্ণ-শিল্পী সোনার গহনা গড়ে।"

আর যেথায়,

"চির-দুরাশার নীল-পারাবার
ওই আকাশের ধারে
স্বপন-মগন যেথানে তপন
আলোকের তারে তারে।"

---

* গ্রন্থকার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

এই দুইয়ের মাঝখানে সবার কাছে মাধুকরী করে 'মাধুকরী'র কবি আনন্দবুভুক্ষুর উপযোগী উপাদেয় পরমান্ন প্রস্তুত করে পরিবেষন করেছেন।

'মাটির মাধুরী'তে আমাদের মাটির মা-টি আর স্বর্গরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে কোনও দ্বন্দ্বের সুর বেজে ওঠেনি। বৈজ্ঞানিক সত্য ও দার্শনিক মতবাদের আমেজ দিয়ে কালোয়াতি ভাজাও হয়নি। বরং এতে আমরা পেয়েছি বাংলার মাটির আর্দ্র স্পর্শ, স্নিগ্ধ গন্ধ এবং শ্যামলিম-মধুর রূপ। আগের শতকের গুপ্ত-কবিকে তাঁর দেশবরেণ্য শিষ্য খাঁটি বাঙ্গালী কবি আখ্যা দিয়েছিলেন। আমাদের এই গুপ্ত কবিও বাঙ্গালী পরিচয় নিয়ে কোনও অস্বস্তি বোধ করেননি, দেখেছি। 'নদীয়ার স্মৃতি' ও 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নিয়ে তিনি অতীত-পন্থী ঐতিহাসিক-বিবেকাশ্রিত অপূর্ব্ব সহৃদয়তার সৃষ্টি ক'রেছেন।

তাঁর যাযাবর বইয়ে হাতী-ঘোড়া উট-ছাগলের সারি বা ভবঘুরে মনুষ্যপ্রবাহের দীর্ঘ শোভাযাত্রা নেই। এতে যেন শুনতে পেয়েছি খেয়ালী নারদের বীণাধ্বনি, শারদচন্দ্রালোক-আলোড়নকারী হরিগুণগান, আর বিস্তীর্ণ পদ্মার বালুচর-সঞ্চারী বাউলের একতারার সুরঝঙ্কার। এই সুর শুনে শত কোলাহলের মধ্যেও যাঁরা উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন, কান পাতেন, তাঁরা বোধ হয় আমার সঙ্গে উপলব্ধি করবেন, 'যাযাবরে'র কবি সত্যই কবিপ্রাণতার অধিকারী।

সুধীরবাবুর কবিতার বই কাব্য হয়ে উঠেছে। আমাদের কাব্য-কথাটি, পশ্চিমের 'রোমান্টিক'-কথাটির মতো, সকলের অতর্কিতে অপাংক্তেয় হয়ে আসছে ব'লে মাঝে মাঝে শঙ্কা হয়। পরিভাষা-সৃষ্টির নির্ম্মম পরিহাস-প্রসূত কিম্ভুত-কিমাকার 'কাব্যিক' বিশেষণ পদটিকে আমরা এর প্রমাণ বলে ধরতে পারি। হালের যাঁরা কবিতা-লিখিয়ে, আর শপথ গ্রহণ করে যাঁরা তাঁদের হলফ-করা সমঝদার হয়েছেন, তাঁরা আমরা যাকে কাব্য বলতাম, তাকে বলতে সুরু করেছেন, মানুষের পলাতকা-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ, বস্তু-সমাকীর্ণ সংঘাত-মুখর জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠভঙ্গের অপরিহার্য পরিণাম। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কাব্যরসিকদের তরফ থেকেও একটা পালটা অভিযোগও আসতে পারে এই বলে যে, বস্তু-সর্ব্বস্ব, সমস্যাতুর অন্নময় জৈব সত্তার কাছে হার মেনে আনন্দময় আত্মপুরুষকে অস্বীকার করার মধ্যেই রয়েছে সত্যকার ভীরু পলায়নীবৃত্তি, তামস-তন্দ্রাতুর অসংযম।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

বিগত শতাব্দীর অমিত-ঐশ্বর্যদীপ্ত কবিপ্রাণতার অধিকারী শ্রীমধুসূদন তাঁর একটি চতুর্দশপদীতে কবিকে 'যমদমী' বলেছিলেন। যা আপাত-গ্রাহ্য, আপাত-বোধ্য, এবং আপাত-মধুর তাতে জেগে রয়েছি আমরা যারা শ্রমজীবী, দেহমনের দিক্ দিয়ে যারা মজুরি করে চলেছি। কবির জাগৃতি আনন্দরস-চেতনায়, সুন্দরের সুনিবিড় ভাবসাযুজ্যে।

সুধীর বাবু কবি। স্বয়ম্-আস্বাদ্য কাব্যগুণে তাঁর রচনাসম্ভার সুসমৃদ্ধ। তাঁর কবি-জীবনের জয়যাত্রার পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁকে বলি 'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ'।

জনার্দন চক্রবর্তী

শতাব্দী—রমেশচন্দ্র সেন। পূরবী পাবলিশার্স

সম্প্রতি যে সব বাঙলা লেখা নাম ক'রেছে—রমেশচন্দ্র সেনের 'শতাব্দী' তাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে একটি। উপন্যাসটির কাহিনী পারিপাট্য-বর্জিত। শতাব্দীর বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় লেখক যে মনোরম কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রেছেন, তার ঘটনাস্থল মঞ্জরী গ্রাম; মূল চরিত্র নিরক্ষর নমঃশূদ্র—রাজ্যেশ্বর। তার সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দময় জীবনের ফাঁকে ফাঁকে দেখি শতাব্দীর হাওয়া বদ্‌লাচ্ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবর্ত্তন অনিবার্য্যভাবে প্রভাবিত ক'রছে ব্যক্তির জীবনকে, দৃষ্টিভঙ্গীকে। নো-চেঞ্জার রাজ্যেশ্বরকে অভিভূত ক'রে শতাব্দীর পূর্ণতম রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাম্যবাদের জয়যাত্রা সুরো হোলো। লেখকের দক্ষতা এইখানে যে, শতাব্দীর ধারা অনুসরণ ক'রতে গিয়ে রাজ্যেশ্বরের পরিপূর্ণ জীবনের কাহিনীকে তিনি পিছনে ফেলে আসেন নি।

রাজ্যেশ্বরের কাহিনী "শতাব্দী" উপন্যাসের কথাবস্তু। অধ্যবসায় এবং উদ্যম সম্বল ক'রে, অগ্নিমণ্ডলের মতো, জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হ'লো। অপরিণতি থেকে ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথে পদক্ষেপে তার দূরদৃষ্টি এবং স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কথা জীবনের সম্বন্ধে তার একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তার সংস্কৃতি শিক্ষাগত নয়, জীবনলব্ধ। এই সংস্কৃতির বলে সে অমলাকে সহজে গ্রহণ ক'রতে পেরেছে এবং টগরের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে সংযত ক'রেছে। সাধারণ কতকগুলি গুণের সমাবেশে রাজ্যেশ্বর অসাধারণ।

"শতাব্দী" উপন্যাসে টগরের চরিত্রটি এক কথায় Subtle। চাঁপা এবং টগর, রাজ্যেশ্বরের জীবনে উভয়ের প্রভাবই সুপরিস্ফুট। কিন্তু চাঁপা অতিমাত্রায় সাধারণ। দুঃখকে টগর সহজভাবে গ্রহণ ক'রেছে। রাজ্যেশ্বরের প্রতি নিজের দুর্ব্বলতাকে সে চালনা ক'রেছে কল্যাণের পথে। টগর ত্যাগের মধ্যে চরিতার্থতার সন্ধান পেয়েছে।

রাজ্যেশ্বরের জীবনের শেষার্ধে অমলার স্থান বিশিষ্ট। জীবনের সংস্পর্শে প্রগল্‌ভ অমলারও রূপান্তর ঘ'টলো। তার ওপর রাজ্যেশ্বরের প্রভাব কম নয়।

ত্রিগুণাকাকা "শতাব্দী"তে সামাজিক বিপ্লবের প্রতীক। অগ্নিমণ্ডল এবং রাজ্যেশ্বরের একটা সাদৃশ্য এই যে দু'জনেই সুপ্রতিষ্ঠিত। মহেশ্বর এবং বীরেশ্বর দু'টি স্বয়ং-সম্পূর্ণ চরিত্র।

উপন্যাসটিতে ঘটনার জটিলতা বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব বিশেষ ক'রে চোখে পড়ে। শতাব্দীর ছবিও যেন একটু হাল্কাভাবে আঁকা। বীরেশ্বর এবং মহেশ্বরের চরিত্র মূল কাহিনীকে তেমনভাবে প্রভাবিত ক'রতে পারে নি।

কিন্তু "শতাব্দী" অভিনবত্ব এই যে, একদিকে লেখক যেমন শতাব্দীর বিবর্ত্তন দেখিয়েছেন, অপরদিকে তেম্‌নি একটা জীবনের দর্শন উপস্থাপিত ক'রেছেন পাঠকদের সম্মুখে। লেখকের লিপি-চাতুর্য্যকে প্রশংসা ক'রতে হয়। আমাদের কাছে তিনি স্বল্প-পরিচিত হ'লেও তাঁর লেখায় নবীন লেখকের কাঁচা হাতের কোন ছাপ নেই।

অশোককুমার মুস্তাফি
৬ষ্ঠ বর্ষ, আর্টস।

আমাদের কথা

ষ্টুডেণ্টস্ য়ুনিয়ন কাউন্সিল ১৯৪৮—৪৯

বাৎসরিক কার্য্যের সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সাধারণ বিভাগ :

বর্ত্তমান বৎসরের ছাত্র পরিষদের বিদায় গ্রহণের দিন সমাগত। ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আমি শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক মহাশয়দের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বহু জটিল বিষয়ে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ, মূল্যবান উপদেশ এবং আন্তরিক সহানুভূতি আমাদের দায়িত্বভার লঘু এবং সুসম্পন্ন করার পথে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

প্রতিটি ছাত্রবন্ধুদের কাছেও আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি স্মরণীয়।

কলেজের কোষাধ্যক্ষ শ্রীরমেশচন্দ্র নন্দী এবং কলেজ কার্য্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্মকর্ত্তারাও আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে পরিষৎ তার কাজ এগিয়ে নিয়ে এসেছে। পরিষদের অধিবেশনে সদস্যগণের মূল্যবান আলোচনা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকেরাও তাঁদের নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশনা করে প্রসংশা অর্জন করেছেন।

পরিষদের সহঃ-সভাপতি শ্রীঅমল বসু বিমানবাহিনীতে যোগদান করায় পদত্যাগ করেন।

"প্রতিষ্ঠাতৃ সপ্তাহ" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাধারণ বিভাগের পরিবেশনায় এক সান্ধ্য সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের ছাত্র পরিষদের এইটি সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান। প্রাক্তন ছাত্র এবং বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রকাশনা বিভাগ কর্ত্তৃক দুইটি পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা নানাকারণে ব্যর্থ হয়েছে। আশা করি, আমাদের পরবর্ত্তীগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হবে।

রবীন্দ্র-পরিষদের প্রথম অনুষ্ঠান হয় "বসন্তোৎসব"। এ ছাড়া "বর্ষামঙ্গল", "বৃক্ষরোপন" এবং "শেষ বর্ষন" প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় কলেজ পরিবর্ত্তন করেন। পরিষদের নির্দ্দেশে আমাকেই এই বিভাগের পরিচালনাভার গ্রহণ কোরতে হয়।

বিতর্ক বিভাগ বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং দৈনন্দিন সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। বিতর্ক বিভাগ বাঙলায় বিতর্ক প্রতিযোগীতা এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

বিরাম পীঠিকা বিভাগ কর্ত্তৃক বাৎসরিক ষ্টিমার পার্টির আয়োজন, সত্যই ছাত্রমহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিরামপীঠিকা বিভাগ প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন।

COLLEGE UNION COUNCIL

SESSION 1948-49

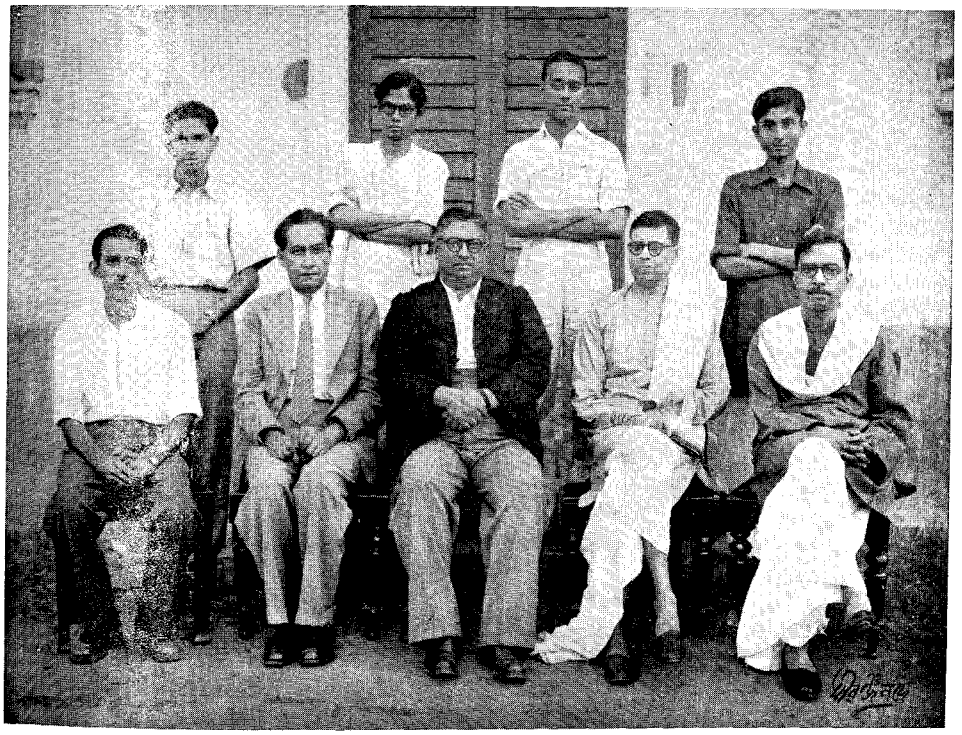

Sitting (left to right) :— Jayanta Maitra (Genl. Secy., College Union Council), Prof. S. Sarkar, Principal J. Ghose, Prof. J. Chakrabarty (Chairman, Social-Service League), Prof. S. C Sen Gupta. (Chairman Publication Section).

Standing (left to right) :— B. Ray (Junior Common-room Secy.), A. Dutta (Debate Secy.), N. Mukherji (Drama Secy.), D. Banerji (Social-Service Secy.)

SOCIAL SERVICE LEAGUE

SESSION 1948-49

Sitting (L. to R.)— Abul Kamal, Dilip Banerji (Social Service Secy.) and Dhruba Banerji.
Standing(L. to R.)— Pulin Das and Amalendu Barman.

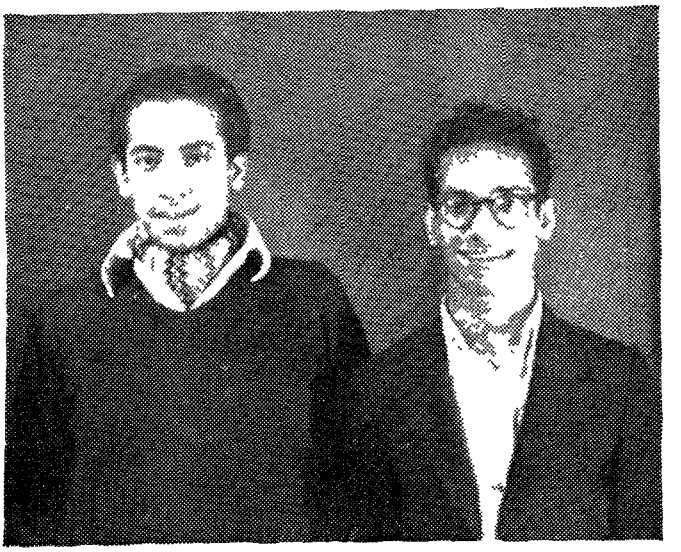

THEY MET THE BRITISH DEBATING TEAM

SHIBENDU GHOSH (Left)—6th Year Arts (Old)—at Calcutta.
NILMANI LAHIRI (Right)—4th Year Arts—at Jalpaiguri.

সমাজ-সেবা বিভাগ তাঁদের কাজ চালিয়েছেন বেশ ভালভাবেই। এই বিভাগের পরিচালনাধীনে কলেজের বিরাম পীঠিকায় একটি অবৈতনিক সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দুঃস্থ পরিবার এবং বাস্তুহারাদের সাহায্য ক'রে এই বিভাগ আশীর্ব্বাদ এবং প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। সেবাকার্য্যের জন্য সমাজ-সেবা বিভাগ বাঁকুড়া অঞ্চলে গিয়েছিলেন।

অভিনয় বিভাগ এবছর একটি মাত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর "শ্রীরঙ্গম" নাট্যমঞ্চে অভিনয়টি মঞ্চস্থ করার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু কলেজের কয়েকজন ছাত্রবন্ধুদের প্রতি পুলিশের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে পরিষদের আহ্বানে সেই সময় কলেজের ছাত্রবন্ধুরা ধর্ম্মঘট সুরু করেন এবং সেইজন্য অভিনয় অনুষ্ঠানের দিন পরিবর্ত্তন করা হয়। অবশেষে ছাত্রবন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে ২৫শে নভেম্বর "শ্রীরঙ্গম" নাট্যমঞ্চে "আলমগীর" (পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত) অভিনীত হয়। শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ এবং শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক সাহায্য ও শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানটির সুচারু পরিবেশনায় যথেষ্ট সহায়তা করে। তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এর পর আমাদের অভিযোগের পালা। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রবন্ধুদের—আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—এই অভিযোগটির নিদর্শন পূর্ব্ব বৎসরের পত্রিকাতেও দেখতে পাবেন। পরিষৎ-এর জন্য একটি পৃথক ঘর, পরিষদের সভ্যদের অনুরোধে, আমি বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি—কোন ফলোদয় হয়নি। আমার অনুরোধ, পরবর্ত্তী ছাত্রবন্ধুরা যেন কলেজের ছাত্র পরিষৎকে "যাযাবর বৃত্তি" থেকে মুক্ত করে "গৃহস্থ" করার দিকে সর্ব্বপ্রথমে মনোনিবেশ করেন। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে, আমার পরবর্ত্তী সাধারণ সম্পাদক মহাশয়দেরও আশ্বাস দিতে পারি, এর ফলে, তাঁরা "চলন্ত-অফিস ঘর" হওয়ার সৌভাগ্য থেকে পরিত্রাণ পাবেন।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের একটি হলঘর-এর প্রয়োজন—যেখানে বিভিন্ন উৎসব এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন কোরে আর্থিক দিকে যেমন ব্যয় লাঘব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'বে তেমনি আনন্দভোগের মাত্রা, পরিমাণের দিক থেকে বিচার কোরলে, বর্ধিত হবে বলেও আমার বিশ্বাস।

আপনারা আমার শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

শ্রীজয়ন্ত প্রসাদ মৈত্র—সাধারণ সম্পাদক

প্রকাশনা বিভাগ ঃ

অবশেষে আমাদের পত্রিকা প্রকাশিত হ'ল—যদিও অস্বাভাবিক দেরীতে। পত্রিকা প্রকাশ ক'রতে গিয়ে আমাদের সবচেয়ে যে অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে তা হ'ল আর্থিক অনটন। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক অসঙ্গতিই পত্রিকা প্রকাশে এই অস্বাভাবিক দেরীর কারণ। এ বিষয়ে প্রায় চিরাচরিত রীতিতে আমিও কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে আরও একটা অসুবিধা যা আমাদের ভোগ করতে হয়েছে তা হচ্ছে সাধারণ ছাত্রদের সহযোগিতার অভাব। অবশ্য সেজন্য সাধারণ ছাত্রদের কোন দোষ দেওয়া যায় না—প্রকাশনা বিভাগের গঠন পদ্ধতিই এজন্য দায়ী। সত্যিকথা বলতে কি, এমন ভাবেই আমাদের পত্রিকা প্রকাশিত হয় যে সাধারণ ছাত্ররা ইচ্ছা থাকলেও সহযোগিতা করার কোন সুযোগ পান না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে প্রকাশনা সাব-কমিটির সহ-সভাপতি শ্রীশুভব্রত ঘোষ এবং সহপাঠি শ্রীঅশোকমোহন রায় ও শ্রীমণীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। তবে সবচেয় বড় কথা যা আমাকে বলতেই হবে তা হচ্ছে নূতন প্রকাশনা সম্পাদক শ্রীসৌরীন চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা প্রকাশের অনেক কাজই করতে হয়েছে তাঁকে—যদিও দায়িত্ব ছিল আমারই!

বংগেন্দু গংগোপাধ্যায়—সম্পাদক।

বিরাম পীঠিকা ঃ

১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার আমরা বাৎসরিক ষ্টিমার পার্টির আয়োজন করি। আমাদের ষ্টিমার সকাল দশটায় চাঁদপাল ঘাট ছেড়ে ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে যাত্রা করে এবং দুপুর তিনটের সময় তার গতি ফিরিয়ে সন্ধ্যে সাতটায় আবার কোলকাতায় ফিরে আসে। ষ্টিমারে মাধ্যাহ্নিক আহার, বৈকালিক চা ও আনুসংগিকের ব্যবস্থা ছিল। প্রায় সাড়ে চার-শো জন যোগ দিয়েছিলেন এই অনুষ্ঠানে। কোন বছরেই এত বেশী অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী কলেজের ষ্টিমার পার্টিতে যোগদান করেন নি।

শারদীয় অবকাশের কিছুদিন আগে, ১৮ই আগষ্ট, কলেজের আভ্যন্তরিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। শ্রীবিমানবিহারী রায় (২য় বর্ষ বিজ্ঞান) ও শ্রীঅনুপম দাসগুপ্ত (১ম বর্ষ বিজ্ঞান) যথাক্রমে 'ক্যারাম' ও 'দাবা' প্রতিযোগিতায় কলেজের শ্রেষ্ঠ খেলোয়ারের সম্মান লাভ করেন। শ্রীপ্রণব সেন (২য় বর্ষ কলা) ও শ্রীনোহনলাল বর্ম্মা, (৩য় বর্ষ বিজ্ঞান) 'টেবিল টেনিস' প্রতিযোগিতার ফাইনাল উত্তীর্ণ হন। এই প্রতিযোগিতায়, শ্রীমানস মুকুটমণি ও শ্রীঅতীন ভট্টাচার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

এই বিরাম পীঠিকায় দেশে-বিদেশের পত্রিকা পড়ার সুব্যবস্থা আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই পত্রিকাগুলো মনোনয় করবার ভার আমাদের ছাত্র সাধারণের উপর নেই।

কলেজের স্বল্প পরিসর বিশ্রাম কক্ষগুলির যথেষ্ট স্থানাভাবের কথা আমরা অনুভব করছি। কর্তৃপক্ষের বারংবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও কোন ফল হচ্ছে না।

আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পেছনে রয়েছে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীবিমলপতি রায়—সম্পাদক

সমাজ-সেবা সঙ্ঘ ঃ

আজ আমাদের দেশে তথাকথিত সমাজ-সেবকের অভাব না থাক্‌লেও প্রকৃত কর্ম্মীর দুর্ভিক্ষকে কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। তাই আজকের দিনে দেশের পক্ষে প্রয়োজন সুদক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মীর, যারা সেবার আদর্শে অবিচল থেকে কাজ চালাতে সক্ষম। দ্বিতীয় প্রয়োজন সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য্য পরিচালনা করা। অবশ্য এদিকে অর্থেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

আদর্শ ও দাবীর প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে চল্‌তি ব্যবস্থানুযায়ী কতদূর এগোতে পেরেছি দেখা যাক্। এবছরেও আমাদের বিভাগীয় খবর কমিটির সভাপতি ছিলেন হিতৈষী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্ত্তী।

প্রথমে আমাদের কার্য্য আরম্ভ হয় সান্ধ্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। স্থানীয় প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে নিয়মিতভাবে ক্লাস চালান হয়। গরীব ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সকলকেই প্রয়োজনীয় বইপত্র কিনে দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের যথেষ্ট উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও ছাত্র-শিক্ষকদের উৎসাহের অপ্রাচুর্য্য, মাঝে মাঝে হতাশার কারণ হয়েছে। বিদ্যালয়টিকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া United Nation's Information Service-এর সহায়তায় "The Ideal Town"-এর "Library of the Congress" নামক দুইটি শিক্ষামূলক কথাচিত্র কলেজে দেখানো হয়। আমাদের বিভাগের তরফ থেকে সাহাপুরের বাস্তুহারাদের মধ্যে বিতরণ বস্ত্র করা হয়। তাদের দুঃখদুর্দ্দশা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে জানান হয়েছে। কুষ্ঠ নিবারণের জন্য আমরা অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। এ বছর আমাদের সর্ব্বপ্রধান উদ্যোগ সমাজ সেবার

উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলা সফর। শারদীয়া অবকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির জন্য কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তাই অতি অল্পসংখ্যক কর্মী নিয়েই আমাদের কাজে লাগ্‌তে হয়। কর্ম্মীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীদিলীপ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীপুলিন দাস, শ্রীধ্রুব বন্দোপাধ্যায়, শ্রীঅমলেন্দু রায়বর্ম্মণ ও আবুল কামাল। কর্ম্মীদের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে আমরা মাত্র ১২ দিনের মধ্যে জেলার অধিকাংশ থানা এবং অসংখ্য গ্রাম ঘুরে দরিদ্র জনসাধারণের সেবা করতে পেরেছি। আমাদের বিভাগের তরফ থেকে প্রচুর পরিমানে বার্লি, প্যালুড্রিন ও অন্যান্য ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া প্রতিটি গ্রামে ছোটছোট আলোচনা সভার মারফৎ আমরা জনসাধারণকে তাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছি। কর্ম্মের বিচারক হ'তে কর্ম্মীর যদি বাধা না থাকে তাহলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে আমরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করেছি। অবশ্য বাকুড়াজেলা সফরের সময় যে সকল সরকারী ও বেসরকারী লোকের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। বিশেষতঃ আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র বাঁকুড়ার বর্ত্তমান ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত অনাদি বন্দোপাধ্যাকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে আমাদের অকৃতকাজ যা আমাদের কল্পনার বস্তু হয়ে রইল তাঁকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ভার আগামী বছরের উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে বক্তব্য শেষ করেছি।

শ্রীদিলীপ বন্দোপাধ্যায়—সম্পাদক, সমাজ-সেবা সঙ্ঘ।

বিতর্ক-পরিষদ ঃ

বর্তমান বিতর্ক-সম্পাদকের হাতে কার্যভার আসার পর প্রথমেই অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটি বিতর্ক-সভা আলোচনার বিষয় ছিল : "A Call for a Socialist Revolution in India today will be premature."। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবটির স্বপক্ষে বলেন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীকল্যাণ দত্ত, শ্রীসাধন গুপ্ত ও শ্রীঅম্লান দত্ত এবং বিপক্ষে বলেন বর্তমান ছাত্র শ্রীঅনিন্দ্য দত্ত, শ্রীশঙ্কর বসু ও শ্রীশিবেন্দু ঘোষ। বিতর্কান্তে সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

এর অব্যবহিত পরে জলপাইগুড়ি কলেজের উদ্যোগে সেখানে যে আন্তঃকলেজ বিতর্ক আহুত হয় তাতে আমাদের কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীনীলমণি লাহিড়ী।

এর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটি পরীক্ষামূলক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের সিদ্ধান্ত ছিল : "English shouldbe retaisnedas the lingua franca of India"। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুনীতকুমার ইন্দ্র। যোগদানকারীদের মধ্যে শ্রীতরুণ সরকার [স্বপক্ষ-বক্তা] ও শ্রীসন্ধ্যা ঘোষের [বিপক্ষ-বক্তা] বক্তৃতা সবচেয়ে উপভোগ্য হ'য়েছিল।

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে দ্বিতীয় পরীক্ষা-বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক-বিষয় ছিল : "With the achievement of independence the Indian National Congress has outlived its usefulness and should therefore be dissolved"।

এর পরে বাংলা ভাষার মাধ্যমে একটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কলেজের ইতিহাসে বাংলা-ভাষার এ সমাদর সম্ভবত এই প্রথম। প্রস্তাব ছিল : "বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পের প্রচারধর্মী হওয়াই বাঞ্ছনীয়"। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ সরোজকুমার দাস। বিচার-কার্য পরিচালনা করেন ডাঃ দাস, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র। এই বিতর্কের ফলাফলে দু'টি কাপ পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম পারিতোষিক অর্জন করেন শ্রীঅসিত ভট্টাচার্য এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পান শ্রীসুখময় চক্রবর্তী [স্বপক্ষ-বক্তা]। প্রথম বর্ষের ছাত্র

শ্রীসুখময়ের এ কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়। বিতর্কের শেষে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের সুচিন্তিত বক্তৃতাটি বিশেষ উপযোগী হয়।

এর পরে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে একটি বিতর্কের আয়োজন করা হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল: "Intelligent Youth of our age cannot afford to be good as students"। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার। বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপকদের পক্ষে ডাঃ দাস, অধ্যাপক অমিয় মজুমদার ও অধ্যাপক মাহ্‌মুদ এবং ছাত্রদের পক্ষে শ্রীতরুণ সরকার, শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য ও শ্রীশিবেন্দু ঘোষ। বিতর্কের পর অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় ঘোষ একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। তিনি ছাত্রদের এ ধরণের বিতর্ক থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেন। যা হ'ক সভা ভঙ্গের আগে প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

এ বছর য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট-এ আহূত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রীশিবেন্দু ঘোষ ও শ্রীসন্ধ্যা ঘোষ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রতিযোগিতাটিতে প্রেসিডেন্সি কলেজেই প্রথম স্থান অধিকার করে।

এলাহাবাদ য়ুনিভার্সিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতাতেও প্রেসিডেন্সি কলেজ যোগদান করে। প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীতরুণ সরকার ও শ্রীঅনিন্দ্য দত্ত। নিমন্ত্রণকারীরা নাকি আমাদের প্রতিনিধিদের প্রতি বিশেষ অসৌজন্যের পরিচয় দেন।

গত ২৯শে নভেম্বর একটি প্রদর্শনী-বিতর্কের পর এ বছরের বিতর্ক পরিষদের কাজ শেষ হয়। প্রস্তাব ছিল: "Communism cannot solve the problem of freedom." শ্রেষ্ঠ বক্তা তিনজনকে কৃতিত্বসূচক পরিচয়-পত্রে ভূষিত করা হয়। শ্রীসনৎ ভট্টাচার্য [স্বপক্ষ-বক্তা], শ্রীতরুণ সরকার ও শ্রীঅনিন্দ্য দত্ত [বিপক্ষ-বক্তা] সম্মানের অধিকারী হন। বিচার-কার্য পরিচালনা করেন অধ্যাপক ভূপেশ মুখার্জি, অধ্যাপক অমিয় মজুমদার ও অধ্যাপক রমেশ ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

অনিন্দ্য দত্ত—সম্পাদক, বিতর্ক-পরিষদ।

রবীন্দ্র পরিষৎ ঃ

ঐতিহ্যধারাকে সশ্রদ্ধভাবে অব্যাহত রেখে এ' বৎসরের রবীন্দ্র-পরিষৎ তা'র কার্য্যসূচি পরিবেশনা করেছে। কালের পরিবর্ত্তনের সাথে রুচির পরিবর্ত্তন ও প্রকাশভঙ্গীমার নবরূপ গ্রহণ স্বাভাবিক। আমাদের বৎসরের রবীন্দ্র-পরিষৎ প্রশংসা অর্জ্জন করেছে এই পরিবর্ত্তনের সুরধারাকে অনুবর্ত্তন কোরে।

এ বৎসরের রবীন্দ্র-পরিষৎ-এর পরিচালনায় সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠান হয়েছে ২৬শে চৈত্র "বসন্ত-উৎসব"। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—সুগত দাস, অসিত গুহ, আর্য্য মিত্র, বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, দ্যুতীশ দাশগুপ্ত, শঙ্কর বসু, তরুণ সরকার, প্রভাস সেনগুপ্ত, তপতী দাস, ভারতী দাসগুপ্ত, সন্ধ্যা ঘোষ, ভারতী রায়, চিত্রা সেন গীতাঞ্জলী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা তালুকদার, রেখা চালিহা। সংলাপে অংশ গ্রহণ করেন—নিমাই চট্টোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ রায়। পরিবেশনা করেন—শ্রীরথীন্দ্রনাথ রায়, সম্পাদক, রবীন্দ্র-পরিষৎ।

পরিষৎ-এর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান "বৃক্ষ রোপণ" অনুষ্ঠিত হয় ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগষ্ট, ১৯৪৯)। ছাত্রছাত্রীদের মিলিত প্রচেষ্টায়—২২শে শ্রাবণ সকাল বেলা কলেজ প্রান্তর যে পবিত্ররূপ গ্রহণ করে, তা' কেবলমাত্র অভিনব নয়—স্মরণীয়। অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ মহাশয়কে অনুবর্ত্তন কোরে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রছাত্রীগণের কলেজ প্রান্তর পরিক্রমণ-চিত্র সত্যই এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ সূচনা করে। যাত্রাপথে ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতধারা এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির সাহায্য করে। অতঃপর, মূল অনুষ্ঠান "বৃক্ষ-রোপণ"। কলেজ প্রান্তরে এক নারিকেল বৃক্ষ-শিশু রোপণ করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ মহাশয়

এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনোজ্ঞ ভাষায় "বৃক্ষ-রোপন" প্রসঙ্গে কিছু বলেন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—তপতী দাম, সুগত দাস এবং আরও অনেকে।

পরিষৎ-এর তৃতীয় অনুষ্ঠান "বর্ষা-মঙ্গল" অনুষ্ঠিত হয় ৩২শে শ্রাবণ (১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৯)। আর্টস-লাইব্রেরী হলে শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের ভাবগভীর আলোচনার সাথে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ষা-সঙ্গীত পরিবেশনা হৃদয়গ্রাহী হ'য়েছিল। এতে অংশ গ্রহণ করেন—প্রবীর গুহঠাকুরতা, সুগত দাস ও তপতী দাম।

রবীন্দ্র-পরিষৎ-এর চতুর্থ এবং এ বৎসরের শেষ অনুষ্ঠান হয় কবিগুরুর "শেষ-বর্ষণ" ঋতু নাট্য। অনুষ্ঠিত হয় ১৯শে ভাদ্র, ১৩৫৬—য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলে। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—তপতী দাম, শীলা মহলানবীশ, চিত্রা সেন, গীতাঞ্জলী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা ঘোষ, প্রতিমা সেন, প্রবীর গুহঠাকুরতা, সুগত দাস, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতীন্দ্রমোহন নাহা, অসিত গুহ, দ্যুতীশ দাসগুপ্ত, প্রভাস সেনগুপ্ত, বরুণ সেন, পার্থসারথি মিত্র, বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন—শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। সংলাপে অংশ গ্রহণ করেন—নিমাই চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সিংহ, শান্তি মুখোপাধ্যায়। সংলাপ পরিচালনা করেন—ডক্টর শ্রীসরোজ দাস। যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহন করেন—প্রফুল্ল দাস, গীতীশ রায়, সিদ্ধার্থ রায়, এড্‌ওয়ার্ড গুরুগে, নিরঞ্জন ব্যানার্জ্জী,, রামগোপাল দাস, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী,মনোরঞ্জন দাস, কৃষ্ণচন্দ্র বসু। অনুষ্ঠানটি আনন্দবাজার পত্রিকার সাধুবাদ অর্জ্জন করেছিল।

সর্ব্বশেষে শুভব্রত ঘোষ, ফাল্গুনী গাঙ্গুলী, অমল চক্রবর্ত্তী, শঙ্কর বসু, সঞ্জয় দত্ত, অসিত সেন, জগদিন্দ্র ঘটক অসীম চৌধুরী, নির্ম্মলা মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, নাট্য পরিষৎ), দিলীপ ব্যানার্জ্জী [সম্পাদক, সমাজ-সেবা বিভাগ], এবং আরও অনেকের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনুষ্ঠানগুলির মনোরম পরিবেশকে অব্যাহত রাখার দায়িত্ব ভার এঁরাই গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীজয়ন্তপ্রসাদ মৈত্র—সাধারণ সম্পাদক

ভূবিদ্যা পরিষৎ ঃ

একথা সকলেই বিশ্বাস করবেন যে কেবল রাজনীতির দ্বারা দেশে শান্তি, সুখ প্রভৃতি স্থাপিত হতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে চলে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব তো দূরের কথা, বিজ্ঞানের ছাত্রদের নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এই সব কথা ভেবে প্রায় ৪৪শ বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের কয়েকটি ছাত্র বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করেন।

সেই বীজ আজ মহান মহী রূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই ভূ-বিদ্যা পরিষৎ বা জিওলজিক্যাল ইন্‌ষ্টীট্যুট নামে পরিচিত। বলাবাহুল্য যে ইহা ভারতের একমাত্র ছাত্র-প্রতিষ্ঠান যেখানে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা হয়। বিশ্বে ইহা জিওলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুট, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, নামে পরিচিত। এ প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক আমাদের কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নয়।

আমষ্টার্ডামে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক খনি ও ভূবিদ্যা ছাত্র ফেডারেশনে সভায় আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও নানা কারণে আমরা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারিনি। ইউ. এস এ, কানাডা, ইউ. কে., সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের ভূবিদ্যার ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের ভাববিনিময় হয়ে থাকে 'ভূ-বিদ্যা' নামক পত্রিকার মারফৎ, যার একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে গত নভেম্বরের শেষে।

পরিষৎ-এর এই বৎসর মোট ছয়টি অধিবেশন হয়, এদের মধ্যে তিনটি 'সাধারণ' ও তিনটি 'বিশেষ'। 'সাধারণ' অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টার ডাঃ ডব্লিউ, ডি ওয়েষ্ট,

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম্ অয়েল কোম্পানীর মিঃ পি, কে, চ্যাটার্জ্জি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এস, পি, চ্যাটার্জ্জি। বিশেষ অধিবেশনের একটিতে, পরিষৎ-এর সহসভাপতি ডাঃ এ, জি, ঝিন্‌গ্রাম-এর জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার 'দক্ষিণ-বিভাগের' 'প্রধানে'র পদ গ্রহণের জন্য মাদ্রাজ গমনের পূর্বে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়, দ্বিতীয়টিতে, বিখ্যাত পুরা উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ ডাঃ বীরবল সাহনি'র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তৃতীয় অধিবেশনে পরিষৎ-এর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি অধ্যাপক নির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ইউরোপ ভ্রমণের' বিবরণ প্রকাশ করেন

বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠচক্রের অধিবেশন ভালভাবেই চল্‌ছে। পরিষৎ-এর উদ্যোগে তিনটি অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল; বেঙ্গল পটারিস্, বেঙ্গল এনামেল কোং ও বেলুরের ন্যাশনাল আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীতে।

'চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা' নামক কমিটি কলেজের অবসর সময়ে (শুক্রবার) ভূবিদ্যা বিভাগের বক্তৃতাগারে বহু শিক্ষামূলক সবাক চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন।

পরিষৎ-এর বার্ষিক অধিবেশন হয় গত ২৬শে নভেম্বর। প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হ'ন বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর মিঃ জে, কোটস্। এই অধিবেশনে পরিষৎ-এর নতুন কর্মীবৃন্দ নির্ব্বাচিত হয়েছেন। আশা করি তাঁরা ভূবিদ্যা পরিষৎকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন আরও গৌরবের পথে; কামনা করি পরিষৎ-এর উদ্দেশ্য উত্তরোত্তর সফল হয়ে উঠবে।

সমীরকুমার দাস—সম্পাদক

নাট্য-পরিষদ ঃ

শরৎ-এর সুরুতেই আমরা সুরু করেছিলাম আমাদের শারদীয়া নাটকের আয়োজন, বিশেষ কারণে আমরা এবার আধুনিক নাটকের পরিবর্ত্তে ঐতিহাসিক নাটক "আলমগীর" মঞ্চস্থ করতে স্থির করেছিলাম। যাতে নাটকটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সেজন্য আমাদের অনুরোধে বাঙলার অন্যতম নাট্য-পরিচালক শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত বহুদিন এসে আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

অন্যান্য বারের মত এবার য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুটে অভিনয়ের আয়োজন না করে আমরা "শ্রীরঙ্গম" নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন করেছিলাম। কিন্তু সব আয়োজন যখন শেষ হয়েছে, তখন এক অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য (যার সাথে এ নাটকের কোনো সম্পর্ক নেই) নাটকে বন্ধ করে দিতে হয়, হয়তো এখানেই ঘটতো এর পরিসমাপ্তি। কিন্তু কলেজ খোলার পর অধিকাংশ ছাত্রদের আগ্রহাতিশয্যে আবার নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করা হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি কলেজের তরুণ ও নবীন ছাত্র বন্ধুরা দেখিয়ে দিলো যে তারা ভাঙা হাটেও পসার জমাতে পারে। সেদিন শ্রীজয়ন্তপ্রসাদ মৈত্রের অভিনয়ে দর্শকের তাক্ লেগে গেছল। তাছাড়াও শ্রীজগদিন্দু ঘটক সবাইকে তার অভিনয় চাতুর্য্যে প্রাণভরে হাসিয়েছেন। আরো অনেকেই অভিনয়ে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাদের ও সমস্ত ব্যবস্থাপকদের আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আরেকটা কথা বলেই এ পর্যায় শেষ করবো। প্রেসিডেন্সি কলেজে কোনো জলসা বা নাটকের উপযোগী বড় হল নেই। একটি অভিনয়োপযোগী হল তৈরী হ'লে এতে অল্প টাকায় ভালো নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হবে।

আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে যারা আসছেন তাঁদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলছি—"শিবাস্তে সন্তু পন্থাঃ।"

নির্ম্মাল্য মুখোপাধ্যায়—নাট্য-সম্পাদক।

বাংলা পাঠ-গোষ্ঠী ঃ

বিগত বৎসরের কলেজ পত্রিকার মারফৎ পাঠ-গোষ্ঠীর সম্পাদিকা কামনা করেছিলেন ভবিষ্যৎ ছাত্রদের ঐকান্তিক চেষ্টায় যেন তাঁদের স্বপ্ন সফল হয়। এ বৎসরের পত্রিকার মাধ্যমে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কলেজে বাংলা পাঠ-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করে আমরা তাঁদের স্বপ্ন সার্থক করতে পেরেছি।

সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের পাঠ-গোষ্ঠীর উদ্বোধন হয়েছে গত ৩২শে আষাঢ় [ইং ১৬ই জুলাই '৪৯] তারিখে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ মহাশয়। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকবৃন্দের উপস্থিতিতে গাম্ভর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পাঠ-গোষ্ঠীর প্রথম অধিবেশন হয় ২৭শে শ্রাবণ [ইং ১২ই আগষ্ট, '৪৯] তারিখে। সভাপতিত্ব করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-প্রধান শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ইংরেজী বিভাগের বিদায়ী-অধ্যাপক প্রধান শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র মহাশয়। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বাংলা বিভাগের ছাত্র শ্রীসুধীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায় "পুরাতন ভারত ও আধুনিকজগৎ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ছাত্রদের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা এবং সভাপতি মহাশয়ের বিদগ্ধ অভিভাষণ অধিবেশনটিকে সজীব এবং হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছিল।

আমাদের পাঠ-গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুদের নিকট থেকে যেভাবে উৎসাহ এবং সহায়তা লাভ করেছি সেজন্য তাঁরা প্রত্যেকে আমাদের প্রশংসাভাজন এবং ধন্যবাদার্হ।

সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে আমরা প্রায় এক শত বই পেয়েছি পাঠ-গোষ্ঠীতে ব্যবহারের জন্য। এ ছাড়া পাঠ-গোষ্ঠীর জন্য—মূলত অধ্যাপকপ্রধান শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী মহাশয়ের চেষ্টায়—সম্প্রতি পাঁচশত টাকার বই কেনা হয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি সেটুকু হয়ত খুব সন্তোষজনক নয়। এর কৈফিয়ৎ হিসেবে গত বৎসরের সম্পাদিকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে এই আশাই করব যে আমাদের অকৃত কাজ, অকথিত বাণী, অগীত গান আমাদের উত্তরাধিকারীদের হাতে সফলতা ও সার্থকতা অর্জন করুক।

পুলিনবিহারী দশ—সম্পাদক

অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠী ঃ

এবছর এপর্যন্ত অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠীর একবার মাত্র বৈঠক বসেছে। বৈঠকে শ্রীঅশোকমোহণ রায় একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধপাঠকের পর কিছুক্ষণ সোৎসাহে আলোচনা চলে। সভাপতি ডক্টর যোগীশচন্দ্র সিংহের একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর বৈঠকের কাজ শেষ হয়।

গত বছরের সম্পাদকের কাছে কাজের ভার নেবার সময় শুনতে পাই অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠীর একটি নিজস্ব লাইব্রেরী আছে। আলমারী খুলে তিনি যা দেখালেন তাকে লাইব্রেরী বলা চলে না। গুটিকতক বইয়ের এই 'সমাহার'টিকে সারা বছরে বাড়ানো যায় নি। বরং কিছু কমেছে। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করি।

অনিন্দ্য দত্ত—সম্পাদক, অর্থনীতি পাঠগোষ্ঠী।

রাজনীতি পাঠগোষ্ঠী :

পূর্ব্ববর্তী সম্পাদক রাজনীতি পাঠগোষ্ঠীর অস্তিত্বের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে গভীর সমস্যার ইঙ্গিত আমাদের দিয়েছিলেন, তার সম্পূর্ণ সমাধান এখনও হয়নি। তবুও আশার কথা এই যে, পাঠগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বই পড়া এবং আলোচনা করা সম্বন্ধে উৎসাহের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য ছাত্র সংখ্যার তুলনায় বইএর সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। সেরা নতুন-বইগুলি আমাদের আলমারীতে এখনও জায়গা খুঁজে পায়নি।

অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থার দরুণ আমাদের রাজনীতি বিষয়টির পড়াশুনায় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটেছে এই কারনেই "অবহেলিত রাজনীতির"র আলোচনায় ছাত্রদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এপর্য্যন্ত একটির বেশী আলোচনা সভার আয়োজন করা সম্ভবপর হয়নি। পাঠগোষ্ঠীর সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায়, নির্ধারিত বিষয়টির ["Nationalism as a Political ideology is a menace to civilisation"]ওপর আলোচনা ও প্রত্যালোচনা বিশেষ উৎসাহজনক হয়েছিল।

আবুল কামাল—সম্পাদক, রাজনীতি পাঠগোষ্ঠী।

ইতিহাস সেমিনার ঃ

অন্যান্য বছরের অনুপাতে এবারের আমাদের অধিবেশনের সংখ্যা কিছু বেশি হয়। আমাদের বিশেষ ও সাধারণ অধিবেশনগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

সাধারণ অধিবেশনের বক্তা ও বিষয় ঃ [১] শ্রীশিপ্রা সরকার ঃ ইতিহাসে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ঃ ২৬ মার্চ; [২] শ্রীজহীরুদ্দীন আহমদ ঃ ভারতীয়-সভ্যতার উপর গ্রীক প্রভাব ২২ জুলাই; [৩] শ্রীকমলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঃ মৌর্য-সাম্রাজ্যের পতনে অশোকের দায়িত্ব ১২ আগষ্ট; [৪] শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় ঃ আকবরের 'সম্রাট সিদ্ধান্তের' দাবী ২৬ আগষ্ট।

বিশেষ অধিবেশন ঃ [১] ডক্টর চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত ঃ ভারতীয় ভাস্কর্যে বুদ্ধমূর্ত্তি [চিত্র সহযোগে] ১ এপ্রিল; [২] অধ্যাপক আবদুল ওয়াহাব মাহমুদ ঃ ইতিহাসে ক্যাথলিক চার্চ্চের ভূমিকা, ২ সেপ্টেম্বর।

প্রায় সব কটি অধিবেশনেই শ্রোতা-সমাগম ৫০ এর কাছাকাছি হয়েছিল এবং অন্যান্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত উপস্থিত থেকে আলোচনা-প্রত্যালোচনায় যোগদান করেন। সেমিনার-লাইব্রেরীর জন্য এবার সরকারী তহবিল থেকে তিন-শ' টাকা পাওয়া গেছে, তা থেকে সেমিনারের নিজস্ব পঁচিশখানি বই কেনা হয়েছে। অপ্রত্যাশিত নানা বিঘ্নের জন্য আমাদের পূর্ব্বকল্পিত কর্ম্মসূচী কিছু কিছু অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আশা করছি ভবিষ্যতে সেগুলি সম্পন্ন করতে পারব। পরিশেষে যাঁরা আমাদের অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত থেকে আলোচনা-প্রত্যালোচনায় অংশ গ্রহণ করে ইতিহাস-সেমিনারকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শিপ্রা সরকার—সম্পাদক, ইতিহাস সেমিনার।

দর্শন সেমিনার ঃ

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেক দর্শন সেমিনায়ের সেক্রেটারীই এই পত্রিকা মারফৎ জানিয়ে এসেছেন তাদেরই দুর্গতি ও অভাবের কথা। আজ সেই চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী আপনাদের আর আমাদের সেমিনারের দুঃখের খবর শুনতে হবে না। আজ আনন্দের কথা কতগুলো শোনাই। পয়লা নম্বর যেটা জানানো দরকার যে, আমাদের সেমিনারের চারটি প্রবেশ পথ, না দুটো প্রবেশ পথ [আর দুটো বাইরে যাবার পথ?] যাই হোক, সেই চারটি দরজাতেই লাল টুকটুকে পর্দা টাঙ্গানো হয়েছে। দু নম্বর, আমাদের সেমিনারের ছবিগুলো আজ ঝক্‌ঝক্ করছে এমন কি ফ্রেমগুলো পর্যন্তে পালিশ করা হয়েছে। তিন নম্বর সব মিলিয়ে মাত্র ছ'টা মাত্র বৈঠক হয়েছিল এবার। প্রথমে বলেছিলেন, শ্রীবসন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। কিন্তু খুব বেশী ছেলে হয় নি, কারণ সেদিনকার বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল "উপনিষদে ব্রহ্মবাদ।" এরপর বলেছিলেন উপানন্দ ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর বসু, দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবাস গৌস্বামী—স্থানাভাবে তাঁদের কথাগুলি ফেনিয়ে বলা গেলনা।

ডাঃ সরোজকুমার দাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আমাদের এবং সেমিনারের প্রতি তাঁর অকাতর ভালবাসার জন্যেই দর্শন সেমিনার আজ বেড়ে উঠছে চারদিক দিয়ে।

অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাদের সেমিনারের কাজ সম্বন্ধে অনেক সময় উপদেশ দিয়েছেন। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক অমিয় মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকেও আমরা অদ্ভুত রকমের সাড়া পেয়েছি। জানিনা ভবিষ্যতের ছেলেদের ভাগ্যে এঁরা থাকবেন কি না। শঙ্করকুমার বসু—সেক্রেটারী, দর্শন সেমিনার।

খেলাধূলা বিভাগ ঃ

১৯৪৯-৫০ সালের জন্য নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ

সভাপতি—অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় ঘোষ; সহঃ সভাপতি—অধ্যাপক যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত; শ্রীযুক্ত এন, এন চ্যাটার্জি।

সাধারণ সম্পাদক ঃ শ্রীদিলীপ দত্ত [চতুর্থ বর্ষ কলা], ক্রিকেট ঃ শ্রীতরুণ বোস [তৃতীয় বর্ষ কলা], টেনিস ঃ শ্রীঅমল সেন [তৃতীয় বর্ষ কলা], হকি ঃ শ্রীঅশোকমোহন রায় [চতুর্থ বর্ষ কলা], ফুটবল ঃ শ্রীধ্রুব ব্যানার্জি [চতুর্থ বর্ষ কলা], নৌ-চালনা ঃ সূর্য চ্যাটার্জি [দ্বিতীয় বর্ষ], আভ্যন্তরীন ক্রীড়া; শ্রীতুহিনা ঘোষ [তৃতীয় বর্ষ বিজ্ঞান]।

১৯৪৮-৪৯ সালের কার্য বিবরণী

ফুটবল ঃ ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক—অধ্যাপক জে, সি, সেনগুপ্ত, সম্পাদক—শ্রীপূর্ণব্রত রায়চৌধুরী [চতুর্থ বর্ষ বিজ্ঞান]

PRESIDENCY COLLEGE HOCKEY TEAM— 1949

Inter-Collegiate Hockey League Champions

&

Winners :— Dr. S. Das Gupta Cup. (Inter-Collegiate Knock-out)

From Left to Right.

Front Row :— Somen Dutt, Naren Basak (Hockey Secy.), Prof. N. G. Chakravarty (Sectional President), Principal J. Ghose, Sri N. N. Chatterji (Physical Instructor), Punyabrata Roy Choudhury (Captain), Ashis K. Chakravarty.

Middle Row :— Amal K. Chakravarty, Bhabatosh Mukherji, Mulk Raj Sikka, Asoke Ray, Gopal Singh, Mahendra Singh, Benoy Singh.

Back Row :— Srikanta & Narsingh (Bearers).

PRESIDENCY COLLEGE HOCKEY TEAM— 1949

Inter-Collegiate Hockey League Champions

&

Winners :— Dr. S. Das Gupta Cup. (Inter-Collegiate [illegible]

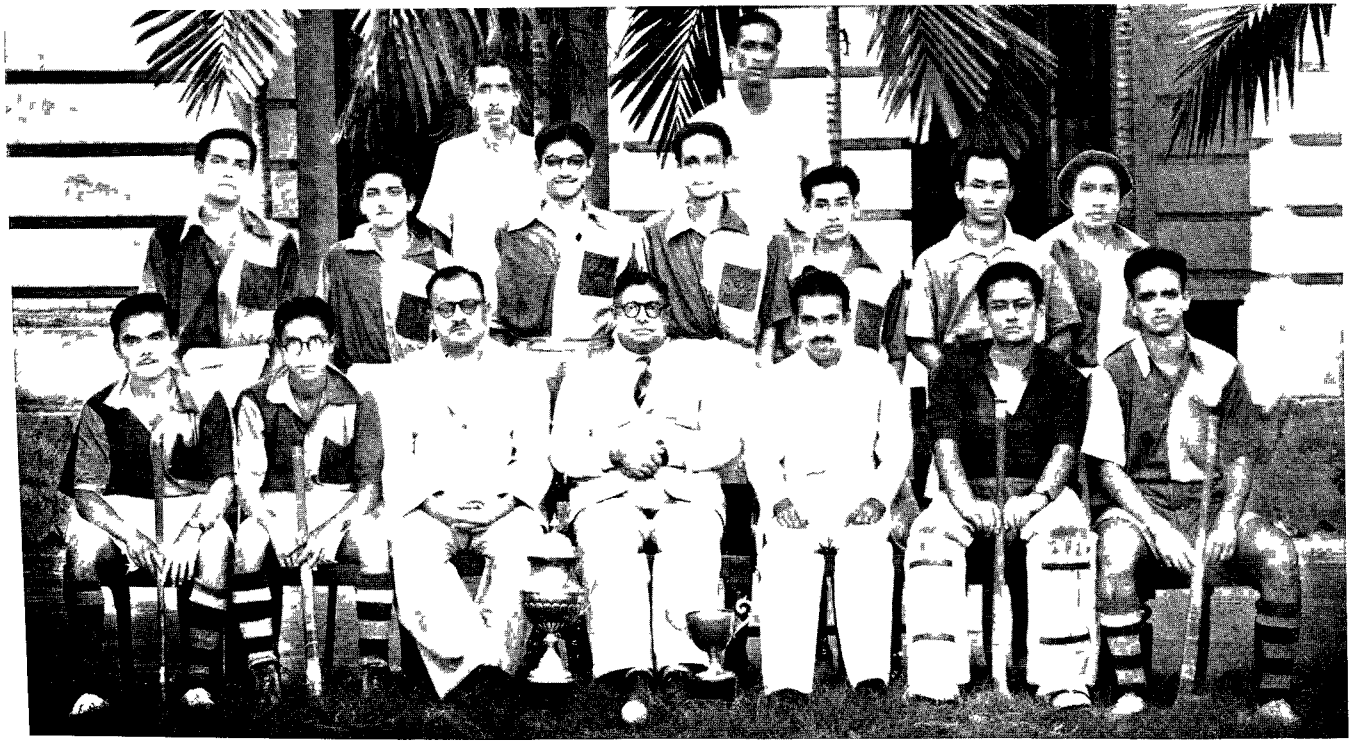

From Left to Right

Front Row .— Somen Dutt, Naren Basak (Hockey Secy), Prof N G. Chakravarty (Sectional President) Principal J Ghose Sri N N Chatterji (Physical Instructor), Punyabrata Roy Choudhury (Captain) Ashis K Chakravarty

Middle Row .— Amal K Chakravarty, Bhabatosh Mukherji Mulk Raj Sikka, Asoke Ray Gopal Singh, Mahendra Singh Benoy Singh

Back Row .— Srikanta & Narsingh (Bearers)

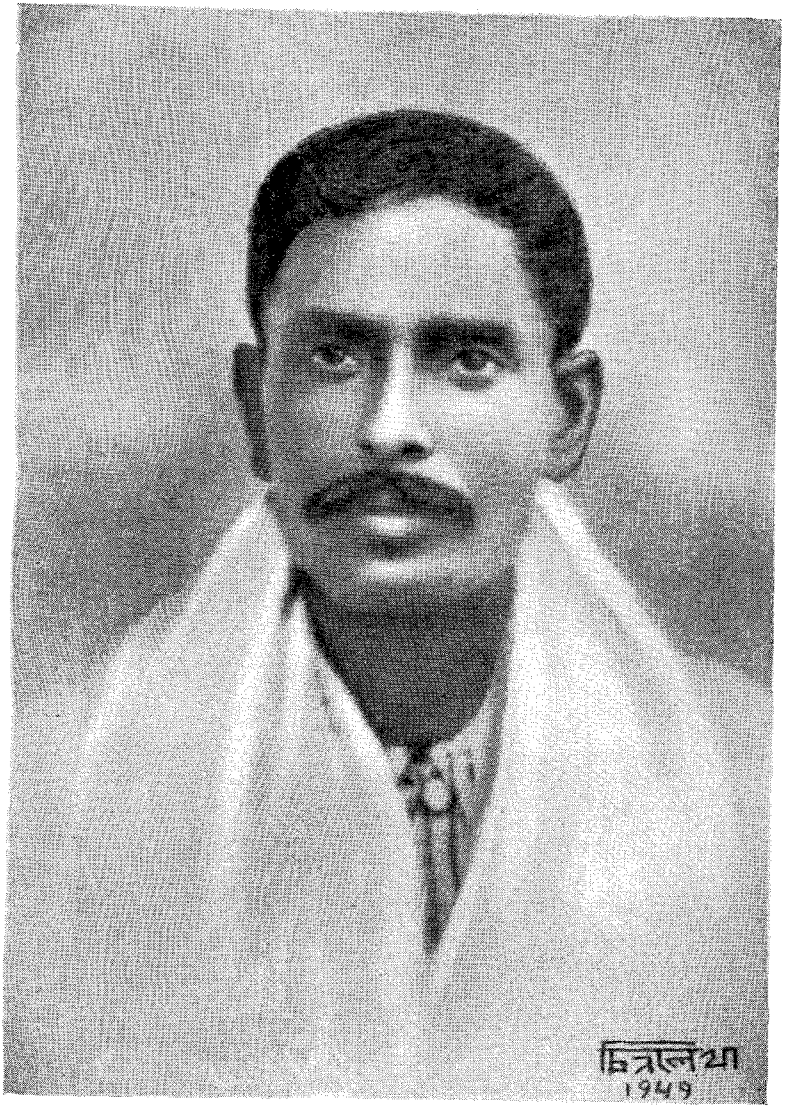

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আবির্ভাব :
১৮৮৫ সালের ১৫ই জুন।

তিরোভাব :
১৯৪৯ সালের ১৮ই আগষ্ট।

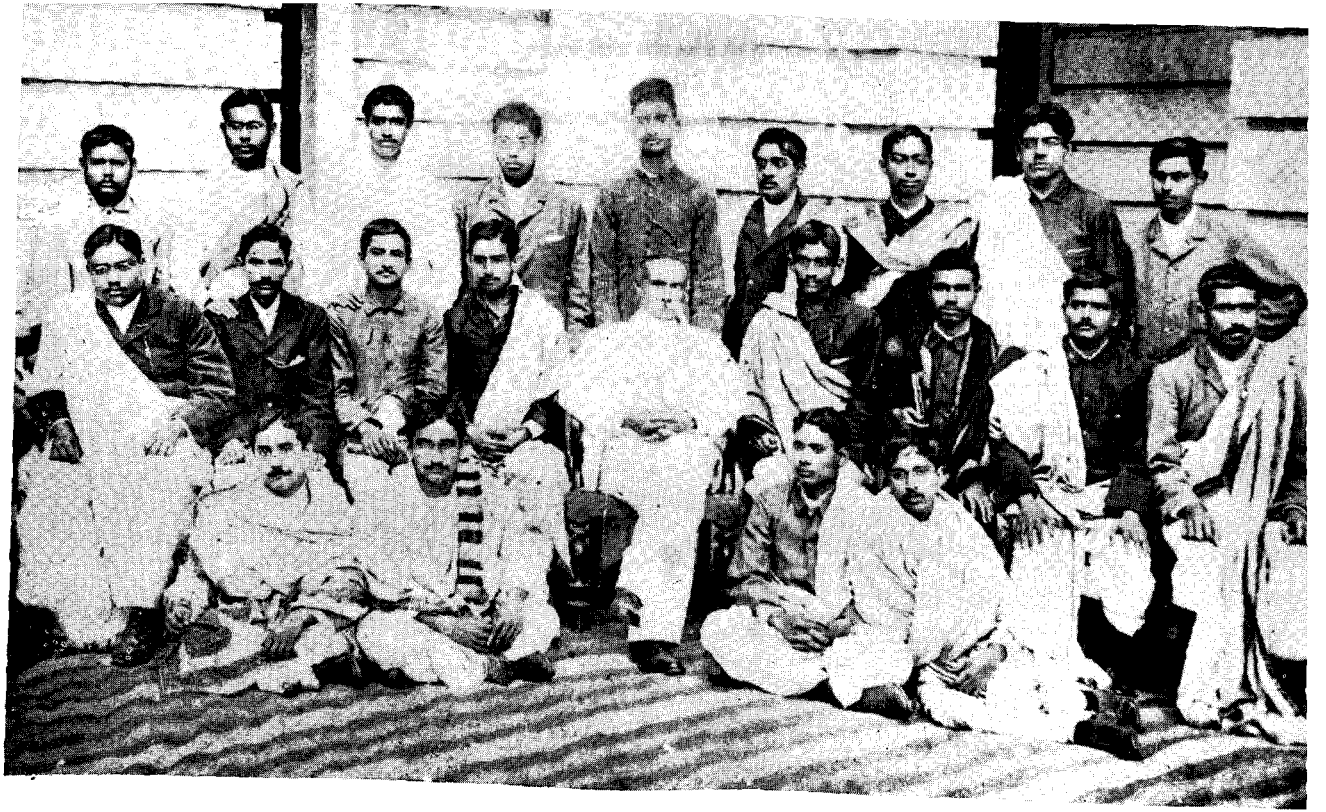

ছাত্রাবস্থায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ

[ছবিখানি আমাদের কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র এবং ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ছবিখানি ১৯০৬-৭ সালে গৃহীত। মধ্যস্থলে তৎকালীন ইংরেজি সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক পার্সিভ্যাল সাহেব উপবিষ্ট। তাঁর ঠিক পিছনেই শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ দণ্ডায়মান। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেনকে ঐ সারির প্রথমেই (বাঁ দিক থেকে) দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য সমপাঠীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে নানাদিকে বিখ্যাত হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ প্রথম সারিতে দ্বিতীয় স্থান উপবিষ্ট হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।]

COLLEGE UNION COUNCIL

SESSION 1948-49

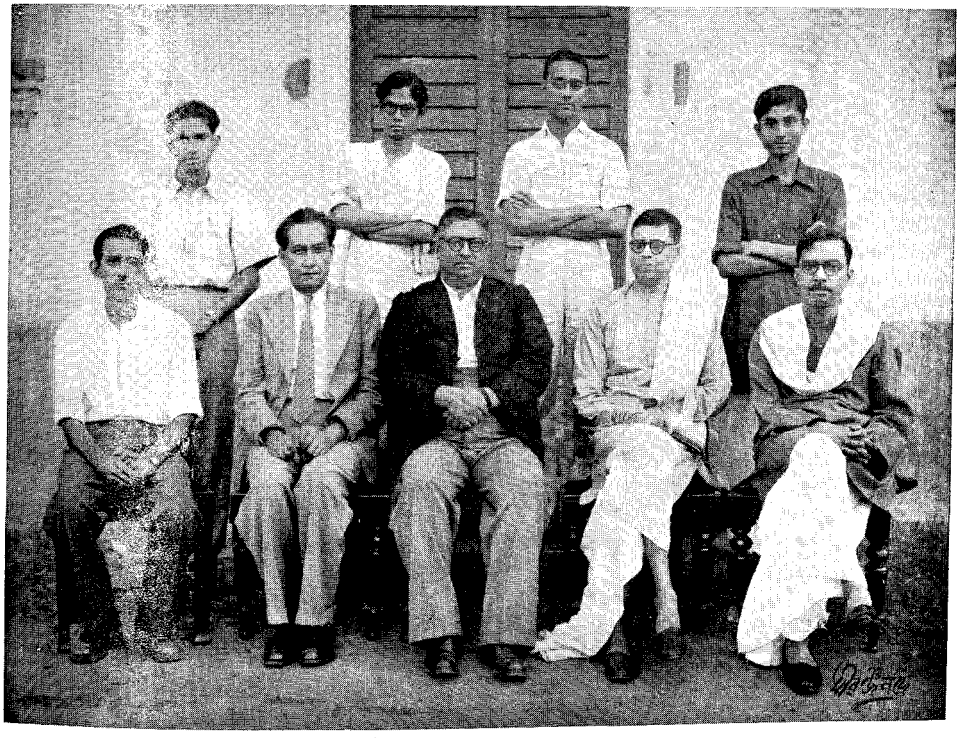

Sitting (*left to right*) :— Jayanta Maitra (Genl. Secy., College Union Council), Prof. S. Sarkar, Principal J. Ghose, Prof. J. Chakrabarty (Chairman, Social-Service League), Prof. S. C Sen Gupta. (Chairman Publication Section).

Standing (left to right) :— B. Ray (Junior Common-room Secy.), A. Dutta (Debate Secy.), N. Mukherji (Drama Secy.), D. Banerji (Social-Service Secy.)

SOCIAL SERVICE LEAGUE

SESSION 1948-49

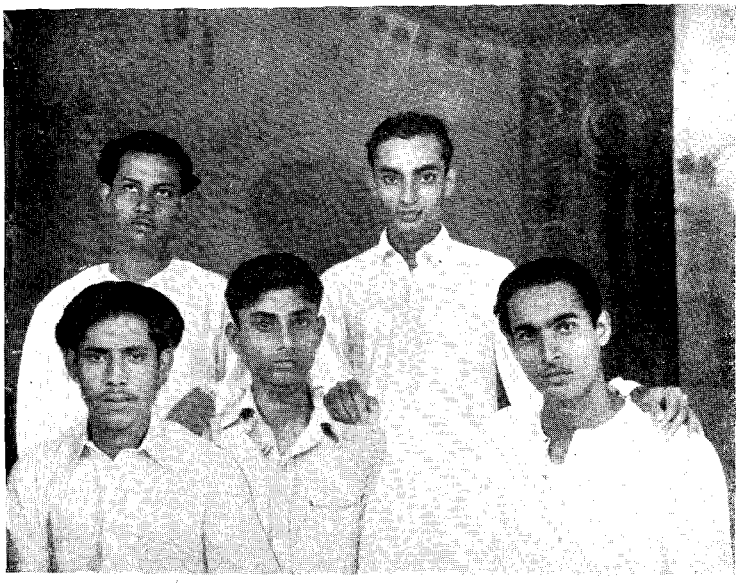

Sitting (L. to R.)— Abul Kamal, Dilip Banerji (Social Service Secy.), and Dhruba Banerji.
Standing(L. to R.)— Pulin Das and Amalendu Barman.

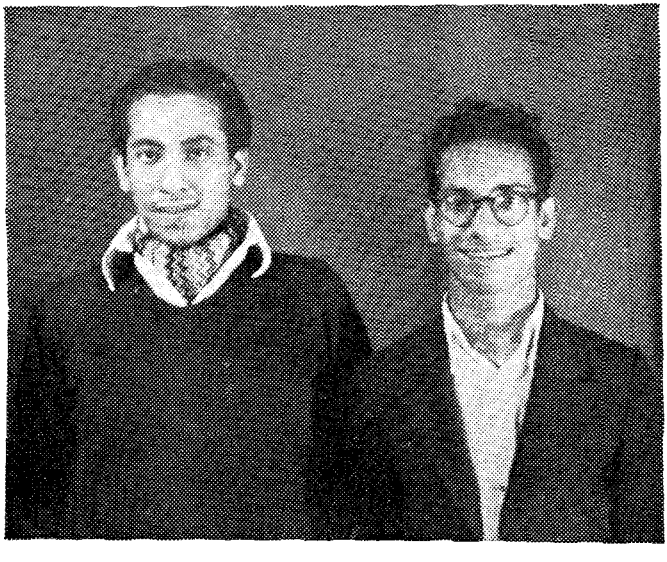

THEY MET THE BRITISH DEBATING TEAM

SHIBENDU GHOSH (Left)—6th Year Arts (Old)—at Calcutta.
NILMANI LAHIRI (Right)—4th Year Arts—at Jalpaiguri.

PRESIDENCY COLLEGE ATHLETIC COMMITTEE

SESSION 1948-49

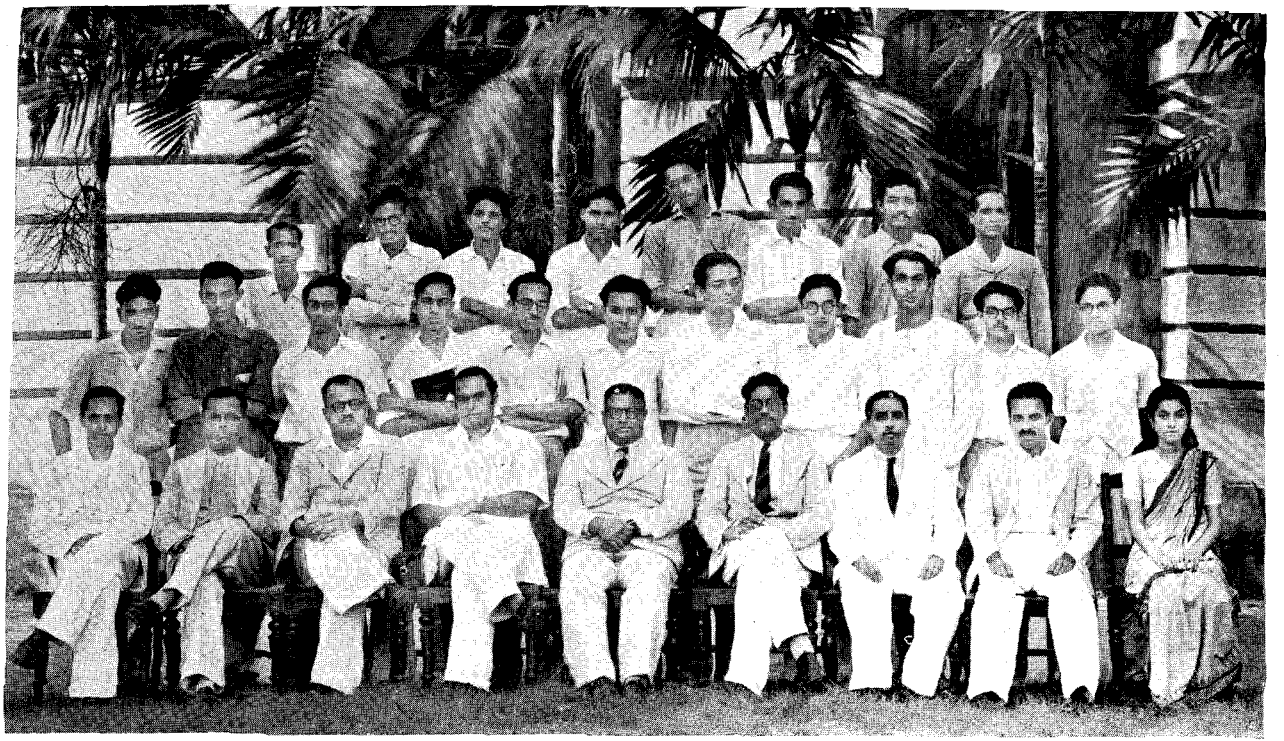

Left to Right.

Front Row :— Prof. S. Roy, Prof. S. K. Indra, Prof. N. G. Chakravarty, Prof. J. C. Sengupta, Principal J. Ghose, Prof. N. K. Sen, Prof. B. C. Das, Sri N. N. Chaterji (Physical Instructor), Sm. Bharati Roy (Secy. Small Area Games).

Middle Row :— K. K. Sehgal, B. Bhadury, A. Rahim, P. Gupta, A. Guha (Cricket Secy.), A. Roy (Tennis Secy.), P. Roy Choudhury (Genl. Secy. & Foot ball Secy.), N. Basak (Hockey Secy.), D. Banerji, K. De S. Basu.

Back Row :— Srikanta (Bearer), R. N. Pandit, B. Mukherji, B. Ray, A. Mazumdar, J. Maitra T. Maitra, Narsingh (Bearer).

SIR JEHANGIR COYAJEE

(1875 - 1943)

PROFESSOR : BENOY KUMAR SARKAR

Born : at Malda
26th December, 1887

Died : in Washington
24th November, 1949

FAREWELL GATHERING

at the retirement of PROF. SOMNATH MAITRA as Head of the Department of English, September 3, 1949.

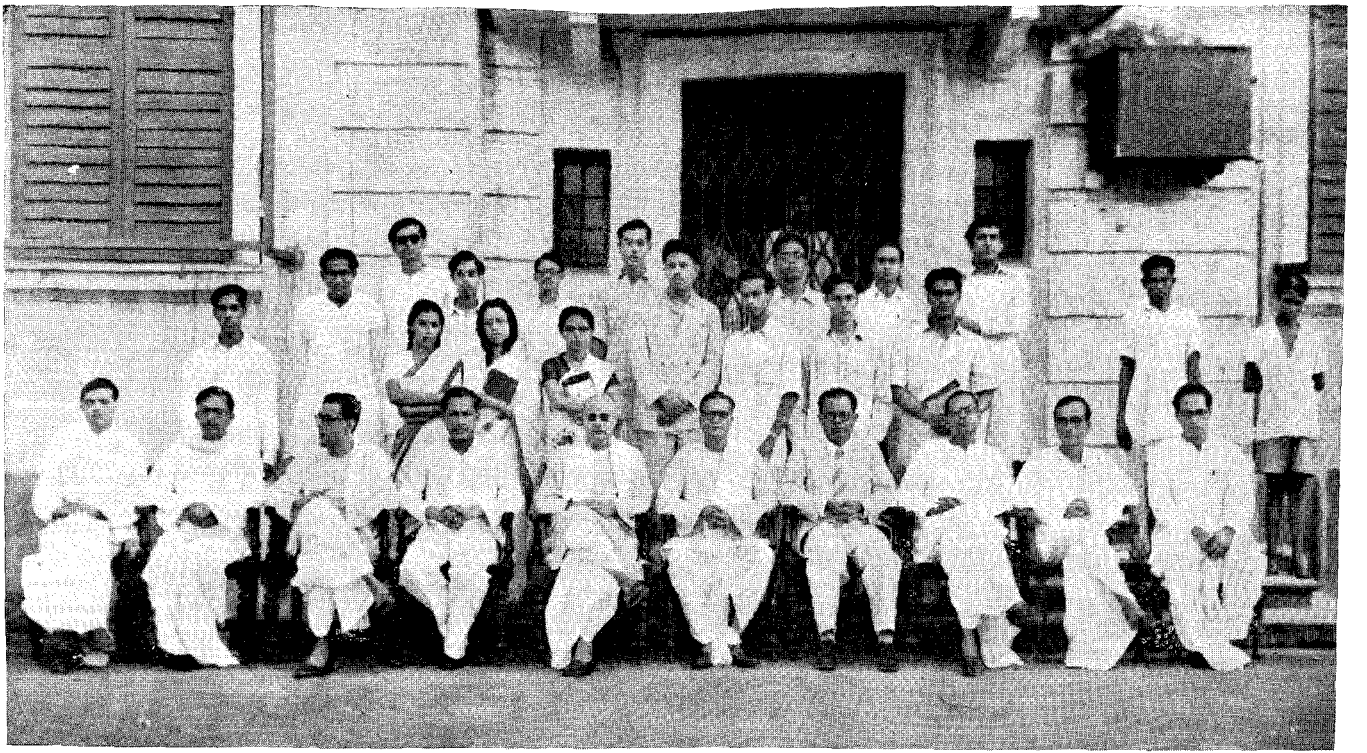

Row I (Sitting) L. to R : Prof. G. N. Bhattacharya, Dr. S. C. Sen Gupta, Prof. T. N. Sen, S. C. Sarkar, S. N. Maitra, T. P. Mukherji, S. K. *Indra*, K. P. *Das Gupta*, P. *Bagchi*, D. *Sen*.

Row II (Standing) L. to R : Sm. C. Saha, A De, L. Bose, Sj. S. Bhattacharya, K. Poddar, R. Ray, S. Bhattacharya.

Row III (Standing) L. to R : Sj. S. Gupta, A Das Gupta, D Lahiri Choudhury, D. Mustaphi, J. Bhattacharya, S. Sen, K. Bose, S. Mukherji, T. Sircar.

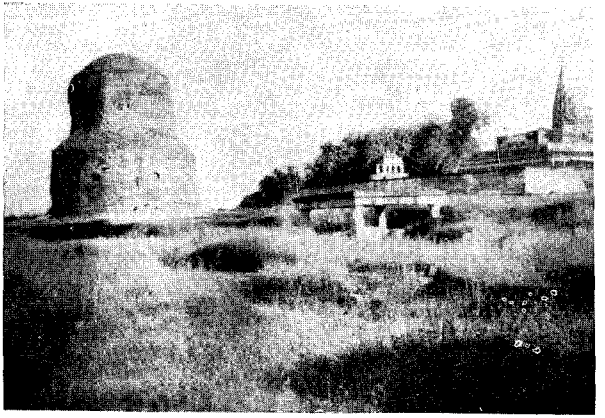

"সমাধিমন্দির এক ঠাঁই রহে চিরস্থির"

আলোক শিল্পী—
শ্রীনির্মাল্য মুখোপাধ্যায়
(চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)

".....উত্তর-জোড়া তুষার-চূড়ায় খেয়ালী বিকেল
আগুন ছড়ায়।"
(বুদ্ধদেব বসু)

PRESIDENCY COLLEGE ATHLETIC COMMITTEE

SESSION 1948-49

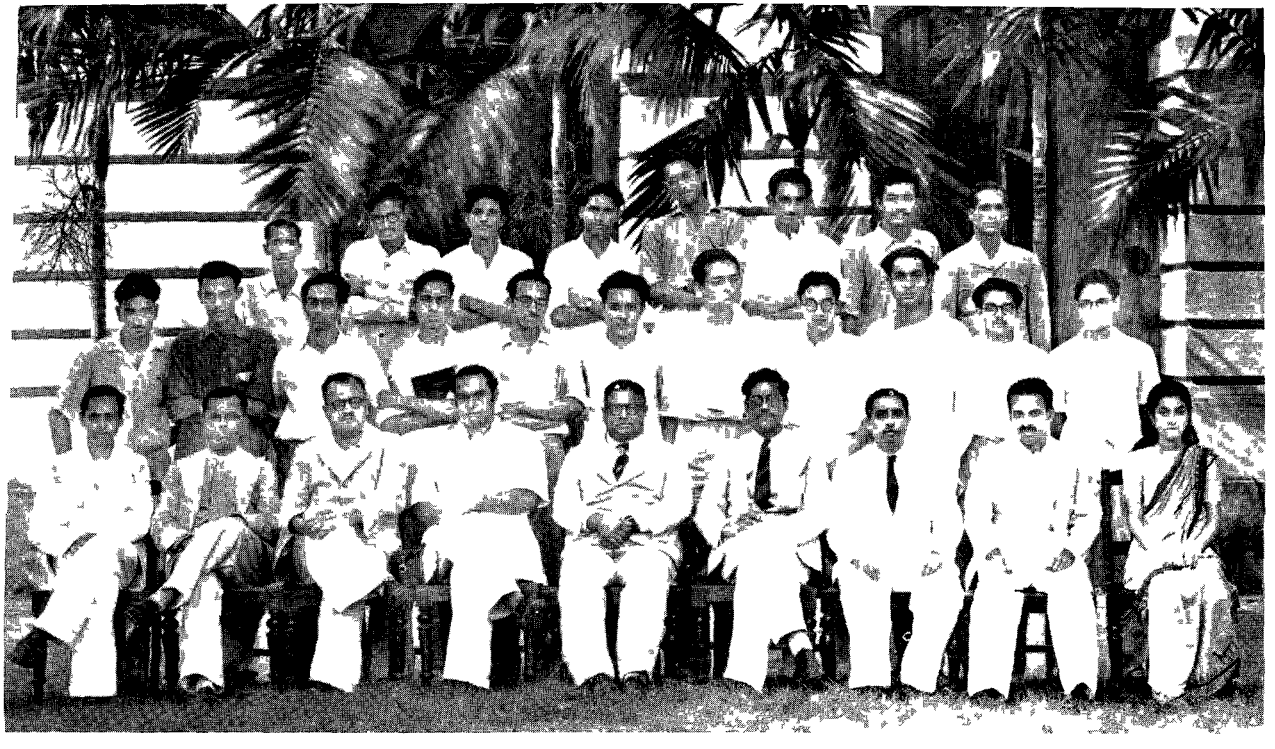

Left to Right

Front Row :— Prof S Roy, Prof S K Indra, Prof N. G Chakravarty, Prof. J C Sengupta Principal J Ghose, Prof N. K Sen, Prof B C Das, Sri N. N Chaterji (Physical Instructor), Sm Bharati Roy (Secy Small Area Games)

Middle Row — K K Sehgal, B Bhadury, A Rahim, P Gupta, A Guha (Cricket Secy), A Roy (Tennis Secy), P Roy Choudhury (Genl Secy & Foot ball Secy) N Basak (Hockey Secy) D Banerji K De S Basu

Back Row — Srikanta (Bearer) R N Pandit B Mukherji B Ray A Mazumdar J Maitra T Maha Narsingh (Bearer)

এবারে আমরা প্রত্যেকটি প্রীতি ফুটবল খেলায় জয়লাভ করেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লীগে আমরা আমাদের গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। হেরম্ব মৈত্র শীল্ডে এবং ইলিয়ট শীল্ডে আমাদের কলেজ চতুর্থ রাউণ্ডে পরাজিত হয়। অধ্যক্ষ বি, এম, সেন চ্যালেঞ্জ কাপ [আন্তঃশ্রেণী প্রতিযোগিতা] এ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা কয়েকটি সৌহার্দ্য-মূলক ক্রীড়ার ব্যবস্থা করে—তার মধ্যে, অর্থনীতি ও ইংরাজীর সম্মিলিত দলের [অধিনায়ক, শুভব্রত ঘোষ] সঙ্গে, ইতিহাস ও বাংলার সম্মিলিত দলের [অধিনায়ক, আর্য্য মিত্র] দুইটি খেলা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

ক্রিকেট : ৭টি প্রীতিমূলক খেলার মাত্র একটিতে পরাজিত হই। আন্তঃ কলেজীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সেমি ফাইনালে আশুতোষ কলেজ দল আমাদের পরাজিত করে।

কলেজ প্রতিষ্ঠা সপ্তাহে প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রদের একটি প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা বিশেষ আকর্ষনীয় হয়েছিল।

আমরা আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রীগোবিন্দ রায় এবং শ্রীরেবতী মুখার্জি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ সমর্থন করেন।

বাচ খেলা : এবার ১৩ জন ছাত্র বাব খেলার বিভাগে সদস্য ছিলেন। শ্রীঅজিত সেন "জুনিয়ার স্কালস"এ ফাইনালে উন্নীত হন।

টেনিস : এবছর আমরা আমাদের পূর্ববর্তী জায়গায় টেনিসলন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। ৭টি প্রীতিমূলক খেলার মধ্যে মাত্র একটিতে আমরা পরাজিত হয়েছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃকলেজীয় টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ দল আমাদের পরাজিত করে। কলেজ প্রতিষ্ঠা সপ্তাহে একটি প্রদর্শনী টেনিস খেলার আয়োজন করা হয়। অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক এ, ডব্লিউ মামুদ, অধ্যাপক বি, সি, মুখার্জি, শ্রীনলিনী মজুমদার, শ্রীঅমিত মুখার্জি। কলেজ সিঙ্গলস্ প্রতিযোগিতায় অধ্যাপক এ, ডবলিউ মামুদ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর শ্রীনলিনী মজুমদারের কাছে পরাজিত হন।

ভলিবল ; বহু সংখ্যক ছাত্র নিয়মিতভাবে অনুশীলনে যোগদান করেন। আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, যদিও বিজয়ী হবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

ব্যাডমিণ্টন : মেয়েদের জন্য এই প্রথম এ বছর ব্যাডমিণ্টন খেলার আয়োজন করা হয়। শ্রীমতি রেখা চলিহা সিঙ্গেলসে বিজয়ী হন এবং শ্রীমতি সন্ধ্যা ঘোষের সহযোগিতায় ডবল্‌সেও জয়লাভ করেন। সেইদিন একটি প্রদর্শনী খেলায় অধ্যক্ষ জে, ঘোষ ও অধ্যাপক বি, দাস, ডবলস বিজয়ী শ্রীমতি রেখা বলিহা ও শ্রীমতি সন্ধ্যা ঘোষের নিকট পরাজয় বরন করেন।

হকি : হকি খেলায় আমাদের কলেজ এ বছর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লীগ এবং নক্ আউ দুইটিতে বিজয়ী হয়েছি। নক্ আউট প্রতিযোগিতাটিতে এই প্রথম আমাদের কলেজ বিজয়ী হল। এ বছর একটি খেলাতেও পরাজিত হইনি এবং একটি খেলাও ড্র হয়নি। মোট তেরটি খেলায় আমাদের বিপক্ষে গোল হয়েছিল মাত্র তিনটি।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা : ১৭ই জানুয়ারী আমাদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত বি, এম, সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীযুক্তা বি, এম, সেন। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপের জন্য এ বছর বেশ জোর প্রতিযোগীতা হয়। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীবিনয় সিং এই গৌরব অর্জন করেন। তিনি গোলা ছোঁড়া এবং জেভিলিন ছোঁড়ায় কলেজের দুটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। আন্তঃকলেজীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজের শ্রীবিনয় সিং তিনটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, সেণ্ট জেভিয়র্স কলেজের এ, এস ডিসিলভার সংগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছেন। আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সময় শ্রীনরেন বসাক এবং শ্রীবিনয় সিংকে যথাক্রমে ক্রিকেট এবং হকি "ব্লু" দেওয়া হয়।

ব্যায়ামাগার : গড়পড়তায় প্রায় তিরিশ জন ছাত্র ব্যায়ামগারে নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করেন।

খেলাধূলার সরঞ্জামাদির দাম অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় যে অর্থ আমরা পাই তাতে আমাদের প্রয়োজন মেটে না। আমার অনুরোধ যে বার্ষিক দান এক হাজার টাকাকে দুই হাজার টাকা এবং ছাত্রদের চাঁদার হার বাড়িয়ে পাঁচ টাকা করা হোক। প্রস্তাবটি এ্যাথলেটিক কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। ক্রীড়াবিভাগে অধিক স্বচ্ছলতা এলে এই বিভাগটির যে উন্নতি হবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

খেলাধূলা বিভাগের পরিচালনার ব্যাপারে সব সময়েই সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন আমাদের ব্যায়াম শিক্ষক শ্রীযুক্ত এন, এন চাটার্জ্জি। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সংগে ধন্যবাদ জানাই বিভাগীয় সম্পাদকদের যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের বিভাগ পরিচালনায়।

পুণ্যব্রত রায় চৌধুরী—সাধারণ সম্পাদক।

সম্পাদকীয়

নয়া শাসনতন্ত্র

প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটা পূর্ণাংগ শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের এইটেই হ'ল গোড়ার কথা। কারণ সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও এ কথা ঠিক যে কোন দেশের রাষ্ট্ররূপের প্রতিফলন হয় তার শাসনতন্ত্রে। গত দু'শ বছর ধরেই সভ্যজগতের শাসনতন্ত্রগুলি একটা বিরাট পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এদের বিবর্তন যুগাবর্তের উৎকণ্ঠিত লক্ষণগুলির আবেদনে সাড়া দিয়েছে। এই বিবর্তনের ইতিহাসে যে ধারণাটার বার বার সমর্থন পাওয়া গেছে সেটি এই: রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন এবং সামাজিক কল্যাণ এ দুয়ের মধ্যে যদি কোন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সম্বন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া যায় তবে হয়ত 'গণতান্ত্রিক' শাসন-ব্যবস্থার আরও কিছু দেবার আছে, হয়তো এর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এখনও নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বিশ শতকের প্রথম অর্ধে গণতন্ত্র-বিরোধী অনেক শাসনতন্ত্রই আশ্চর্য প্রচার এবং প্রসার লাভ করেছে—কিন্তু এদের কোনটিই এখনো প্রাথমিক পরীক্ষার স্তর পার হয়নি। বর্তমানে কিন্তু গণতন্ত্র কথাটির প্রয়োগের মধ্যে একটা নূতন অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে—যে অর্থে কি আঠারো কি উনিশ এমন কি বিশ শতকের প্রথমদিকেও এর প্রয়োগ চিন্তা করা যায় নি। আজকের দিনের গণতন্ত্র মধ্যযুগ-শোভন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়ে শাসনতন্ত্রের অর্থনৈতিক রূপটিকেই আসল বলে মেনে নিয়েছে। তাই আজকের দিনের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যেমন একটা বলিষ্ঠ সমাজ-চেতনা রূপ পেয়েছে তেমনি সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে আদর্শ, যে নীতি, তার মূলমন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে স্বার্থবুদ্ধি আর বিভেদ-জ্ঞান নয়, তার মূলমন্ত্র সামাজিক শুভবুদ্ধি এবং সার্বজনীন কল্যাণ।

রাষ্ট্রচিন্তার এই ধারাকে অনুবর্তন করে ভারতের নয়া শাসনতন্ত্রের প্রণয়ন যেন এক নূতন জীবনের পথ নির্দেশ করছে। সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী আর সামাজিক ও আর্থিক ন্যায়নিষ্ঠার বাণী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় সম্মানের স্থান লাভ করেছে। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধোত্তর জার্মানীর শাসননীতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শবাদ আমাদের শাসনতন্ত্রের প্রণেতাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে জনসাধারণের যে মৌলিক অধিকারগুলির উল্লেখ আছে তাতে মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মজীবনে সাম্য এবং স্বাধীনতার আদর্শ স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য 'সংকট কালে' রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী এইসব অধিকারগুলিকে কিছুটা খর্ব করার ক্ষমতা শাসনব্যবস্থাকে দেওয়া হয়েছে—যার ফলে এই অধিকারগুলির গুরুত্ব কিছুটা হাল্কা হয়েছে স্বীকার করতেই হবে। তবে এই অধ্যায়েরই শেষভাগে এমন বিধানও করা হয়েছে যাতে এই সব অধিকারের যে কোনটি ক্ষুন্ন হলে প্রতি ব্যক্তিই আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে থারবে। তা ছাড়াও

"অধিকার"-শ্রেণীর অন্তভুক্ত নয় এমন কতকগুলি নীতির নির্দেশ আছে, রাষ্ট্রপরিচালনায় যাদের মর্যাদা রক্ষা শাসন-ব্যবস্থায় নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে। তবে যে আদর্শবাদ, যে নৈতিক বিচারবুদ্ধি শাসনতন্ত্রের এই অধ্যায়গুলিকে একটা বিশেষ মহিমায় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে, রূঢ় বাস্তবের সংঘর্ষে এই আদর্শবাদ, এই নৈতিক বিচারবুদ্ধির কতোটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা চিন্তার বিষয়।

শাসনতন্ত্রের প্রণয়নে যে স্তরের মনীষা নিযুক্ত হয় তাতে আশা করা গিয়েছিল যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনায় কোন অবাঞ্ছিত নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হবে না। সভ্যজগতের শাসনতন্ত্রগুলির নির্যাস নিয়ে তিল তিল করে তিলোত্তমা গড়বার সুযোগ, সুবিধা এবং প্রয়াস যাঁরা পেয়েছিলেন, নববাষ্ট্রের পুরাতন ক্ষতগুলিকে পুনর্গঠিত শাসনতন্ত্রের ওষধি দিয়ে নিরাময় করে তোলার ভার যাদের ওপর ন্যস্ত ছিল, সংকোচ এবং দ্বিধার তাড়নায় তাঁদের যুক্তি অনেক জায়গায় হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট, অসংবদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ। তবু তার মধ্যে পাওয়া যায় একটা সমন্বয় সাধনের এমনি এক অসীম প্রয়াস যার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু যার সততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের যে শাসনব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বা 'ফেডারেল' বলা হলেও অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রকে এতো বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যাতে যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বপ্রধান অংগ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের আদর্শ সমগ্রভাবে এই শাসনতন্ত্রের দ্বারা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। স্বাধীন ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা প্রেসিডেন্টের নামে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা তো চলবেই, আর তা ছাড়াও আইনপ্রণয়ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টকে প্রাদেশিক আইনসভা নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শাসনতন্ত্রের সপ্তম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় তালিকায় যে ৯৭টি বিষয়ে কেন্দ্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলির জন্যেই প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অবাঞ্ছিত-ভাবে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হ'তে বাধ্য। এই তপশিলেই কেন্দ্র ও প্রদেশের সহগামী বা যুক্ত তালিকায় যে ৪৭টি বিষয়ের উল্লেখ আছে এদের সম্পর্কে কেন্দ্র যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কেন্দ্রের বিধান চালু থাকবার সময় প্রদেশগুলি এ ব্যাপারে এমন কোন আইন প্রনয়ন করতে পারবেনা যাতে কেন্দ্রের অবলম্বিত ব্যবস্থায় কোনভাবে ব্যতিক্রম ঘটে। একই তপশিলে রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক তালিকায় যে ৬৬টি বিষয়ের উল্লেখ আছে সে বিষয়গুলি সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থরক্ষার অজুহাতে শাসনতন্ত্রের ২৪৯ (১) অনুচ্ছেদে পার্লামেন্টকে হস্তক্ষেপের অধিকার দেওয়া হয়েছে। শাসনতন্ত্রের আঠারো খণ্ডে সংকটকালীন বিধান হিসাবে প্রেসিডেন্ট স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এই শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণের পর্যন্ত অধিকার পেয়েছেন—আবার এই খণ্ডেই জরুরী অবস্থার অজুহাতে পার্লামেন্টকে কেন্দ্রীয় তালিকার বাইরে যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সমতা সাধনের দ্বারা ভারতের সামগ্রিক উন্নতির কথা বিবেচনা করলে প্রাদেশিক ব্যাপারে এইভাবে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়ার যৌক্তিকতা একেবারে অস্বীকার

করা যায় না। কারণ অনেকের মতে নীতির হিসাবে একটু সংকোচ থাকলেও প্রয়োজনের দিক দিয়ে ভারতের মতো সদ্য-স্বাধীন রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাতেও কেন্দ্রের ক্ষমতাপ্রসারের সুযোগ থাকা দরকার।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতের শাসন ব্যবস্থা হবে নামত রাষ্ট্রপতিমূলক কিন্তু কার্যত মন্ত্রিসভামূলক। বর্তমান রাজনীতির মাপকাঠিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথমটির নমুনা, ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয়টির। ভারতের প্রেসিডেন্ট হবেন একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় রাষ্ট্রনৈতিক নেতা কারণ তাঁকে সমস্ত প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। তবু এমন পরিস্থিতি একেবারেই অসম্ভব নয় যখন প্রেসিডেন্ট তাঁর সমস্ত সমর্থন হারিয়ে পদচ্যুত হবার ভয়েই স্বৈরাচারী সেজে বসবেন। প্রেসিডেন্ট যদি তাঁর মন্ত্রীসভার সংগে হাত মিলিয়ে কাজ করেন, ভালই—তা যদি না করেন তবে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ইচ্ছেমতোই দেশ শাসিত হবার কথা, কারণ মন্ত্রীসভার কাজ শুধু প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ এবং উপদেশ দেওয়া। ভারতে স্বৈরাচারী কোন প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব ঘটলে পার্লামেন্ট বা মন্ত্রীসভার সংগে তাঁর সংঘর্ষ বাধা বিচিত্র নয়—আর সেই সংঘর্ষের সময় বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সত্যি কঠিন। এ সময় প্রেসিডেন্ট যদি শাসনতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে আত্মক্ষমতার ক্রমবিস্তারে মনোযোগী হন, তা'হলে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের পরে একনায়ক নেপোলিয়নের উদ্ভব কিংবা দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের (Second Republic) অবসান ঘটিয়ে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের আবির্ভাবের মতো অবস্থা ভারতে যে দেখা দেবেনা এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা কঠিন।

তবে নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী এটা আশা করা অসংগত নয় যে এমন কোন পরিস্থিতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভারতের আইনপরিষদ যথেষ্টভাবে সচেতন থাকবেন। পরিষদ যদি দৃঢ়তার সংগে জনমত পরিচালনা করতে সমর্থ হন তবে শাসনতন্ত্রের ৬১ এবং ১১১ অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

ভারতের শাসনতন্ত্রে বিলাতি এবং মার্কিন প্রথার আদর্শ সংমিশ্রন হয়েছে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যেও অনেকে স্বীকার করেন যে এ সংমিশ্রনে কোনটিরই কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত থাকবেনা। কারণ এ সংমিশ্রন নেহাৎই নীতির সংমিশ্রন—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা নির্ভর করবে ভারতীয় রাজনীতির গতি, প্রকৃতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল জনমতের ওপরে। তবে আশা করা যায় যে নয়া শাসনতন্ত্রের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আপন অগ্রগতির সংগে সংগে আরও উপযোগী আইনপ্রনয়নে সমর্থ হবে; এরই মধ্যে জনসাধারণের মনে একটা রাজনৈতিক চেতনা ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ লাভের প্রয়োজন-বোধ জেগে উঠেছে—যে জনজাগরণের মূল্য জাতীয় স্বার্থের হিসাবে অপরিমেয়।

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

The Editor's Greetings

IN presenting to our readers this issue of the *Presidency College Magazine*, the editor claims no more than usual credit for the 'fulfilment' of what he considers to be a great task. The word within inverted commas seems not to be the word proper, because the *fulfilment* of which he speaks has been, in reality, hardly anything more than a bare and literal performance of duty. Our readers are never tired of insisting that nothing today is more important about the *Magazine* than the tradition that has been built up for it through years of conscious effort, and that nothing is more incumbent upon its editor than the maintenance of this tradition.

It is indeed a pride and a privilege for an invididual to have been the guardian of this tradition for a year; but it is a pride and a privilege that make for responsibility. At every stage of the progress of his work, it became apparent to the present editor that it costs the keenest of intellectual pains to preserve, let alone enrich, the tradition that is *Presidency College Magazine* ; so that even if his 'achievements'—again an improper word—look rather small beside those of his predecessors, sympathy will surely impart a mildness to criticisms which would otherwise be severe. To many the editor, thus, owes a deep apology—an apology that might better be accepted in print.

Exercising the privilege that goes with his office, the editor also extends his cordial welcome to those who have entered the portals of this ancient institution. Education here has always been a true adventure of the spirit and not that stale stereotype which elsewhere it is. It moulds our outlook in a fashion that prepare us for an easy perception of values that are for all time ; so that the editor, in bidding good-bye to the readers—the present issue brings his period of office to a close—leaves behind him this token of his love and regard for an institution to which no service is too great.

The Liberal Ideal

PROF. AMLAN DATTA—*Ex-Student*

ALMOST all over the civilised world liberalism is in disgrace today. It has been trampled on by the Fascists, held in bitter contempt by the Communists, confidently criticised by the Socialists and only apologetically defended by the Liberals themselves. And it is not for nothing that liberalism has met this fate. Liberal institutions have failed ; they have failed to satisfy the only test that counts, the test of their adequacy to meet the problems of our time.

Liberal insitutions have failed to fulfil the promise that they once held out so confidently. Yet the failure of liberal institutions does not mean the failure of all that liberalism stood for. Liberalism stood for a certain spirit, certain ideals which it thought could be realised through the institutions it came to defend. We may be firmly convinced of the inadequacy of these institutions and yet recognise the value of the ideal liberalism preached. The suggestion that what liberalism preached as an ideal may have a more permanent value than what it taught about social institutions need not appear surprising. It is not unoften that statements of differing degrees of generality find place within the fold of a single system of thought; and even when some of these statements are rendered obsolete with the passage of time, other statements of a more durable nature may retain their right to recognition. It is only in a limited sense that a doctrine is apt to be all of a piece ; and in practice we may even reject a doctrine—as we may reject liberalism—while we take over the more permanent part of its contribution.

In claiming that the liberal ideal has not lost its value even though liberal institutions stand discredited, it is not suggested that the ideal has completely escaped the influence of the institutions. As a matter of fact, even the theoretic conception of the ideal has been, in the case of many liberal thinkers, rendered confused and incomplete through the influence of mistaken ideas on economic and political institutions. To take at this stage only one example, liberal economic doctrine toyed with the idea of "the economic man", and it can reasonably be suggested that this idea obstructed the working out by the liberals of such a complete conception of human nature as an adequate statement of their ideal requires. Yet with all its incompleteness, the liberal ideal has a heart that deserves respect. And liberals with a clear recognition of this essence of their creed have not been entirely absent

* * * * *

The essence of the liberal ideal lies in its insistence on the value of the individual. Spiritually, individualism and liberalism are inseparable associates. The individual, it has been asserted, is the ultimate centre of all experiences ; happiness is a state of consciousness that in any final analysis can only belong to the individual ; and therefore the happiness of society as a whole can only mean the aggregate happiness of the individuals who compose it. If happiness is a good, it is individual happiness which ought to be promoted. It has further been asserted that while every individual is a member of a community, he is in a quite fundamental sense unique ; that even when his experiences resemble those of others, the way and the order in which he receives them are stamped with his own individuality, and it is a violence to his nature to force him to integrate his experiences in conformity with a generally prescribed pattern. The individual in short should have maximum freedom to arrive at such unique integration of his personality as his distinctive nature demands. Freedom of the individual being the supreme end neither custom nor tradition nor any institution, nor even the state, may claim the allegiance of the individual irrespective of its function in promoting freedom. Restriction on the freedom of any individual is never desirable as such, but should only be introduced when it is calculated to extend to a greater degree the freedom of others.

In what has been stated above the crucial propositions are, firstly, that the happiness of the individual is supremely valuable and secondly that the individual should have maximum opportunity to develop his own distinctive personality. These two propositions are not unrelated. It has been claimed that happiness of the individual depends on the freedom that he enjoys to develop his individuality, on his power and opportunity to integrate his impulses and experiences in a spirit of sympathetic acceptance of their peculiar character. When external compulsion results in the repression of some vital human impulse, there is often a tendency for the repressed impulse to take revenge by reappearing in a form which is both less conducive to the inner contentment of the individual and more antisocial than the originally repressed desire. To take an example, the impulse of love, when checked, may issue in the form of corroding cynicism or even of wanton cruelty. In the interest of individual happiness it is necessary that society should be reluctant to repress individuality and should be enthusiastic in its promotion. It has further been claimed that active promotion of individuality is calculated to assist not only individual happiness, but also social progress. It is possible to confront this claim with the objection that what is valuable for social progress (and for individual happiness alike) is not all types of freedom but only certain chosen types. It may, for instance, be urged that freedom to create beauty is valuable while freedom to produce ugliness is repugnant, freedom to experiment with truth is desirable, while freedom to propagate falsehood is harmful, that in short

the value of freedom depends on the ends that it serves.* A full consideration of such objections may lead one to introduce greater balance in one's emphasis on freedom, but need not induce one to withdraw that emphasis. It is good indeed to recognise that a certain basic discipline is often necessary in order that freedom may be fruitful, but the value of such discipline lies ultimately in its power to extend freedom and to enable us to undertake adventures in realms that were previously closed to us. Where imposed discipline is glorified without reference to its relation to freedom, both happiness and progress stand in danger of being sacrificed. Hence the importance of emphasizing that freedom and not discipline is of primary value.

Where liberals stand for freedom in opposition to an authoritarian tradition or the totalitarian state, what they intend to emphasize is not that all discipline is fruitless, but rather that discipline, in actual practice, is being carried to a point where it ceases to be an ally of freedom and becomes a burden on society. Even conceding that freedom in search of truth and beauty is more important than freedom to pursue their opposites, the question remains whether the cause of these great ends is likely to be served best by the state or any other institution dictating to the individual what constitutes truth and where lies beauty. If we consider the glorious centuries in European history following the renaissance, with their splendid achievements in natural and social sciences, in art and philosophy, we find that in striking contrast to the monotonous Middle Ages, they offered a wide field for rival trends of thought to flourish together and that it is this capacity to accommodate conflicting points of view which made possible that amazing progress of thought which was witnessed at that time. It seems that thought, released from crippling conformity to tradition and authority, was set at liberty to follow its own laws of development, dividing itself into apparently contradictory trends, returning through some great thinker to an attempt at synthesis and branching out again in different directions. It is only through such continuous differentiation and integration, divergence and convergence, that thought can make progress in increasing understanding of many-sided reality. It is essential for the unhampered development of thought to allow a plurality of conflicting systems to grow together towards ever-widening synthesis, if only because there are endless aspects to reality, and understanding of all these diverse aspects cannot possibly mature within the fold of any single system, however imposing it may appear. For progress of thought it is necessary, therefore, that different individuals should be left free to elaborate their own views of reality without being required to conform to any commonly accepted system. The maximum that may be insisted on is that a person who undertakes an adventure in the realm of ideas should liberally acquaint himself with the

* Alternatively, it may be suggested that if freedom as such is to be glorified as an end, it has explicitly to be interpreted in a manner that removes it far from the ordinary liberal acceptation of that term.

more outstanding experiences and conclusions of earlier thinkers. Subject to this basic discipline there should be extensive freedom in the field of thought.

It is permissible and is even necessary to point out that artists and intellectuals have their social responsibilities but it is wrong to be impatient with individuality out of an exaggerated or a misconceived regard for these responsibilities. Those who are engaged in creative pursuits require the support of a sturdy individuality in order to rise to their full heights. For the artist and the thinker it is especially important to preserve the capacity to enter into those personal depths where great ideas are born and great works of art fashioned. Though the experiences that an artist or a thinker receives are largely social in origin, he has to be alone with himself in the privacy of his depths in the gripping task of integrating these experiences into systems of thought and works of art. So much of the highest of human experiences is available to us only in moments of impregnable privacy that a too exclusive emphasis on the virtue of sociability is likely to make life superficial and insolently unaware of its richest possibilities.

Thus both for social progress and for assisting the individual to grow towards the highest experiences of which he is capable, it is necessary, within obvious limits, to retain the liberal emphasis on the value of individuality.

* * * * *

The liberal emphasis on the value of individual freedom played a liberating role when it was first introduced. Since then circumstances have changed greatly. But the significance of the liberal ideal has not thereby been exhausted. It might have been exhausted if in the meantime individual freedom had been firmly secured and conditions hostile to the growth of totalitarianism had grown up. That has not been the case. Not less, possibly more, than in the hey-day of liberalism we have today objective conditions which make possible severe regimentation of society. And if there exist today objective conditions making social regimentation a possibility, we have also people with the will and the philosophy to turn this possibility into an actuality.

Those who value individual freedom have to find out ways and means of organising society in a manner that assists the growth of freedom. In arriving at a new conception of social organisation adjusted to the claims of freedom we have to perform a three-fold task. We have, in the first place, to formulate clearly the conditions that must be satisfied in a future society if that society is to succeed in the task of preserving and promoting freedom. It may, for example, be noted that in any such society the individual must be in a position to enjoy that intricate pattern of freedoms which passes

under the title of economic freedom ;* that he must be free from all such political and social compulsions as are not demonstrably in the interest of freedom, rightly conceived ; that the culture of such a society must be zealous in emphasizing values, but hesitant in prescribing the ways in which these values can or ought to be realised in life ; that in particular, there should be emphasis on reason and "charity" whose guidance can be widely neglected in the regulation of individual life only at the risk of allowing experiments in individual freedom to pave the way to chaos, and in reaction from it, to regimentation. Secondly, it is necessary to take into account the materials, present and available today, out of which the society of to-morrow has to be built. To take only one example, the growing technology of our time must be accepted as part of those basic materials which, for good or evil, shall enter into the fabric of future society. Finally, we have to find out how, out of available materials, it is possible to build up forms of society and types of culture, satisfying, to the greatest possible extent, the conditions of freedom.

In framing our ideas regarding the institutions that we require in the circumstances of today for promoting the freedom of the individual, liberalism in its traditional form can offer us little positive guidance. Orthodox liberalism came to associate itself with institutions which, on the evidence of history, have proved their capacity to destroy the ideals which they were supposed to promote. It came to defend the system of private enterprise which has given rise to a high degree of concentration of capital in a few hands, a resulting intensification of class conflict, chaos, on a considerable scale, in the field of international trade and general economic stagnation It put its faith in the system of parliamentary democracy which satisfies itself with popular elections and representative government. It is a fair index of the inadequacy of this system that Hitler came to power through a popular election. Political democracy will remain fragile and ineffective until it provides for something more than formal "representative" government. It must build itself on education that arms the people with a sense of the importance of their rights and with the knowledge of how to defend them, and extend itself to include economic democracy and to adopt widespread devices for ensuring direct popular control over and participation in vital legislative and administrative functions. Orthodox liberalism, again, has been, ever since its inception, in firm alliance with nationalism. It can be shown that under prevailing circumstances any country that attempts a purely nationalist solution of the problems of our time is practically certain to drift towards autarky, militarism and totalitarianism, which together constitute a tragic negation of the liberal ideal. The liberal ideal is incon-

* He must—to elaborate this point—have the opportunity to earn a decent living under tolerable conditions of work, have a wide choice in the selection of his occupation, have enough leisure, and, subject to obvious limitations, have the freedom to spend what he earns according to his own inclinations.

sistent with unconditional loyalty to any such arbitrary group as the nation ; it must find its logical and its spiritual basis in individualism, on the one hand, and humanism on the other. Humanism, and not nationalism, is the natural ally of individualism : the individual in the depth of his nature is a man, and not a member of an arbitrarily demarcated group. Nationalism has not only provided liberalism with an institution unsuited to its spirit ; it has prevented liberals from realising clearly the fullest import of the ideal they stand for and, to that extent, it has corrupted the very spirit of liberalism.

To state the liberal ideal in its purest essence, and to suggest ways and means of enthroning that ideal in social life, through institutions which many orthodox liberals may be among the first to oppose, is an important task of our age.* Those who will undertake to fulfil this task will possibly arrive at an ideology which is so far removed from orthodox liberalism as to deserve an altogether new name ; but in thus discarding liberalism, the builders of the new philosophy will have paid back their debt to it in the only way in which spiritual debts are repaid.

Cosmic Rays

DEVAPRASAD DATTA—*Third Year, Science*

SOME fifty years ago scientists were perplexed to find that their electroscopes lost electric charges without any apparent reason. The electroscopes leak when the surrounding air is ionised *i.e.*, made conducting by radiations emitted by radium and such other radio-active substances. But the problem faced by the scientists was made difficult by the fact that the electroscopes lost charge even when they were covered by sheets of lead which stopped all kinds of known ionising radiation. So the scientists concluded that there existed an unknown radiation much more penetrating

* It may be thought that in socialism we have already an answer to the question of how to preserve freedom through a social organisation fitted to the circumstances of our time. Any such statement is far too complacent to be of much practical help. Socialism has various brands, and the types that have so far been practised over any considerable length of time have generally been singularly hostile to freedom. To those who are concerned with the problem of freedom, socialism is more an exploration than a solution.

than any radiation then known. Experiments showed that this radiation produced from four to nine pairs of ions per second in one cubic centimetre of air which contains 2.7×10^{19} molecules. Experiments also showed that such radiations were not of terrestrial origin because Hess and Kolhoerster had proved in 1912-13 that ionisation effect is greater at higher altitudes. Then came the question : Where did it come from ? What was its nature? Was it a kind of super X-ray with incredibly short wave-length and electrically neutral like light? Or did it consist of electrically charged corpuscles like those emitted by radium? These questions were left unanswered for the next ten years due to World War I. In 1925 R. Millikan gave a new impetus to the research by experimenting with it under water and high up in the air. Continuing these measurements E. Regener found the ionisation to be 200 times stronger at an altitude of 30 kms. than at the sea-level. He also recorded the radiation at the depth of 235 metres under water. From these experiments it was proved that these radiations were not of terrestrial origin but they have their origin somewhere in the vast Cosmos and thus they were named "Cosmic rays".

The researches with these rays took a decisive turn with the invention of the two instruments—the "Geiger-Muller Counter" and the "Wilson Cloud-Chamber". The Counter undergoes an electric discharge when an ionising particle passes through it and the number of discharges is automatically counted. In the Cloud-Chamber the enclosed saturated moist air is suddenly cooled by expansion and the condensation only takes place over ions or ionised particles. Along the ionised paths cloud tracks are formed and they are automatically photographed. The dellection of the ionising particles in a magnetic field can also be detected by this instrument, thus indicating the kind of charge possessed by the particle. With the help of these instruments the direction, mass, velocity, and electric condition of the particles comprising the radiation can be determined.

The first successful experiment under magnetic fields was carried out with the earth's field, which is very feeble, only .2 to .5 gauge as against 15,000 gauge that can be produced in the laboratory. But the far extending terrestrial-field catches particles from a great distance.

The debarring influence is greatest at the magnetic equator because the radiations coming in that direction are perpendicular to the earth's field. If the cosmic ray consists of electrically charged particles then it will be found in abundance in the polar region but less profusely in the equatorial region. The very first measurement showed a drop of 14% at the equator. But is it due to the earth's magnetic influence or to the atmosphere? A. H. Compton showed by classic experiments that the latitude effect is greater than the altitude effect. Contrary to expectations, the intensity was found to increase upto the latitude of 45° or 50° and then remain constant. With the help of G. M. Counters it was found that the

more penetrating part of the cosmic rays consisted more of positive charge than of negative. In 1933 H. L. Anderson of Pasadena detected an unusual phenomenon—a pair of cloud trails left by one negative and one positive particle. The positive particle was named Positron. It had so long escaped detection due to its extremely short life, about one millionth of a second. The most amazing thing about this pair of particles is that they are formed not from anything material but from energy, according to the formula of Einstein $E=mc^2$ where 'c is the velocity of light (3×10^{10} cms per second), 'E' is the energy in ergs, and 'm' the mass in grammes. This shows what an incredible amount of energy is required in their formation.

If a photon or the grain of light is transformed into an electron pair its energy must be equal to one million electro-volts which is called I Mev. and that is the energy-unit in the cosmic ray research. Gamma rays from Thorium contain energy of value 2.6 Mev, hence they can be converted into an electron pair. Fission of Uranium releases energy of 160 Mev, but the cosmic ray generally possesses energy of several thousand Mev—thus it is a heaven-sent source of enormous power to the physicist.

What is the source of this immense energy? It does not depend on any solar radiation but it is only disturbed equally all over the earth during magnetic storms, the phenomenon which is attributed to the hypothetical electron ring in high altitudes. Some scientists trace the origin of the cosmic ray to the "Supernovae" in which stars for some unknown reason undergo a terrible explosion, and the light caused thereby increases the dim trickle of light received by 25 or 30 %. Such phenomena are extremely rare, only ten having been recorded until now. The common "Novae" does not eject enough mass to fill the interstellar space as the cosmic rays.

In 1935 the Japanese physicist Yukawa while working on the forces acting on the atomic nucleus, assumed the existence of a particle Meson, capable of being charged positively or negatively and having a mass 200 times that of an electron. Two years later the Meson was actually detected in the cloud chamber and its life was found to be 0.000002 seconds when at rest and a trifle more when in motion. Since its mass is 200 times that of an electron, it requires 100 Mev for its creation.

According to present-day theory, the atomic nucleus consists of protons and neutrons. They are essentially the same corpuscle nucleon, only the former is charged positively and the latter is neutral. Negatively Bohr's theory, when an electron passes from the outer to the inner ring a photon is released. Again, if an electron is in interaction with an electro-magnetic field it releases a photon which is absorbed by another electron. The Meson plays the same part in the nucleus as the photon does in electrons. The field that exists in the nucleus as a substitute for the electro-magnetic field keeps the atom cemented. This, for want of space, has only a cor-

puscular state and no wave-nature is exhibited by them. These corpuscles are the Mesons and the field is the Mesonic field. The reason why they were not detected in the atom is that their life is far too short to be recorded. In a photograph taken in a cloud chamber by Williams and Robertson in 1940 it was found that the Meson disintegrated into an electron and a neutral particle "Neutrino" which was also predicted by Yukawa. A neutral Meson is named "Neutretto" and its discovery is awaited. Recently a report from the flying laboratory, a B-29 Superfortress flying at an altitude of 30 to 40 thousand feet, says that the Neutretto also exists.

Recently an emulsion known as the Nuclear Research Emulsion has been invented in which the travelling corpuscles record their path by acting on its silver bromide, oxygen, nitrogen, or carbon. A recent photograph by Perkins with a plate covered by the N. R. E. (Nuclear Research Emulsion) revealed that a slow Meson disintegrated an atom into three parts by smashing its nucleus. Mesons not only ionise in their way but they also retain enough energy to smash the nucleus of an atom. Neutrons were so long used for atomic fission, because the neutrons being neutral are not repelled by charges so that they can proceed relentlessly until they hit a nucleus and smash it. The N. R. E. photographs exposed for six weeks by Power and Occhialini on Pic du Midi, recorded that two atomic disintegrations per square centimetre was brought about by Mesons.

Among the components of cosmic rays two main groups are identified, the soft or the easily absorbable group A, and the hard or the highly penetrating group B. It should never be thought that the group A contains less energy than the group B. The penetration depends on the amount of energy possessed by the particle. These corpuscles which scatter their energy in ionising the gas through which they pass penetrate less than those which preserve their energy. The Mesons are the most penetrating component of the cosmic rays. At sea-level they form 70 to 80% of the total radiation. They have been traced as deep as 1000 metres below the sea and they harden with the depth.

If two lead screens are placed in the path of the cosmic rays within the cloud chamber it is found that the track of an electron stops on the upper plate, leaves nothing between the plates and then a pair of electron and position emerges from the lower plate. This phenomenon is explained in the following way: The electron passing through the upper lead plate has been transformed into a photon, which was invisible due to its non-ionisation, and then passing through the second screen it is transformed into an electron pair. Electrons thus produced possess enough energy to produce new photons which in turn become an electron pair. In this manner one electron is multiplied into a "burst" "shower", or "cascade". In such dense material as lead the incoming rays are multiplied hundreds of times in passing through a few centimetres. The energy of a single ray at sea-level is from 2000 to 10000 Mev. In a large beam there are no less than

100,000 rays. From this we can deduce what fantastic energy has produced these rays. The shower is to be at its maximum at a height of 16 km. because above that height there is not enough matter and below that there are not enough rays.

If cosmic rays did fall on earth without any protection, all vestiges of life would have been wiped out. The ionosphere at the high altitudes prevents them from reaching the earth in full strength. Russian scientists, it is believed, are trying to find a device by which a portion of the ionosphere may be neutralised for some time. Then a whitish beam will fall on the exposed part of the earth and will not only destroy all types of life ,but also make the zone unfit to bear life for thousands of years or perhaps for ever. So far as the effect of the cosmic rays, which reach the earth in dilute doses, on living matter is concerned we are still in complete darkness.

Sir Jehangir Coyajee

—A REMINISCENCE—

PROF. D. GHOSH—*Department of Economics, University of Calcutta*

MY first impression of Professor Coyajee was of an extremely pleasant man. That was in 1920 ; I met him in his room after the lecture and put to him some elementary difficulty of mine. He quietly solved it and directed ne smilingly.

I saw him off and on during the next twenty-five years or so. My first impression was only confirmed and deepened by my subsequent contacts. I never found him dull or depressed ; he had, indeed, a sort of freshness which the passage of years did not diminish. I once asked him the reason of it. "I don't worry.", he said. His answer was simple but not quite satisfying. "Not worrying" is a negative quality of the mind, achieved by the deliberate exercise of will power. With Professor Coyajee cheerfulness was the expression of a positive attitude to life of which the chief component was charity. He loved life and living and wanted others to do the same. He never spoke ill of others and if ever conversation strayed on to persons whom he did not like or care for, he would by-pass them gracefully. On the other hand, when he talked of men and women whom he respected or admired, he would warm up perceptibly and though

his words were few, one could feel how intensely sincere they were He was appreciative of merit in high and low places ; indeed if he had a blemish, it was that of being sometimes more generous in his estimate of others than worldly judgment would confirm.

That was the man, kindly, charitable, quietly happy, and unchangingly fresh. I knew him over a period during which big changes took place in his life. He was appointed to important commissions and knighted ; he received widespread recognition as one of the ablest of our economists ; he lost his wife and left the city of his adoption in circumstances which many wished were otherwise. But honours did not spoil him, nor disappointment embitter. He retained to the end of his days only the pleasanter memories of his long association with this province, his pupils and his college and drew a veil of charitable oblivion over the less pleasant ones. Not long before his death, I was lunching with him at his residence in Malabar Hill in Bombay. I had a colleague of mine of the Bombay University with me. As happens with younger people meeting some one much older in age and experience, our interest turned to Sir Jehangir's past. The place was quiet and neatly appointed and the food good. Sir Jehangir had enjoyed his meal. He fell into the reminiscent mood and leaning aside in his chair started talking of his past. I cannot now recall in detail what he said ; but the general impression he left on me still persists. There was a man who had taken kindly to life and if he had regrets, these were of minor importance by the side of the overall joy he got out of existence.

These qualities of his made Professor Coyajee a well beloved teacher. He was not just popular in the vulgar sense. He did not pander to the weakness of his students ; he won their hearts by true sympathy. He understood their difficulties and was full of encouragement to them. He would go much further than many a teacher in helping his pupils in life, and years after they had left him, he would remember them with pride and affection, beaming with joy whenever news of their success reached him.

Professor Coyajee had, in brief, the right emotional make-up for a teacher and his success in his purely academic relationship with his students was largely founded on it. For he could, by his sympathy, draw them out and prepare them for the easy reception of what he taught. I would not describe him as a brilliant lecturer who would scintillate and move and charm his audience. His chief merits were soundness of scholarship and capacity for imparting to his pupils a firm knowledge of the basic truths of his science. He would not normally hunt out obscurities, analyse and resolve them. He concentrated on truths that had been accepted, leaving to the inquisitive pupil to probe into the debatable. I sometimes wonder if this is not, at least, in an immature science like Economics, still the best pedagogic method. Do we not often, partly as an exercise in intellectual exhibitionism,

SIR JEHANGIR COYAJEE

(1875 - 1943)

PROFESSOR : BENOY KUMAR SARKAR

Born : at Malda
26th December, 1887

Died : in Washington
24th November, 1949

worry our pupils with difficulties which are better left to them to discover as and when they mature?

Sir Jehangir had finished off at Cambridge, learnt under Marshall and Pigou and been a contemporary of Keynes. These contacts had given him intellectual values which he never parted with. He was a sincere *laissez fairist* and a convinced free trader. He was aware of the limitations of *laissez faire* and free trade ; but, for him the limitations were unimportant in comparison with the vast potentiality for economic good that the doctrines contained.

There is small sense in criticising Sir Jehangir for his views on free trade or monetary issues ; these were cogently worked out from premises that were sincerely believed in. It is these premises which experience has shown to be inadequate and with that discovery has come the recent intellectual movement away from the older creeds. This does not, however, mean that those who criticised him or held opposed views were correct. Few of them had any premises to start with and most of them tried to cover their poor logic by appeals to prejudices rather than to reason. Sir Jehangir relied on the methods of science, while his critics resorted to those of demagogy and that is why he could build up in this province a tradition of objective thinking on economic issues which was so little in evidence elsewhere. It is this tradition—difficult to build up but easy to demolish, often little paying to the social scientist personally, but vital to the health of his science—that was Professor Coyajee's distinctive contribution to the study of economics in this country and in particular, this province. The best way to remember him is to help keep this tradition alive through the trying years that social scientists in India have to go through in the immediate future.

[JEHANGIR COOVARJEE COYAJEE: B.A., LL.B. (Bombay), *Assistant Professor of Persian, Elphinstone College, Bombay, 1903. Professor of Persian, Wilson College, 1906. Scholar of Caius College, Cambridge. B. A. (Cantab), 1910. Professor of Economics, Presidency College, Calcutta, since March 17, 1911. On deputation as a member of the Swan Committee (appointed by the Government of Bengal), 1917 ; of the Royal Commission on Indian Currency and Finance, November, 1925 to June, 1926. President, Indian Economic Conference (at Lahore), January, 1923. Delegate to the League of Nations at Geneva (1926-31). Knighted, 1928. Principal, Presidency College, Calcutta, October, 1930 to August, 1931. Nominated Member, Council of State, 1930. Principal and Professor of Economics, Andhra University (1932-35). Appointed Member of the Indian Coal Committee (1936-37). Elected Government Research Fellow, K. R. Cama Oriental Institute, 1939. Died, July 14, 1943.*]

Benoy Sarkar as an Exponent of Young India

(1887-1949)

PROF. HARIDAS MUKHERJEE—*Ex-Student*

BENOY SARKAR (1887-1949) was one of the foremost thinkers and builders of modern India. He was in line with those great Titans whose vision, energy and endeavour carved out for India a permanent address in the modern world. His creative career started with the initial year of the Glorious Bengali Revolution (1905-14) and persisted with all its dash and vigour till his death in November, 1949. His creations and activities thus spread over the whole span of the first half of the present century. In these fifty years India and the world had changed almost in a revolutionary way. Himself a product of this revolutionary change, Benoy Sarkar was also in a very real sense a mighly factor in producing this change. If India is now somewhat politically free and if the Orient and the Occident have come today to a better and more reasonable understanding than before, it is not a little due to the persistent intellectual activities and cultural propaganda of Sarkar. Few of our national leaders had worked in foreign lands with greater zeal and sincerity than Sarkar in order to gain for India a footing of equality with the Western races. In any study of Benoy Sarkar this bit of factual history must be firmly grasped and clearly understood. It will be sheer nonsense to eulogise the man blindly without understanding this real rôle he played in modern India and in her relation to the larger world. He was far greater than what many of his colleagues and contemporaries could possibly conceive of. The premature death of such a man is indeed an irreparable national loss and in his death India has lost one of her most patriotic sons and one of her loudest exponents in the international forum.

BRILLIANT UNIVERSITY CAREER

Born at Malda in Bengal in 1887, Benoy Sarkar received his early education there and stood first in the Entrance Examination of the Calcutta University at the age of thirteen. His college career at the Presidency College (1900-06) was equally brilliant. In 1905 he secured a First Class First in double Honours (English and History) and obtained the renowned Ishan Scholarship of the year as the best Honours student of the University. Next year, he took his M.A. degree in English. He was then a prominent figure in the academic world of Calcutta and veteran scholars of that time

recognised in him a potential intellectual leader of the country in near future. As a student Benoy Sarkar kept lively contacts with diverse men, institutions and movements. Among his college associates and intimate friends of that time (1900-06) may be mentioned, the names of Haran Chakladar (anthropologist), Radhakumud Mookerji (historian), Radhakamal Mookerji (economist and sociologist), Rajendra Prasad (Congress leader), late Prafulla Kumar Sarkar (journalist and social philosopher), late Rabindra Narayan Ghose (Principal, Ripon College), late Nripendra Chandra Banerjee (Prof. of English), Advocate Atul Gupta and late Rakhaldas Banerjee (archaeologist and historian), Upendra Nath Ghosal (historian), Surendra Nath Dasgupta (historian of philosophy) and Girin Bose (psycho-analyst).

In the Swadeshi Movement (1905-14)

It is worth while to observe that the period (1905-14) was one of great storm and stress for Young Bengal. The Bengali Revolution declared itself on the 7th August, 1905 and was daily proceeding with speed and volume in the country. The call of the motherland found a deep echo in young Sarkar's mind.

In that atmosphere he rejected the India Government's State Scholarship as well as the most covetable offer of the day of a Deputy Magistrate (1906). They had practically no charm for him. The dream of the country's freedom,—political, economic and cultural,—was the *elan vital* of him. Soon he was drawn into the heart of the revolutionary movement. The ideological foundations of the Bengali Revolution were laid in the country by the late Satish Mukherjee long before 1905. Late Satish Mukherjee was the pioneer of the National Education Movement. He was the editor of the *Dawn* and the founder of the *Dawn Society*. His saintly character and magnetic personality gathered round him a band of enthusiastic followers among whom Benay Sarkar was one of the most prominent.

Under Satish Mukherjee, Benoy Sarkar was initiated into the ideals of self-sacrifice, patriotism and social service. As a follower of Satish Mukherjee, he joined the Swadeshi Revolution and actively participated in the National Education Movement. Benoy Sarkar not only set up a number of national schools at Malda, but wrote a variety of books for the learners on national education and on national lines (1906-14). Among these publications the following deserve special mention: (1) *Bange Navayuger Nutan Siksha* (1907), (2) *Siksha-Vijnaner Bhumika* (1910) available in English translation, sa (3) *Introduction to the Science of Education* (1913), (4) *The Study of Language* (1910), (5) *Science of History and Hope of Mankind* (1912), (6) *Sadhana* (1912).

The publications of Prof. Sarkar in the Swadeshi period (1905-14) were no less than twenty volumes and they together covered nearly two thousand

and five hundred printed pages. Some of these books were published from London while some others were translated into Hindi. They dealt with a wide variety of subjects and the comparative method was constantly followed. The contemporary scholars, thinkers and savants of Bengal were struck with wonder by the prolific character of Sarkar's literary productions. These publications unquestionably demonstrate Sarkar's astonishing grasp over facts and they are the visible symbols of the inner urge and integrity with which he served the National Education cause of his country. The College of Engineering and Technology at Jadabpur, Calcutta, is today perhaps the only living monument bearing on it the stamp of the National Education Movement of the Swadeshi period. It is the result of the gradual evolution and transformation of the National Council of Education (1905-14) of which Benoy Sarkar had always been an important limb. With the history of the evolution of the Jadabpur College his life was intimately woven. Throughout its historical career he had been in the very heart of it and to its present moulding few after Satish Mukherjee had contributed so substantially as he.

Next we may call attention to Benoy Sarkar's introduction of new pedagogic theories into the field of Bengali scholarship through his diverse publications of the Swadeshi period. It was he who for the first time taught the Bengalees as well as other peoples of India to learn a language, Indian or foreign, without grammar. For his revolutionary departure from the beaten track in educational theory and practice he was warmly acclaimed as a pioneer in the field by prominent scholars like Brojen Seal, Haraprasad Sastri, Mahamahopadhyaya Adityaram Bhattacharyya and others. His novel method of teaching Sanskrit without grammar was so impressive as to win for him the title of *Vidya-Vaibhava* from the Sanskrit scholars of Benares (1912).

Prof. Sarkar, be it recalled, was also responsible during Swadeshi period (1905-14) for training up Indian experts in foreign affairs. First-hand foreign education was considered by him as an important factor in the remaking of the country, and thanks to his initiative, sixteen scholars were sent abroad for higher training in western arts and sciences. These foreign-trained scholars later on rendered valuable services to the country in various capacities.

Again, it was Sarkar who was chiefly responsible for placing a solid fund with the Bangiya Sahitya Parishat (Calcutta) to encourge the Bengali translation of important western works (1911).

All these were the different aspects of his services to the mother-land during the period of the Swadeshi Movement (1905-14).

IN WORLD-TOUR (1914-25)

A completely new chapter of Benoy Sarkar's life opened in 1914 and spread over till 1925. It was the first period of his world-tour and his cultural conquests on different fronts in the two hemispheres. It was also the period of his countless publications in a variety of modern languages,—English, Bengali, Hindi, French, German and Italian. He undertook a tour through Egypt (1914), England, Scotland and Ireland (1914), the U. S. A. (1914-15), Hawii Islands (1915), Japan (1915), Korea and Manchuria (1915), China (1915-16), the U. S. A. (1916-20), France (1920-21), Germany (1921-23), Austria (1922-23), Switzerland (1923-24), Italy (1924), Austria and Germany (1924-25) and again Italy (1925). As a Visiting Professor he lectured in all those lands very extensively. There was hardly any important university in Europe and America in which he did not throw out his challenge as an exponent of Young India. In Germany he spoke in German, in France in French and in Italy in Italian, thus showing his solid mastery over three continental languages. He could freely use them according to his need of the moment. This mastery enabled him to study French, German and Italian sources in their originals and he made free use of them in his speeches and publications. Through Benoy Sarkar India could know France, Germany and Italy better, more correctly and more realistically than ever before. And in their turn, France, Germany and Italy could also know India more adequately, more correctly and more realistically. This was also true in the case of Great Britain and the U.S.A. as well as the Far East. Previous to 1914, Indian Scholars were used to looking at the world through Anglo-American spectacles. In comparative culture-study India was hardly placed in the perspectives of non-English and non-American worlds. But thanks to the Sarkarian methodology, India was always placed in comparative culture-study in the diverse perspectives of the world along with the Anglo-American.

In other words, India was always thrown in bold relief in the perspectives of each country from Tokyo to Mexico. The introduction of this method in comparative culture-study was a solid contribution of Prof. Sarkar in this period (1914-25) and since.

The different publications of this period sufficiently bear out the validity of Prof. Sarkar's title to be the pioneer of a new methodology in comparative culture-study. His *Futurism of Young Asia* (Leipzig, 1922 pp. 410) constitutes a monumental proof of his methodological novelty. His publications of this period in Indian papers,—dailies, weeklies and other periodicals,—were legion. There was hardly any intellectual of India who had not read at least one or two of the countless writings of Prof. Sarkar at that time (1914-25). His big publications, apart from those in German, French and Italian, ran to about two dozen. Different aspects of world-culture,—ancient, medieval and modern,—constituted the fundamental theme of Prof.

Sarkar. His published works of this period (1914-25) alone covered about eight thousand pages.

Some Sarkarian Characteristics

It is well to remember certain basic facts about these publications. First, they are diversified and they serve as an adequate index to Prof. Sarkar's encyclopaedic scholarship. There was hardly a subject which he had not touched and enriched. His interest traversed through all the epochs of human culture and in each subject, his knowledge was amazingly vast and penetrating. A celebrated German paper viz. *Sozialwis senschaftliches Literaturblatt* once observed: Prof. Sarkar reminds us in many ways of our Oswald Spengler on account of startlingly many-sided erudition and intellectual flexibility with which this scholarship traverses in a powerful manner all the regions and epochs of human culture."

A second important fact to emphasise is that every time Prof. Sarkar wrote, he was capable of introducing a new technique of interpretation and of giving a new message of his own. Benoy Sarkar is, above all, original. He is nothing if he is not original—original in style, original in technique, and original in message. "Raja Rammohan Roy, Keshab Chandra Sen, Pandit Iswarchandra Vidyasagar, Surendranath Banerjee, Swami Vivekananda, Chittaranjan Das, and Subhaschandra Bose", once wrote the *Indian Social Reformer* of Bombay in its editorial columns, "are all typical examples of the free and independent spirit of Bengal which refuses to bend its knees to any individual or cult. An even more impressive example is Benoykumar Sarkar, who challenges practically every school of thought which holds the field in India today". That clearly sums up the Sarkarian standpoint as a thinker and creator.

A third basic fact to note is that Prof. Sarkar's publications exhibit an astonishing clarity of thought with effectiveness of assertion. Judged by the Shavian dictum that effectiveness of assertion is style, it is needless to say that Prof. Sarkar had a style of his own, which may be best called the *Sarkarian* style. As regards his treatment of data he was almost mathematically precise and factual.

As a patriot and social servant he aspired after India's greatness, but as a thinker and theorist he maintained a singular objectivity.

Unlike others, his motive in speeches and writings was not to seek popularity, but to find out "truths" in human relations. He was never afraid of speaking out "truths" unreservedly. His unorthodox approach to life and study was often provocative. It was not for nothing that he was called a prophet by some and a crank by others.

Impact of Sarkarism

A fourth basic fact that needs to be emphasised is the reaction of the intellectual world to the Sarkarian impact.

Prof. Sarkar undertook a world-tour during 1914-25 with the central purpose of bringing about a closer, deeper, and more human understanding between the East and the West.

Since the Battle of Plassey (1757) down to the day of the Swadeshi Movement (1905), the entire Orient was lying in a servile or semi-servile state, being dominated everywhere by the Western Powers. This domination was both political and cultural. But since 1905 entire Asia entered upon a period of creative revolt and reconstruction. Few of the Asian leaders could represent that great revolt in the international forum more impressively and more adequately than Prof. Sarkar. During 1914-25 he served as one of the greatest unofficial ambassadors of India, nay, of Asia in foreign lands and strove most strenuously through countless speeches and writings for bringing about a human understanding between the two hemispheres. His central message was equality between the East and the West. On the strength of his own comparative studies and researches in East-West ideas and institutions, he came to the conclusion that a good deal of nonsense had so long been propagated about India's or Asia's rôle in the world—ancient, medieval and modern. He found world-scholarship vitiated by the presence and propagation of what he called pseudo-science, pseudo-history and pseudo-socioiogy. The result was that the theory of fundamental distinction between the East and the West in culture, general outlook and scheme of life was loudly preached at home and abroad.

Prof. Sarkar broke away right from the traditional way of thinking and intellectually threw out his challenge to the combined scholarship of the Occident on this point*. He was the first to cry halt to it in an effective manner. His publication *Positive Background of Hindu Sociology* (Vol. I 1914 ; Vol. II 1921) was a solid counterblast to the then prevailing notion of East-West difference. His most memorable challenge was *The Futurism of Young Asia* (Leipzig, pp. 410 ; 1922) which was encyclopaedic in conception and which strove to demolish at a giant's blow the false and artificial superstructure of East-West difference in outlook and mentality. "Humanity", Prof. Sarkar held and preached, "is in short essentially one,—in spite of physical and physiognomic diversities, and in spite of historic race-prejudices. The *elan vital* of human life has always and everywhere consisted in the desire to live and in the power to flourish by responding to the thousand and one stimuli of the Universe and by utilising the innumerable world-forces". This was the

* Haridas Mukherjee: *Benoy Sarkar as a Pioneer in Neo-Indology* (Modern Review, February, 1950).

Sarkarian standpoint in world-culture. In all his lectures and writings of this period of world-tour (1914-25) this point of view, among others, was emphasized, most clearly, most unequivocally and most objectively.

Prof. Sorokin, the great contemporary American sociologist, once commenting on Prof. Sarkar's dissimilarity with many Western sociologists, said that Prof. Sarkar's position seems to be more critical, more accurate and more acceptable. In this connection it is interesting to see that Prof. Norman Himes writing in the *Annals of the American Academy of Political and Social Science* observed that Prof. Sarkar's work "is far less provincial than 90 per cent of Western social science books. Prof. Sarkar is far better acquainted with Western thought and social and economic conditions than are Western scholars with Eastern thought and conditions." All these tend to show that Prof. Sarkar's world-tour did not go in vain. Factually speaking, liberal scholars, thinkers and writers of Eur-America were knocked out of their many old idols and superstitions inherited from the 19th century and convinced of the Sarkarian approach, method and message in world-culture. Prof. Karl Haushofer (Munich) wrote about Sarkar's *Futurism of Young Asia* (Leipzig, 1922, pp. 410) that the book concerned "explains perhaps more explicitly than all others the relations of the national ideas of China and India with Pan-Asian currents of thought and their antithesis to the Eur-American tendencies. It may be regarded as a guide to the ideas of leaders of the Asian movement. Everybody who undertakes a deeper and more intensive investigation of this problem, in so far as the exhibition of surging ideas is concerned, will have to begin chiefly by analysing Sarkar's philosophical fresco of awakening Asia. This is the most magnificent of all presentations from the Asian standpoint known to me."

Career in India (1925-49)

The third phase of his career started with Prof. Sarkar's return to India (1925) and his appointment as a Professor of Economics in the Post-Graduate Department of the Calcutta University (1926). This period extended right upto February, 1949, when he left for the U.S.A. for a new term.

During this period Prof. Sarkar impressed his countrymen first, as a great teacher of uncommon genius, and secondly, as a great builder of India's intellectual life. Throughout this whole period he stayed in India with a short break in 1929-31 when he had been in Europe as a visiting-Professor. At home or abroad, he addressed his mind most enegetically to the enrichment and expansion of India's intellectual horizon. He became intimately connected with diverse men, institutions and movements. In very many instances men and institutions were formed and fostered under his creative leadership. He founded during this period (1925-49) no less than eight Research Institutes in Calcutta, viz. (1) Bengali Institute of Economics

(1928), (2) "International Bengal" Institute (1931), (3) Bengali Society of German Culture (1931), (4) "Malda in Calcutta" Society (1933), (5) District Council of National Education, Malda (1934), (6) Bengali Institute of Sociology (1937), (7) Bengali Asia Academy (1938), (8) Bengali Dante Society (1938) and last but not least, Bengali Institute of American Culture (1946). With each of these Institutes a band of enthusiastic research scholars was connected. Prof. Sarkar guided no less than one hundred scholars in research-lines in a wide variety of subjects with an astonishing ability. He constantly emphasised before his Research-Fellows and Associates the need for linguistic equipment of the Indian scholars. At least one European language other than English must be learnt by the research-workers on a compulsory basis. Besides, he also taught his associates and pupils two other basic lessons: first, to study everything in world-perspectives, and secondly, to study life and the universe in a thoroughly objective manner. As regards the method of handling and interpreting the data he was never in the habit of inflicting himself on others. Philosophically speaking, Sarkar was an advocate of the "pluralist view of life" and he constantly employed the pluralist technique in handling and interpreting the data. He was the first to introduce the pluralist technique to the field of Bengali, nay, of Indian scholarship, on a vast and organised scale. Here is to be noticed another significant contribution of Sarkar to modern India's scientific or philosophic scholarship. Among his publications, *Creative India* (Lahore, 1937 ; pp. 725), *Villages and Towns as Social Patterns* (Calcutta, 1941 ; pp. 704), *Political Philosophics since* 1905 (Madras and Lahore, 2 vols., 1928, 1942 ; pp. 1698) may be easily singled out as a wide-flung encyclopaedic application of this pluralist methodology.

Enrichment of Bengali Literature

The enrichment of Bengali literature in serious historical, philosophical, economic and political thinking was a constant dream of Benoy Sarkar. He urged his pupils and associates to record the results of their studies and researches in Bengali. Intellectuals with a business-like temperament hardly appreciated this point, but he was ever insistent on it. During his period of first world-tour (1914-25) he kept constant contact with the Bengali-speaking world through the numerous Bengali periodicals of the time,—dailies, weeklies and monthlies. His wide experiences as acquired by travels in different lands amidst different peoples and races were at once communicated to his countrymen through his countless writings. Even his Bengali works of that period (1914-25) ran to at least ten big volumes covering approximately four thousand pages. To these Bengali volumes were added several new ones in the period of 1925-35. The general topic as well the title of these volumes, thirteen in number, was *Vartaman Jagat* (Modern World) which included a factual discussion of the diverse races, cultures and human progress of the modern world. The first volume of this series was

published in 1915 and the last one in 1935. The *Vartaman Jagat* (pp. 4700) introduced a new tone and vision into the academic and intellectual life of Bengal. Its readers were thousands and they could know, —in very many instances for the first time too.—the thousand and one currents and cross-currents of the modern world understood in the widest sense possible. Besides this, Prof. Sarkar was also responsible for Bengali translation of certain Classical books in economics from French and German. They included, first, *Parivar, Gosthi O Rashtra* (Bengali translation from a German book by Engels ; 1926), secondly, *Dhana-daulater Rupantar* (Bengali translation from a French work by Lafargue ; 1928), and thirdly, *Swadeshi Andolana O Sanrakshana-Niti* (Bengali translation from a German book by Frederick List ; 1930). Among his other Bengali publications in the period of 1925-39, *Naya Banglar Goda-Pattan* (2 vols., 1932 ; p. 980) and *Badtir Pathe Bangali* (1934 ; pp. 636) are to be specially emphasised because of their tremendous impact on the Bengali mind of that time. Again, it was Sarkar who was a pioneer in publishing a monthly economic *Bengali journal, Arthic Unnati (1926) of which he was the editor till his* death. Lastly, in the capacity of the Director of Researches in his Institutes, he was responsible for the publication of two important Bengali volumes dealing with economic theory and practice as well as sociological method and data. They were *Banglay Dhana-Vijnan* (2 vols., 1937-39 ; pp. 1350) and *Samaj-Vijnan* (1938 ; pages 600). It is thus evident that Benoy Sarkar devoted much of his time and energy to the enrichment and expansion of the Bengali literature. Be it added, he was also the author of the Bengali work *Ekaler Dhana-Daulat O Artha-Shastra* (1930-35 ; pp. 1150).

By his close personal contact and life's example Benoy Sarkar strove to infuse his own intellectual idealism into his pupils and research-associates. Not money or rank, not material prosperity or worldly benefit, but self-less duty as well as knowledge for its own sake was the never-failing urge of him. Idealism and Sarkarism were almost convertible terms, as it were. Intellectual idealism or the ideal of knowledge for its own sake had been harped upon by myriads of men in the past almost in every generation, but never perhaps was it so passionately pleaded and embodied as by him. In his unquenchable thirst for knowledge, life and light, he seems to be a follower of Socrates, the greatest exponent of the Age of Illumination in Greece (450-400 B.C.). Like Socrates, he left nothing unquestioned and like his great predecessor was an unyielding challenge to his age. This challenge was manifest in all his writings, speeches and publications in six modern languages. His English publications alone of this period (1926-49) ran to about fifty volumes and they together covered more than ten thousand pages. His German, French and Italian papers and publications ran to about eighty in number. All these constitute a permanent proof of his "unusual versatality", as Garner put it, "as well as his encyclopaedic knowledge, penetrating study, and above

all, his revolutionary departure from the beaten track." Even his smallest article embodied the Sarkarian spirit—the spirit of creative revolt and reconstruction.

THE LAST DAYS (March-November, 1949)

The last phase of Prof Sarkar's career begins in March, 1949. On the 28th February, 1949, he started for the U.S.A. on an extensive lecture-tour programme and had been staying there till his death on 24th November, 1949. His lecture-tour was arranged by the Institute of International Education, New York, in collaboration with the Watumull Foundation, Los Angles. As a visiting-Professor he lectured in diverse American Universities, academic institutes and culture-centres on an astonishing variety of subjects. But his fundamental theme was *The Dominion India in World-Perspectives*. There was hardly any other single man more capable and more adequate for the purpose. This time also Prof. Sarkar exhibited his youthful vigour and worked with his characteristic enthusiasm for bringing about a closer and more reasonable understanding between the East and the West. The two pamphlets, *India in America* edited by Dr. Tarak Nath Das and *The Peoples and Cultures of India* edited by Mr. Wood, (1949), give us a glimpse into the startling work done by Prof. Sarkar in the U.S.A. within a short period of six months only (March 7—August 10, 1949). Mr. Grace Wood, Secretary of the Department of Anthropology, University of Michigan, wrote in his Preface to *The Peoples and Cultures of India*: "As a member of Prof. Sarkar's class and as a participant of the colloquia held by him, I believe that Prof. Sarkar has succeeded admirably in attaining his goal, that the presenting his subject matter, India, in a most realistic manner and from every possible point of view. Those of us who had occasion to be associated with him were constantly struck by the range of his factual knowledge and by the diverse methods at his command for handling and interpreting the data. It has been a great pleasure having him on our campus, and I feel that his being here will bring great rewards to both our countries in terms of greater understanding and friendship."

Oil And The Middle East

PROF. RAMESH CHANDRA GHOSH.

IN power politics nothing at present is more important than oil and uranium. But if the atom bomb can work havoc, it requires to be dropped by an airfleet and the defending country equally requires a fighting squadron to resist the bombers. The navy is yet a mighty force; and the cruisers, battleships, submarines now work on oil. The entire motor transport, numerous industrial plants and all agricultural tractors require oil. The armoured cars and tanks also depend on this liquid. All the great poweres are now anxious to have as much oil-regions of the world under their control as possible. Unfortunately, the leading oil-producing country in the world, U.S.A. is also the greatest consumer of oil, and the rate of exploitation of oil in U.S.A. is such that within some fifteen years all her oil reserves will be exhausted, unless new regions are discovered and controlled by her. The output in 1946 of the principal producing countries will be found in the following figures :

	(Barrels)
U.S.A. ...	1,733,424,000
Venezuela ...	388,486,000
Mexico ...	49,235,000
U.S.S.R. ...	175,200,000
Roumania ...	31,206,000
Sakhelin ...	6,000,000
Netherlands Indies	2,100,000
India	2,000,000

Middle Eastern Countries	(Barrels)
Iran	146,000,000
Saudi Arabia ...	59,000,000
Iraq	35,665,000
Baherin	8,000,000
Kuweit	5,931,000
Egypt	9,000,000
Total Middle East	263,596,000

The total world output in 1946 was 2,750,190,000 barrels. U.S.A. produced 63 per cent., Venezuela 14 per cent., other Western Hemisphere countries 5 per cent., U.S.S.R. 6 per cent., Iran 5 per cent. Recently the Arabian output is going ahead with a tremendous speed. While the Iranian output was increased by 12 per cent. between 1945 and 1946, Saudi Arabian output increased by 200 per cent. In 1948 the output of Arabian fields exceeded that of the Persian fields. Hasa wells gave 20 million tons, Kuweit yielded 10 million tons, while Persia produced only 26 million tons. What is most important for us to note is this that though these Middle Eastern figures do not approach the yield of the U.S.A. or the

Carribean fields, yet the oil reserves of the Middle East have been found to be greater than those of U.S.A. Dr. De Golyer, after the visit of the American Technical Mission in the Middle East, reported to the U.S. Petroleum Resources Corporation in 1944 that the oil reserves around the Persian Gulf amount to 4,500 million tons while those of U.S.A. are 3,000 million tons. In his opinion "the centre of gravity of world oil production is shifting from the Mexican Gulf and Carribean area to the Middle East-Persian Gulf area."

This oil has been the cause of the enslavement of Middle Eastern peoples in the past, and is going to be the greatest source of evil in future, unless Asia, under the leadership of India and China, formulates a Monroe doctrine for their security and prosperity. It is a well-known principle of statecraft that balance of power should not be ignored. But the American, British, French and Dutch interests in the Middle Eastern oil regions threaten the security of India and retard the democratic movement in the Middle East. It is admitted that the Soviet pressure in the north can not be ignored and requires resistance. But that resistance movement must be democratically organised and independently conducted. It must not be dictated from Whitehall or Downing Street. It must not be led by the despotic sheikhs, the feudal landlords or the few business magnates, who have so resolutely resisted the march of democracy, political and economic, in Persia, Iraq, Egypt, Saudi Arabia, Transjordan. The same policy that led the British to support and maintain by military help a reactionary regime in Greece, is now leading the Anglo-American block to support the reactionaries in Persia. Even assuming that Soviet policy in the Middle East is a great disquieting factor, we cannot ignore that the growth of Anglo-American vested interests with the support of the other Atlantic Treaty Powers in the Middle East is a positive danger to a sovereign democratic India and to independent democratic Persia, Iraq, Saudi Arabia or Transjordan.

In order to make myself more clear, I feel I should point out that Great Britain tried to control the whole of Southern Persia by the Anglo-Russian Agreement of 1907 and subsequently by the notorious Anglo-Persian Agreement of 1919, which she had to abandon in the face of world protests. Though Russia voluntarily surrendered all her rights and concessions by the Russo-Iranian Treaty of 1921, the British have not only refused to give up the oil concessions obtained by the Anglo-Iranian Oil Company (52.5 per cent of the shares of this Company are owned by the British Government itself; the rest are owned by private British capitalists), but seem to have interfered with Persian sovereignty on more occasions than one. For example, British forces forcibly entered into the Persian territory in the first world war. Then in 1919, the British tried to impose upon Persia that humiliating Agreement of 1919. In World War II. they

again landed their forces on the Persian soil though there was violent opposition from the Persian Government. In August 1946, after a local rising among the Bakhtiari tribes of Southern Persia, they despatched troops from India to Basra, and the Cruiser "Norfolk" together with the sloop "Wild Goose," waited in the Iraqi waters. On September 29, 1946, the Persian Ambassador in London handed a note to the British Foreign Office alleging complicity of Mr. Trott, the British Concul-General at Ahwaz and Mr. Gault, the British Consul at Ispahan in these Bakhtiari uprisings. In 1933, when Reza Shah threatened to cancel the oil concessions, the situation was saved by the British climbing down to a new agreement which gave them concession for 60 years, while the Persian Government also secured better terms.

Again, when Great Britain secured a mandate over Iraq, she created a dispute between Turkey and Iraq over the vilayet of Mosul where oil was discovered. Turkey appealed to the League of Nations in vain. Great Britain secured Mosul for Iraq and then obtained the oil concessions in that vilayet. She also imposed upon Iraq a Treaty, almost by force, under the terms of which she can land her armies on Iraqi soil and use Iraq's ports, aerodromes, roads, etc. It is interesting to note that the Iraq Petroleum Company has six partners: (1) Anglo-Iranian Oil Company (23¾ per cent.), (2) Royal Dutch Shell (23¾ per cent. out of which 40 per cent. British owned and 60 per cent. Dutch); (3) Compagnie Francaise des Petrols (23¾ per cent) ; (4) Standard Oil Company of New Jersey and (5) Socony Vacuum—these two American Companies together hold 23¾ per cent ; (6) C. S. Gulbenkin, an Armnian (5 per cent). In this connection it is also to be noted that by taking advantage of the Italian invasion of Abyssinia, the British Government imposed a Treaty upon the Egyptians in 1936, from which all Egyptian Governments since then, have tried to liberate Egypt. But all their efforts have ended in smoke. Under the terms of that Treaty, British forces are still stationed there on the Egyptian soil (in the Aquaba areas), now no longer for defending India, but securing British oil interests in the Middle East.

In this context it appears serious that U.S.A. is now extending her hold over the oil regions in Arabia. Under the Red Line Agreement, the American Companies holding shares in the Iraq Petroleum Company could not invest their money separately. But as a result of the modification of that Agreement effected after the second World War, these two Companies have invested millions of dollars in a new giant oil kartel, the Aramco *i.e.* Arabia American Oil Company and its subsidiary Trans-Arabian Pipe Line Company. The Aramco has secured from King Ibu Saud Oil concession in Arabia over an area which is more than half the area of India. Shares in the Aramco are distributed as follows: Standard of California 30 per cent.; Texas 30 per cent.; Standard of New Jersey 20 per cent.; Socony Vacuum

20 per cent. Besides these Kuweit wells are shared 50 per cent by the A.I.O.C. and 50 per cent. by American interests. The Baherin oil is also worked by American Companies.

The Soviet policy towards the Middle East has given America an opportunity to strengthen her interests in this region. The aggressive interference of Russia in the affairs of the Northern Persian province of Azerbaijan, has brought the American Military Mission into Persia. The Persian army is being equipped with arms similar to those supplied by America to Turkey. The aerodrome at Kum is being developed on such a scale that it appears to be intended for more than Persian aircraft. The military agreement invites the American Mission to " co-operate with the Persian Ministry of War and with the personnel of the Iranian Army for raising the fighting capacity of this Army." The American advisers are taking photographs of the Iran-Russian border. Oil has brought America in the Middle-East and Persia, Saudi Arabia, even Turkey are departing from the principles of democracy and socialism, and developing an inveterate hatred of Soviet Russia, which is exactly what U.S.A. wants as the best security against the advance of Communism. It is also interesting to note that at Dhahran in Saudi Arabia, U.S.A. is building an airbase on such a grand scale that it would be easy for her to bomb Baku, Batum and other Soviet areas from this base. In July 27, 1947, Persia obtained a loan of Rs. 26 million from U.S.A. for the equipment of Persian army.

In Turkey again an American loan and a Military Mission have the same end in view. The members of the American Military Mission have travelled over different parts, especially the Russo-Turkish frontier, and have studied ports, aerodromes, fortifications, all with a view to resist Soviet attack. Senator Johnson of Colorado described this sort of American help for Turkey as " a declaration of war on Russia." But what is the real motive behind these actions of U.S.A. in Turkey, Persia, Palestine, Saudi Arabia? I will answer it by quoting from an American writer of established reputation: " Britain opposed the move (of Russia, for joint control of the Straits, with Turkey) fearing that such a partnership would make Turkey subservient to Russia's will and enable Russia to reach the oil of the Middle East, outflank Greece and threaten Suez.....for that reason Britain kept her troops in Iraq at Turkey's back door and in Greece, where King George II commanded a British-trained army of Greeks. A pro-British Greece and an independent Turkey as the guardian of the Straits is Britain's minimum demand. The United States like Britain, recognises that Greece and Turkey are two-way gates for strategy (and)..... .....views potential Russian domination of Turkey and Greece as a threat to her own world interests as well as to those of her ally Britain " (J. S. Roucek—"Government and Politics Abroad," p. 527). The present policy of U.S.A. is to make all the Atlantic Treaty States interested in the oil

of the Middle East. The American exports of oil are to be diminished and by 1953, Western Europe must satisfy its oil requirements from the Middle Eastern supply. I cannot develop this point here, but I will only quote from a very revealing article in the *Round Table*, March, 1949: "Indeed the common interests of the main pillars of the much-heralded Atlantic Pact extend throughout an Asiatic region..... In implementing a Middle Eastern regional policy in action, it is the Atlantic Powers who are destined to play the leading parts." It is high time that India's foreign policy takes note of this new fact and exerts itself to maintain balance of power in the Middle East.

"The Waste Land" *

—AN APPRECIATION—

SOBHANLAL MOOKERJEA—*Ex-Student.*

OUR life is nothing but a barren land ;
No hope remains for crops, and fruits, and trees!
A picture—how pathetic! Therefore, these
Soon make us sad. Here youth soon fades, in sand
Lie buried all our soft, nice feelings, and
The flow of human culture, by degrees,
Here stops. The walls of classes never cease
To be. Romantic writers! Stop your hand!
To-morrow's young redeemer, when you'll come,
Your footsteps rouse in hills and mountains here
The tears of millions which are fossils numb!
The candle you hold, though bright, will tremble in fear!
Your voice, though loud, and clear, will soon be dumb!
Eternal silence shrouds your voice—"Oh! Dear!"

"The Waste Land" is one of the famous works of T. S. Eliot.

Cultural Fellowship*Brajabuli

PROF. JANARDAN CHAKRAVARTI

INDIA has been a land of diversities. It was so in pre-historic times. It continues to be so even to this day. Diversity of languages has often been advanced as a plea for disbelieving in the soul of Indian civilisation and in the unity of Indian culture. During the centuries of foreign rule it was constantly dinned into our ears that the idea of one-ness of India was born with the British rule in India and that, with the extensive cultivation of English, Indians began to dream of a United India—a dream which English education and the British rule not only roused but also helped a good deal to realise.

Sir George Grierson classified the bewildering varieties of Indian languages into four principal groups, namely, the Indo-Aryan, the Dravidian, the Kol and the Tibbeto-Chinese, groups which are known to have been in existence from the earliest point of recorded or traditional history down to the present times. It is curious to note, however, that at no point of India's long history, linguistic diversity ever presented any difficulty in the matter of a great idea spreading over the whole of the Indian sub-continent. The Śruti and Smṛti ruled the whole of Āryāvarta, and later, the whole of Aryanised India. The two great Sanskrit Epics cast their spell over Aryan, Non-Aryan, and what is now known as the Greater, India. The hero of Vālmīki's Epic, having his patrimony in Ayodhyā, married the princess of Videha or Mithilā, crossed over to the Deccan, made friendly alliances over there and fought his demoniac enemy across the seas, in Laṅkā. The blind king Dhritarāstra, in the other Epic, ruling in Hastināpur and marrying the princess of Gāndhāra, his younger brother Pāṇḍu marrying the princesses of Madra and Kuntibhoja, had their sons engaged in a fratricidal war which brought into conflict Śiśupāla, the chief of Chedis, Jarāsandha, ruling in Magadha, Bhagadatta, hailing from Prāgjyotiṣpur and other chiefs from all over Aryan and Non-Aryan India, over whom dominated the great political and spiritual leader, Śrīkṛṣṇa, who, having been brought up in the Gôkul-Vrndābana area, seized the throne of Mathurā and shifted his capital, later on, to Dvārakā in Gujarat. Practically the whole of India, as known in modern times, was in the picture, the different geographical and ethnical

---

* By courtesy of All India Radio, this being the fifth of a series of the following four talks on Cultural Fellowship:—(1) Unity in Diversity—Dr. R. C. Majumdar; (2) Assam and Navadwip—Dr. S. K. De; (3) Assam and Bengal—His Excellency Sri Sri Prakash, Governor of Assam; (4) Bengal and Orrisa Sri Artaballabh Mahanti, Dean of the Faculty of Arts, Ukal University; and (5) Brajabuli – Prof. Janardan Chakravarti.

units coming closer together by way of conflict which ended in the grand harmony of the Mahābhārata.

Coming down to comparatively later historical times, we have Lord Buddha rising in Kapilāvastu and spreading the light of "Dhamma" far and wide, all over India, and even beyond. Three centuries later, the great Buddhistic monarch, Asoka, had his own will imposed upon the whole country through rock-edicts and pillar-inscriptions, linguistic divergences never presenting any difficulty in the way of the Asokan philosophy of life filtering down to the lowest stratum of society.

The great and moving cult of Bhakti, originating perhaps in the South and culminating in the profound yearnings of the human soul as represented by the life of Sri Chaitanya, Bengal's apostle of love, found the most beautiful expression in the mixed, mellifluous and artificial literary language of *Brajabuli*. The message of Sri Chaitanya, his new philosophy of life based upon love of God manifesting itself through love of man, was not confined to the land of his birth. It travelled far and wide, traversing an area which comprised Gauḍa-Vaṅga, Rāḍha-Kāmarūpa, Mathurā-Vṛndāban, Utkal-Drāviḍa and Bārāṇasī-Prayāg, Chaitanyism having practically created a Greater Bengal. Then again, Chaitanyism was no mere spiritual movement based upon a mediæval religious cult. It was a mighty social upheaval which, to an extent, influenced the political history of the country. The way in which it stirred the inmost depths of the human soul is reflected in the beautiful lyrical literature which sprang up in Bengal and spread thence, as from centre, over the whole of mid-India breaking the barriers of linguistic and dialectal divergences.

The bulk of the Post-Chaitanya lyrical literature was couched, not in the language which Sri Chaitanya spoke but in the artificial Brajabuli. Now what could have been the different elements which went into the composition of this artificial and mellifluous literary vehicle? The question is not free from controversies. The curious theory of Brajabuli being the language of the ancient Vrjjis as propounded by the pioneer historian of Bengali literature, Dineschandra Sen, stands discredited now. With those who think that Brajabuli had been in existence long before the advent of Sri Chaitanya and that the Maithil poet-lauteate Vidyāpati, too, wrote in it, we are not in perfect agreement. The movement of having a common literary vehicle of thought and ideas may conceivably have started amongst the mystics of the midland sometime before Sri Chaitanya ; but it is he who must have given a fillip to this beautiful idea. This is perhaps how it occurred. Vidyāpati wrote in his own tongue Maithili on the growingly popular theme of the love of Rādhā and Kṛṣṇa. Mithilā was then a reputed seat of learning, whereto flowed from Bengal continuous streams of pupils, with a view to studying Nyāya and Smṛti, branches of Sanskritic learning in which Mithilā had specialised. The lyrics of the great and

deservedly popular Maithil bard travelled to Bengal through the Bengali pupils returning from Mithilā. They were read and chanted extensively and more admired and better preserved in Bengal than in the land of their origin.

We have it on the authority of the most authentic biography of Sri Chaitanya that when he rose far above the plane of scholarship and eschewed scholarly pursuits and controversies, Sri Chaitanya read and recited in company with his intimate associates, and drew inspiration from, the lyrics of Vidyāpati and a few others This lent an additional charm and sanctity to the lyrics which began to be closely imitated in Bengal. An attempt to emulate Vidyāpati, in form and spirit, yielded neither pure Bengali nor pure Maithil of the age but an admixture of, rather a compromise between, the two sister-dialects. There was a third element, too, namely, a sprinkling of *Vrindābani* or *Brajabhākhā,* as it is called. Vrindaban was the creation of the Bengali Vaisnavas. The six Goswamins who were the great pillars of Vaisnava thought and culture, under the inspiration of Sri Chaitanya and with definite instructions from him, made Vrindaban their centre of spiritual and scholarly activities. The poems in Brajabuli written mostly in Bengal and partly in Orissa were, as soon as they were written, forwarded to the Goswamins of Vrindaban for their approval. Govindadās, admittedly the greatest writer of Brajabuli, forwarded his poems to Śrī Jīva, with whose blessings the lyrics appeared in public and enjoyed the circulation they deserved. Naturally, therefore, the dialect of Vrindaban, *Brajabhākhā,* supplied some of its forms which went into the texture of this artificial Brajabuli, the cultivation of which continued from the days of Sri Chaitanya down to the times of Bankimchandra and Rabindranath, the latter having composed the whole of his *Bhānusimha Ṭhākurer Padvāvali* very happily and almost faultlessly in Brajabuli.

For the name Brajabuli we have our own interpretation to suggest. Braja is the name of the Mathurā-Vrindaban area, traditionally associated with the story of Śrī Kṛṣṇa. The theme of the lyrics in Brajabuli was the love of Rādhā and Kṛṣṇa. The term 'buli' applies to the inarticulately sweet and not-very-meaningful utterances of the child and to the sweet chirpings of the bird of which, imitating the English poet, it can be said, "where more is meant than meets the ear." In the language of human passions, the Vaisnava poets spoke about love divine, the language being free from the limitations of human speech.

Let us take a couple of lines from an oft-quoted verse on 'Abhisār' by Govindadās.

"কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরী বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

Rendered in English, the lines will appear as follows:—

"Planting thorns—alas, the feet are soft as lotus—and wrapping in

clothes the displaced and silenced ornaments, treading cautiously, on the tip-toe, along the path, rendered slippery by pitcherfuls of water, carried and poured down, goes she in your quest, O Mādhava." Two more lines on the same theme by the same poet:

"তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়লুঁ গৃহসুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলুঁ কহতহি গোবিন্দদাস।"

"The moment your flute reached my ears, all hopes of comfort I gave up. The sufferings ahead, in course of the journery, little do I care for. Govindadās bears testimony."

Sri Chaitanya was a traveller along the path of love. He was a dreamer of life divine having for its essence nothing but love, and the dream was realised in his life more than in the life of anybody else we know of. He toured the country extensively making himself understood wherever he went. His own age emphasised the difference between man and man and this was the spirit of *Navya Smṛti*. The age also regaled in subtle dialectics in supreme indifference to man and his relations to God and this was the spirit of *Navya Nyāya*. Sri Chaitanya gave a new lead emphasising the fundamental equality between man and man. He roused a new sense of value in man which was best expressed in his own proclamation, "*Caṇḍālopi dvijaśrestho Haribhaktiparāyanah*" "Even a pariah is as great as a Brahmin if he has love of God in full measure." He appealed to man's capacity for love of God as based upon love of man. This appeal was conveyed through a life of love that he lived, as also through the beautiful lyrics in Brajabuli which that life inspired. Linguistic divergeces melted away before this mighty man of love. Can't we, in these days of conflicting claims, take lessons from this glorious chapter of our own history?

Economics—Old and New

AMARESH BAGCHI—*Fifth Year, Economics.*

I

ECONOMICS of today is a rapidly growing science. Originally however, it occupied but a humble place among the different branches of human learning and claimed to be no more than a simple study of man in his ordinary business of life. That was possible at a time, when life of man was simple ; small villages formed the economic unit and " business "

comprised simple transaction of necessities between individuals and when, therefore, man's life—individual as also social, could be guided by the codes of religion. But with technological advancements leading to revolutionary changes in the system of production, life of man no longer remained simple. The establishment of large scale industries, now made possible, necessitated an acute division of labour and concentration of capital, which brought in their turn the problems of an equitable distribution of the national income and severe unemployment appearing at cyclical intervals. The institutional basis of the society was also changed, giving birth to problems that could no longer be solved by the tenets of an unchanging religion and which therefore had to be taken up by Economics. Since then it has been studying problems relating to the material welfare of man and has come to be known as the science of welfare, trying to show, how man's wants can best be satisfied under a given social structure with the scarce means of meeting them. But with progress of science and human knowledge, society has also changed and Economics, in order to meet the problems of the ever-changing society has also grown enormously. But it has not attained anything like finality as yet. For it is still growing. Many of its ideas are still in the melting pot and controversies yet remain to be resolved. It would, nevertheless, be a fascinating study to trace the main outlines of its growth and to contrast the present position with the past. It would be still more fascinating if this could be linked up with the changes in the social institutions acting as a causative factor in the movements in economic thought. No such thing is attempted here. The following paragraphs are intended to give you a rough idea of economics—old and new as they appear in the eyes of a beginner. I propose to do this in three sections, one on the theory of Value, another on Distribution and the last on the theory of Employment, Prices and Public Policy.

II

In the theory of Value, very little progress was made till only recent times. The primitive theory of barter had no doubt been supplanted by the idea of price as an equaliser between supply and demand. Marshall tried to show this with his supply and demand curves, which however were nothing but over-simplified generalisations of market behaviour. And there were several loopholes in his analysis. As for instance, he could not face the question of price determination under a falling cost curve squarely and saved his position by having recourse to a highly imaginary biological concept, namely, the Representative firm. It was not until 1926 that doubts were expressed about the utility of such an unreal concept. Sraffa, who first showed the incompatibility of perfect competition and continually falling cost curve was the pioneer in this line. For, it was his article in

the *Economic Journal* that drew the attention of economists to the impropriety of drawing supply curves of the market without studying the behaviour of individual firms composing the market. Some even went to the length of denying the logic of including many firms within an industry; for, they maintained that it is impossible to define an industry* and that each firm commands a market of its own.† This trend of thought culminated in the concept of "monopolistic competition" and "imperfect competition." New tools had now to be devised for the treatment of these concepts. But this search for new tools gave a new turn to the whole analysis of value. The *macro*-cosmic approach was now abandoned in favour of the *micro*-cosmic approach. The problem of value under both perfect and imperfect competition was placed on the same footing. It was now revealed that "it is false to suggest that there is a mysterious difference between the mechanism by which supply price is determined when it is rising and when it is falling."

On the side of demand, too, the economists now began to feel that to draw the demand curve on the basis of exact measurement of the degree of individual's satisfaction is unrealistic. Indifference curves showing the schedule of individuals choice between things now took the place of demand curves.

These two-pronged attack completely changed the whole technique of price-analysis and claimed to approach nearer to reality than could be possible under the rough and ready treatment of Marshall.

III

These revolutionary movements in the theory of value could not but affect the theory of distribution, which in fact was a mere application of the theory of value. The marginal productivity theory, which was attempted to determine the payment of all factors in a generalised fashion, could hold good only under perfect competition. The advent of imperfect competition was a stumbling block on its way. Although the supporters of the theory tried to obviate the difficulty with the help of concepts like Marginal Value Product, other theoretical difficulties stood in its way. And ultimately it was branded as merely a theory of "imputation" which could function only in a static state.

It was therefore thought advisable to take up the problem of payment to each factor of production separately. This however was a new task for economists. But, their intensified efforts revealed more enlightening facts than was possible to find out with the perfunctory treatment of the older economists. And let us now turn to these facts one by one.

---

* See *"Structure of competitive industry"* by E. A. G. Robincon.
† See *"Theory of Monopolistic Competition"* by Chamberlin.

In the theory of rent, to begin with, the very idea of the nature of rent underwent considerable changes. For, the changes in the idea of costs opened up a new angle of viewing rent as an economic phenomenon. Whereas, it formerly was taken to be a result of operation of the law of diminishing returns, now it was regarded as purely an economic surplus, as distinguished from costs (and costs now meant some foregone alternative and not mere physical disutility). The age-old question of whether "rent enters into price" was now treated in a more rational and logical way. For the new view of costs made it clear that a payment that looks like unavoidable for a individual producer, *i.e.*, without the payment of which he would not be able to command the use of a particular factor, may from a wider point of view, say the society as a whole, seem a useless payment in the sense that the factor would be at the source of the society even if it were not paid by it (*i.e.*, the society). Rent, therefore, as commonly called, enters into price from a narrow point of view, but it is not price determining from a wider point of view. That is to say, economic rent does not go into costs, for *ex definitione,* it is something in excess of the necessary cost,—it is a "surplus."

But the concept of "surplus" is not a new one. As a matter of fact, a distinction between payments which are of the nature of "a surplus" and which are not had been recognised by even the propounders of the marginal productivity theory. Rent and profit had been included in these "surplus payments." Rent we have already discussed and let us therefore turn to Profit.

The exact nature of "profit" is a baffling problem for economists even to-day. Continuous attempts have been made to determine the exact nature of "work" for which profit is paid. Some have preferred to call it a reward for risk bearing, some a premium on uncertainty and some a return for entrepreneurial work and others would have it viewed as a composite income. The latest attempt has been—and this might provide the clue to a final solution—to find out a relationship between profit and long-period rate of interest.* But it is still under investigation. And let us therefore proceed to the theory of Interest without going any further into the theory of profit. But before I proceed to Interest, it will be better (for reasons which will be apparent later) to examine the present position regarding Wages.

At first, there were several theories to explain the principle of allotment of wages, such as the wages-fund theory or the Iron law of wages. These theories, though each containing some element of truth in it, were haphazard and inadequate. The marginal productivity theory appeared to be a better principle. But its theoretical imperfections coupled with other difficulties in its functioning (due to the presence of heterogeneity even

* See Bounding's *"Economic Analysis"* Part two for such an analysis.

among wage-earners in the shape of experts and non-experts) threw the marginal productivity theory into general disfavour. Yet the general principle that under fairly competitive conditions, labour cannot be deprived of the value of its work for long, provides a rough explanation of wages.

Modern treatment of wages has taken a different line. Leaving aside the traditional way of troubling over the amount of wages, modern economists have concentrated their efforts on finding out the relationship between wages and employment. I shall deal with this problem in the section on Employment.

Now coming back to the theory of interest, we find that change has taken place in several directions. Formerly, the interest theories attempted to explain the theory of interest either objectively in terms of productivity of capital or subjectively, in terms of time-preferences of individuals. All other classical theories were, more or less, variants of these two broad approaches. The neo-clossical theory of interest, that explained interest as an equaliser between saving and investment was nothing but an attempt to combine the two earlier theories into one. But the propounders of all these theories treated of capital in the ultimate analysis as consisting of physical goods. But now came Keynes, with his concept of money-capital, or loan-capital and the motives of demand for money. Interest, he said, is a monetary phenomenon and money, he showed, is not solely demanded to purchase other commodities. In an immediate sense, there is a demand for money itself originating from many motives, for it does not always act as a more veil of physical transactions. Interest, he now concluded, is determined by the inter-action of supply and demand for cash.

Now this was a complete breakaway from the classical tradition. And what is more, Keynes attempted, what was not done before, to link up the theory of interest with a general theory of employment and prices. In fact, Keynes, in his endeavour to find out the errors of the neo-classical theory (which he showed was inconsistent in assuming a fixed schedule of saving which is shifted bodily with shifts in the income of the community) was led to this formulation. But, let us note, Keynes was not completely free from errors. Attempts to rectify some limitations of Keynes's theory of interest have taken the shape of a "loanable funds theory," which incorporates some items of supply and demand for cash, that could not be included in Keynes's framework, and which attempted to explain interest as a mere price, in the ordinary way of supply and demand for loans.

IV

But as I have said, the most significant thing in the modern approach to interest was to bind it up with a general theory of employment and prices. In fact, recent thoughts in economics have been focussed almost

wholly on the theory of employment. Its impact on public policy and general economic thought has been profound. And so vast a literature have grown up on the subject (and it is still growing) that it will take a volume merely to enumerate them. Here I shall try only to trace the main outlines of the modern approach to employment, of which Keynes's *General Theory* was the starting point, without going into the niceties of the whole discussion.

Before Keynes, full employment was a very convenient assumption for economists. The whole superstructure of classical economics was built up on this unreal assumption. And such unemployment as presented itself was declared to be voluntary, which very simple devices like wage-cuts could do away with. Their contention being that, the capitalist system suffers from no inherent defects of its own. For supply creates its own demand and except for institutional immobility, there is no reason why the community should not have a smooth way to stable and full employment. The swings of the trade cycle are also explained as either due to lack of judgement or incorrect policy of banks, etc. But the impact of the late twenties, which no amount of counselling by wise experts could stop, was too great for these weakly founded doctrines. This led to a good deal of heart-searching among economists. And even before Keynes, many economists had begun to question seriously the prudence of believing in the older theory. But they, including Keynes himself, were steeped too deep in classical tradition to get out of it all at once. What they did at this juncture was to trace the cause of economic fluctuation in a lag between savings and investment.

They took a few years more to realise that the gap between Saving and Investment was not the cause but a new symptom of some deep-seated malady. And that was only in the year 1936, when Keyms pointed out, supported later by statistical investigations that, "a psychology of the community is such that when aggregate real income is increased, aggregate consumption is increased, but not so much as income."* As a result there is a chronic tendency towards a deficiency of demand as the income of the community goes on rising, for an increasingly widening gap is created between the community's income and its expenditure, when the former goes on rising. This is why a given amount of investment, instead of perpetuating its process of employment—creation, spends itself after achieving some amount of employment; what that amount will exactly be depends however, on the consumption function† of the community. "The propensity to consume and the rate of new investment determine between them the volume of employment."‡ Thus in a poor community, prone to consume by far the greater part of its output, "a very modest measure of

* *General theory of Employment, Interest and Money*—By J. M. Keynes (p 27).
† *Consumption-function* means the relationship between the community's income and what it can be expected to spend on consumption.
‡ *General Theory*—p. 30.

investment will be sufficient to provide full employment; whereas a wealthy community will have to discover much ampler opportunities for investment if the saving propensities of its wealthier members are to be compatible with the employment of its poorer members."*

The central thesis of Keynes therefore, is that if the widening gap between income and expenditure can be bridged by continued new invest ment, it is not difficult to reach fairly high levels of employment. In fact achievement of full employment is possible only if new inventment is persisted in. The prescription following logically from Keynes's diagnosis of the disease is: (i) give all inducement to new investment, by lowering the rate of interest, creating confidence in business etc., or (ii) try to raise the community's propensity to consume by redistribution of income, (for with a higher propensity to consume, the volume of employment that a given amount of investment will create will be greater than before) or, (iii) if this is not enough, the government will have to undertake the task of bridging the gap directly through public investment or through subsidies on consumption.

Now, the change that it meant for the traditional thinkers in the field of public policy has been profound. The older theory of cutting wages to create full employment was discarded ; as a matter of fact, this was regarded now as all the more dangerous since this meant a direct reduction of the effective demand of the community (though however there is in this way some inducement to invest in a very tortuous if not dubious manner through reduced rate of interest.) Governments were not entrusted with heavy responsibilities. For, in the former times, the governments were urged to spend as little as possible, so that it might not interfere with private investment: an unbalanced budget was held in acute disfavour and the study of Public Finance was confined to the examination of a bundle of stereotyped and hackneyed maxims designed to earn the government the maximum income at the least sacrifice of the taxpayers. The new theory revolutionised the whole out-look on Public Finance. The place of public expenditure in the economic life of the community acquired new importance, since it is public expenditure which now will have to come to the rescue if private investment fails.

In the theory of money and prices, Keynes's new analysis has been very illuminating. For, it shows that the old way of looking at prices as varying more or less directly with the quantity of money was improper inasmuch as a study of the bearing of variations in the quantity of money on prices must take note of two intermediary factor, namely, the state of employment and the rate of interest. A given increase in the quantity of money, other things remaining the same lower the rate of interest,—increase investment and employment. And injection remaining the same will money will

* *General Theory*—Pp. 31.

directly raise prices only when the resources of the country are fully employed, or there are insurmountable obstacles on the way of their full employment.

This in short, is the trend of economic thought in recent times. As you will have seen, very big strides have been made in many matters only in the past few years. Many of the old theories have been found either unsound or inadequate. Some of them, accordingly had to be perfected, and some rejected and some other had to take their place. The search for mathematical support for many theories will lead to still more refinement. Not every word of Keynes has been accepted as gospel truth. And researches, both theoretical and statistical, are being carried on to verify his doctrines. The latest and very welcome tendency among economists has been to study the problems on a dynamic plane. This, at last, may go a long way to integrate the different departments of the science inform them with a unity of purpose and provide them with an unified underlying basis, which economics had sadly been lacking so long.

Asoka And The Downfall Of The Maurya Empire

KAMALESHWAR BHATTACHARYA—*Fourth Year, Arts.*

KING Bimbisāra, in the 6th century B.C., had launched Magadha in that career of conquest and aggrandizement which was continued with unbroken success through more than two hundred years under a succession of powerful rulers, *viz.*, Ajātaśatru, Mahāpadma Nanda and Chandragupta Maurya. When Aśoka, the grandson of Chandragupta, conquered Kalinga, the gigantic Magadhan Empire stretched from the foothills of the Hindukush to the borders of the Tamil country in the extreme south. The classical writers tell us what a great terror had been struck by the Magadhan forces under the Nandas into the hearts of the Macedonian soldiers of Alexander who did not even dare to cross the Beas. The Magadhan army under Chandragupta Maurya hurled back the battalions of Seleukos who was obliged to submit to a humiliating treaty by surrendering the precious provinces of Ariana in exchange for the trifling equivalent of five hundred elephants. But hardly a quarter of a century had passed since the death of Aśoka when in 206 B.C. the Bactrian Greeks under Antiochus the Great crossed the Hindukush which formed the north-western

boundary of the Maurya Empire. Indigenous literary tradition records how the "viciously valiant barbarians" overran the whole of the Madhyadeśa and even threatened the metropolis, Pātaliputra itself. Where was now the power that had once scared away the turbulent hosts of Alexander and repulsed the mighty troops of Seleukos? Who was responsible for this deterioration?

Three distinguished Indian historians, *viz.*, Dr. D. R. Bhandarkar, Dr. K. P. Jayaswal and Dr. H. C. Raychowdhuri, have considered this question and have arrived at the conclusion that it was the new foreign policy of Aśoka, pursued throughout the reign since the shock of the Kalinga War, that was solely responsible for the decline of the Magadhan military power, leading inevitably to the downfall of the Empire.

When, in his eighth regnal year, Aśoka conquered Kalinga, the annexation of which was vitally necessary for rounding off the existing Magadhan Empire which included the Andhradesá and probably also the greater part of Bengal, he was undoubtedly pursuing the traditional imperialistic policy inherited from his forefathers. But the grim horrors of the Kalinga war left a painful impression upon the compassionate heart of the monarch, and in R. E. XIII he plainly declares:

"Of all the people who were slain, done to death or carried away captive in Kalinga, if the hundredth part or the thousandth part were now to suffer the same fate, it would be a matter of regret to His Majesty." This immediately inclined Aśoka to Buddhism which teaches non-violence (ahimsā), and he declared, as a challenge to the age-old imperialistic tradition: "It is the conquest through Dhaṁma that is considered by me to be the chief conquest" (Eṣe cha mukhamuti vijaye devānaiṁ priyasa yo dhrama-vijayo, R. E. XIII). In R. E. IV, Aśoka exultingly states: "The sound of war-drums (bherighoso) has become the sound of Dhaṁma (dhaṁmaghoso). Not content with this achievement of himself alone, he exhorts his sons, grandsons and all his discendants to follow in his footsteps and eschew all territorial conquest: "Putra papotra me asu navaṁ vijayaṁ me vijetaviyam"—(R. E. XIII).

Commenting on all this, Dr. Bhandarkar states: "The effect of this change of policy, of the replacement of Vijaya by Dhaṁmavijaya, were politically disastrous, though spiritually glorious. Love of peace and hankering after spiritual progress were no doubt engendered, and have now been ingrained in the Indian character. The Hindu mind, which was spiritual, became infinitely more spiritual. But, that must have created some apathy to militarism, political greatness and material well-being. This must have been the reason why after Kautilya we find the progress of the political theory and practice suddenly impeded and stunted—especially at a time when the Magadha State was expected to create the feeling of nationality and raise India to a higher political plane. Aśoka's new angle of vision,

however, sounded a death-knell to the Indian aspiration of a centralized national state and worldwide empire. The effects of his policy were manifest soon after his death. Dark clouds began to gather in the north-western horizon, and hardly a quarter of a century had elapsed since his demise when the Bactrian Greeks crossed the Hindukush which formed the north-western boundary of the Maurya dominions, and began to cause the decay of what was once a mighty empire."

Dr. Raychowdhuri adds: "India needed men of the calibre of Puru and Chandragupta to ensure her protection against the yavana menace. She got a dreamer."

Dr. Jayaswal goes even a step further to declare: "The accident of the presence on the throne, at a particular juncture in history, of a man who was designed by nature to fill the chair of an abbot, put back events not by centuries but by millenium."

Whatever one, unacquainted with the real ideas of Aśoka, expressed in his edicts, may think of these apparently cogent statements, one must be astounded at the fantastic reveries that these eminent historians seem to indulge in. Thus Dr. Bhandarkar says, "And if the vision of the Chakravarti Dhārmika Dharmarāja had not haunted his mind and thus completely metamorphosed him, the irresistible martial spirit and the marvellous state-craft of Magadha would have found a further vent by invading and subjugating the Tamil states and Tāmraparṇī towards the southern extremity of India and would probably not have remained satisfied except by going beyond the confines of Bhāratavarṣa and establishing an empire like Rome."

But, what was the lesson of the Kalinga War? In that single campaign, states Aśoka in R. E. XIII, "One hundred and fifty thousand men were captured, one hundred thousand were slain and many times as many died." It is not possible to determine the proportion of the loss on the side of the victor to that on the side of the vanquished, but so large a number of casualities as recorded in the royal proclamation must have included a great proportion on the imperial side. If the conquest of a single country proved so formidable a job, how much more so would have been the conquest of the powerful Tamil states that lay beyond! Even if they were conquered, it is doubtful how far the Emperor, from his distant base at Pataliputra, would have succeeded in maintaining an effective control over them in those days when communication was difficult. The "digvijaya" of Samudra Gupta, aptly called the "Indian Napoleon," extended up to Kāñchī in the Far South. But, he failed to annex any state beyond the Vindhyas, and in spite of his lofty ideal of an all-India Empire, had to leave the vanquished rulers of the South with complete autonomy. It was "the Deccan ulcer" that ruined Aurangzeb.

The dream of extending dominions on the part of an Indian monarch "beyond the confines of Bhāratavarsa" would have proved far more fantastic. If the Balkh campaign of Shah Jahan has been branded as "the vainest of vain dreams" at a time when methods of warfare were much improved, it can easily be imagined how much vainer the project of marching through the deserts of Persia and western Asia with elephants and chariots would have been. As Arrian observes. "A sense of justice prevents any Indian King from attempting conquest beyond the limits of India." Perhaps it was not only a sense of justice but one of military impossibility too that combined to prevent even the greatest of the "digvijayins" like Chandragupta Maurya, Samudragupta and Harṣvardhana from carrying their arms beyond the boundaries of India.

What, again, is the lesson that history teaches us, on the efficiency of aggressive militarism? Could even Napoleon and Hitler prevent their eventual downfall? Did not Louis XIV who spent his whole life in warfare simply undermine the French monarchy? Let us compare the condition of France after Westphalia with that of India after the conquest of Kalinga by Aśoka. France, after Westphalia, with the ideal of the "scientific frontier" well-nigh realised, should have devoted her energies to various peaceful developments that would make for her prosperity. But Louis XIV, unable to break with the militaristic tradition of his country, pursued the aggressive foreign policy inherited from Henry IV, Richelieu and Mazarin with the ultimate result that France, at the close of his more than fifty years' reign, was left exhausted and spent up. India, after Kalinga War, resembled France after Westphalia. The annexation of Kalinga removed that single wedge which had so long been driven into the body politic of the Magadhan Empire, and any further attempt at territorial expansion would have meant pure aggression. Fortunately, at this critical juncture of her history, India had on her throne a monarch who, freeing himself entirely from the age-old tradition, succeeded in evolving a new ideal which aimed not at terrestrial conquest but at the spiritual unification not only of the whole of Jambudvīpa but of the whole known world.

The question now arises: was Aśoka, while laying so much stress on "Dhammavijaya", blind to the fact that in spite of the genuine goodwill cherished by him towards all, there were enemies, both internal and external, against whom the Empire must be defended? One, acquainted with the statements of Aśoka in his edicts, must admit that the monarch was ever in a state of preparedness against such contingencies. Thus, in R. E. XIII Aśoka sternly declares in relation to the recalcitrant forest-tribes (Atavis): "And they are told of the power to punish them which Devānaṁ priya possesses in spite of his repentances, in order that they may be ashamed of their crimes and may not be killed." Similarly in S. R. E. II., while assuring the independent frontier states of his goodwill and sincere desire to respect their territorial integrity, warns them against

ncroachment upon his own territory, and declares that he will bear with hem only so far as it is possible to bear. "Anutape pi cha prabhave," 'mighty though repentant" (R. E. XIII)—this perhaps strikes the key-ote of Aśoka's policy. As Dr. Raychowdhuri himself writes: "He schewed military conquest not after defeat but after victory, and pursued a policy of forbearance while still possessed of the resources of a mighty empire."

Dr. Raychowdhuri says: "The Magadhan successors of Aśoka had neither the strength nor perhaps the will to arrest the process of disruption. The martial ardour of imperial Magadha had vanished with the last cries of agony uttered in the battlefields of Kalinga. Aśoke had given up the aggressive militarism of his forefathers and had evolved a policy of Dhaṁma-vijaya which must have seriously impaired the military efficiency of his empire. He had called upon his sons and even great grandsons to eschew new conquests, avoid the shedding of blood and take pleasure in patience and gentleness. These latter had heard more of Dhaṁma-ghoṣa than of Bheri-ghosa. It is, therefore, not at all surprising that the *roi fainéants* who succeeded to the imperial throne of Pāṭaliputra proved unequal to the task of maintaining the integrity of the mighty fabric reared by the genius of Chandragupta and Chāṇakya."

But, the distinguished historian seems to ignore the important fact that though Aśoka did his best to impress upon his descendants the idea that there was no higher conquest than the conquest through Dhaṁma, he never intended to impose this lofty ideal upon any of his successors who were unworthy of it. On the contrary, from R. E. XIII it clearly appears that he did not altogether deny the possibility of military conquests (sāyaka—, or sarasake—vijaya) under his descendants who might cherish the idea of territorial expansion. They are only advised to temper their conquests with mercy (Khainti cha lahudandata cha) so as to make them bloodless as far as possible. This single fact is sufficient to prove the falsity of Dr. Raychowdhuri's statement that "Magadha after the Kalinga War frittered away her conquering energy in attempting a religious revolution, as Egypt did under the guidance of Ikhnaton."

Undoubtedly, as Dr. Raychowdhuri points out, "the ease with which general Pusyamitra overthrew his King in the very sight of the army shows that unlike the earlier Kings of the dynasty who took the field in person, the last of the Mauryas lost touch with his fighting forces and ceased to command their affection." But how is Aśoka to be held responsible for this fault of his successors? The abandonment of the policy of territorial conquest must have led to the curtailment of the number of the soldiers. It is, however, undeniable that the King who replaced "Digvijaya' by "Dhamma--Vijaya" must have lost touch more and more with his soldiers. Still, a monarch, who could at times even forget his religion and assume a retaliatory attitude towards the refractory Ātavikas

and the aggressive neighbouring states, was by no means a dreamer and could not be blind to the fact that military efficiency was the prime condition of the safety of the Empire.

Thus, so far as the foreign policy of Aśoka is concerned, it can hardly be said to have led to the downfall of the Maurya Empire. But, before ending this discussion, a few words must be said regarding the Emperor's internal policy, for it has not alsa escaped attack from scholars. Thus, Mahāmahopādhyāya Haraprasād Śāstri, nearly forty years ago, wrote that the downfall of the Maurya Empire was due to a Brāhmanical reaction promoted by the Śungas against Aśoka's internal policy.

Now, although such distinguished scholars as Wilson, Heras and Dikshitar have advocated a theory that Aśoka was a follower of the Brāhmanical religion throughout his reign, the Edicts of the Emperor leave no doubt that he was an ardent Buddhist. In the Bhabru Edict, for instance, Aśoka confesses his faith in the Buddhist Trinity *viz.*, the Buddha, the Dhamma and the Samgha, and declares that what has been uttered by Lord Buddha is gospel truth (Bhagavatā Budheno Chāsite save se subhāsite). Nevertheless, Aśoka never tried to impose his faith on others. His "Dhamma", as distinguished from the "Sadhamma", is completely noncudal in its stress and non-sectarian in its spirit, and contains not a word about God or the Soul, not a word about the Buddha, the Four Noble Truths, the Causal Genesis and the Nirvāna. But, it consists of those eternal ethical and psycho-ethical truths which constitute the common property of all religions on earth. The King who laid so much stress on concourse (samavāyo) and growth of the essence (sāravadhi) among all sects (R. E. XII) could never be intolerant towards any religion. No doubt Aśoka, as we learn from R. E. I, prohibited animal sacrifices. But. did not some of the Upanisads (*e.g.* the Mundaka and the Chhāndogya) which are śrutis to the Brāhmanas declare themselves, long before Aśoka, in no uncertain terms against animal sacrifices and in favour of ahímsā? On the other hand, the Buddhist King who made no distinction, between the Brāhmanas and the Śramanas and inculcated liberality and seemly behaviour to both (R. E. III, R. E. IV and R. E. VI) must have won the sympathy and gratitude of the Brāhmanas instead of alienating them.

Thus, it was neither the internal nor the external policy of Aśoka that was responsible for the downfall of the Maurya Empire. Its real causes should be sought for elsewhere—in the weakness and incapacity of the successors of Aśoka, the gross misgovernment of the Empire under them and the dissensions in the imperial family itself. Above all, there was the inherent defect of autocratic state whose fate was bound up with the character of its ruler. It was perhaps in view of this fact that Ibu Khāldün wrote: "Kingdoms are born, attain maturity and die within a definite period, which rarely exceeds three generations."

In Support Of The United Nations

PRAHLAD KUMAR BASU—*Third Year Arts*

THE whole world today is a strange mix-up and a terrible tangle of conflicts and jealousies and the new tendencies that increase the field of this conflict. Indeed, a harsher age has appeared, an age of aggressive violence backed by corrupted power. On the one side we see the peace-making proposals being entertained by the people of this world and on the other hand, we see the stage is going to be prepared for a fight between the two blocs of the Earth. The world has to choose between Power and Peace. Here at this momentous juncture of the World history rise the domes of the United Nations Council, the organization which represents peace and unity of mankind, to see a better world in the near future.

Throughout ages man has struggled much for Liberty, Right and Freedom. So he has changed the system of Society once again—from Feudalism to Capitalism, from Capitalism to Socialism, from Socialism to Democracy and the attempt is still being carried on to replace Democracy by Communism. But behind this his eternal striving there is a desire, an yearning for equality, brotherhood, peace and economic freedom so as to keep him physically and mentally happy. But man has attained very little in his endeavour and it is the greatest challenge against the human civilization *whether it is able or not* to put a stop to this barbarous warfare of the twentieth century. And the civilization of man will be a failure if it can not prevent, if I may say so, a recurrence of such great disasters as happened in the World Wars I and II.

Feudalism, Capitalism, Socialism, Anarchism, Communism—so many 'isms' and behind them all, stalks opportunism. But there is also an idealism for those who care to have it. One may say that idealism is a product of sentiment. But " man does not live by bread alone." He has instincts, he has sentiments, he has the capacity to think, to invent and to suggest something new, something novel,—which unitedly take up the harp of life and smite the chord of self that trembling passes into music out of sight. Again change is the law of life; but how can there be a new order unless it is thought out and planned. Idealism, when given shape to, is Realism. If, however, one dreams of an ideal World inhabited by fairies and gods then it will be building temples in the air. But we must cherish an ideal before we can think of the real.

The establishment of an United World Organization is a long-cherished ideal of mankind. So we must not depreciate the great ideal working at

the back of UNO as a mere product of hysterics. The ideal of the UNO is the building of a pure Socialistic World State, where alone peace can exist and which is the only alternative to barbarism and jungle mentality. We cannot just predict whether UNO will or will not attain this ideal but a good start heralds its success. *In fact, UNO is the only organization today between World Peace and World War.*

Today the U.N. is entering the fifth working year after its inauguration at San Francisco in June, 1945. The time is ripe for deciding whether it is worth while keeping U.N. alive or it is better to dissolve it and thereby to save money from budget-expenditure. Four years is a long time in human life especially when there is no remission for good conduct. History is strewn with the failure of attempts at International fellow-feeling, of which the UNO happens to be the latest in the list. They have all foundered on the same rock of sovereignty and UNO will be no exception. The meagre respect with which its decisions on such questions as Palestine and South West Africa have been treated by the States concerned; the growing tendency for making projects like the Marshall Plan for American aid to Europe ; failure to take even *a* first step towards setting up a World armed force ; and failure to take of all attempts at Russo-American fellow-feeling ; which is the sole aim of the UNO ; all these show that the process of decay has begun. In fact, men are born to die. Short-lived are the creations of God. Attempts end in failure—but can we even dream of a peaceful world without any International Organization to-day? That is precisely the question to be asked. The United Nations is not at all a World Government, nor is it a super-state. But it is the voluntary co-operation of sovereign states for the *foundation and promotion* of peace and security. So man aspires after peace to-day after a period of terrible violence of the last 25 years. That aspiration shows that U.N.O. may not be a failure. " Peace hath her victories, no less renowned than war." Indeed, the world is not yet ready for a world government. For certainly we will not accept a benevolent despotism in the world government. And if any world government comes into being to-day, it will be a world tyranny (under the United States). The preamble of the U.N. Charter begins with: "We the people of the world"—the very essence and ideal of World-community. The main function of the United Nations Organization is to consider, discuss and to make recommendations. So we should rather look upon the General Assembly as a platform of international propaganda. The UNO is really " the town meeting of the World. "

But the principal organ of the UNO is the Security Council consisting of 11 members, among whom 5 are permanent members (U.S.A., U.S.S.R., France, China and U.K.) and 6 non-permanent members, elected from the General Assembly for a fixed tenure of office. The permanent members or the so-called BIG FIVE in the Security retain a Veto power in the Council

so that any one of these five members, can exercise this power and can go against the will of all the rest. But even if the rigidity is to a much lower extent than that which was exercised in the Constitution of the League of Nations or in the " Liberum Vet " of Poland, the real flaw is that in the Security Council, the right of veto is under continual attack. And this narrowness of the conditions under which agreements must be reached gives rise to an inflexibility, which might well cause the total destruction of this system itself. But is it not a more realistic step in the context of the present world situation? It is a great precaution taken against the forming of groups among small member-states who are trying to ensure that their interests will be brought to the general attention if they attach themselves to one great power or another. The right of veto ensures on the other-hand that whatever decisions are taken will correspond to the willingness of the BIG FIVE to carry them out ; for, duties will mostly descend on Big Powers. The aim of UNO lies precisely in making it possible to unite these Big Powers of the world in every noble act—so that a fellow-feeling may gradually emerge to amity and World Peace is possible. A confederation can not rest on party system but it is possible through goodwill and brotherhood of the units or states. And if there were no disagreements in principles between different countries, there would be no need for any such all embracing body. And it will be an act of foolishness to surrender this veto power and thereby break up U.N.O. In that way peace can not be maintained.

In spite of this rigidity of constitution in the Security Council, the amount of success is no less than the amount of failure. The first success came in the Iran-Azarbaizan oil conflict in Greece. This matter was taken up by the U.N. and with a magical effect, the Americans gradually slipped away while the negotiation and investigation were still going on. Secondly, with the advice of the U.N. Security Council, British and French troops were withdrawn from Syria and Lebanon. In Greece, Bulgaria, Algeria and Yugoslavia, the guerilla warfare was also resisted with remarkable swiftness. But the case for Indonesia is an unqualified success and the trend of events in Kashmir and Palestine is also quite hopeful. Apart from all these, the fundamental virtue of the UNO (and it is a success too) is that though there are cases where its activities proved a failure yet the troubles were so localised as to prevent that danger of small conflicts, which gradually rise to war. Really, UNO is the global fire department and runs to the spot wherever a fire breaks out.

But the main objective of the UNO (at the back of peace, political and diplomatic security) is the abolition of economic and social barriers and the attainment of economic optimum and social equality, for which UNO makes ample provision. The Economic and Social Council is organized separately and is entrusted with these duties of employment, popula-

tion, food, trade, labour, health and refugee problem in the World. That international co-operation in these various social matters is a good thing nobody doubts. But the prospect of this Council is endangered by being linked artificially to the controversial discussion on political matters and thus this organization may be used as a tool for framing diplomatic policies, as was done by the grant of the Marshall aid to the war-devastated countries of Europe. But there is much to discuss about the success of its activies in various spheres which judge the merit of this institution.

The UNESCO is doing much for a cultural homogeneity between different countries of the world and we are proud to see our Sir Ramaswamy Mudaliar as the first President of that Council. The World Health Organization has contributed much to eradicating malaria in Egypt, Syria and Middle East and it has to do a lot in India for Malaria is the vital cause of poverty in our country. The Commission on human rights worked and helped much in the Children Emergency Fund under the chairmanship of Mrs. Roosevelt. The most acute crisis, of course, that faced the world after the World War II is economic rather than social. The hard fact that the world purchasing power is transferred to American hands, might have a disastrous effect on the National Economy of other countries in the world, had there been no U.N.O. It is the I.M.F. and the International Bank which have saved world from the crisis in international trade, superimposed by Inflation and Unemployment. Economically the world is moving towards the breakdown of national barriers. The formation of Benelux, the progress towards European customs union and the general agreement on the desirability of lowering tariff barriers are all illustrations of this tendency. After the devaluation of pound sterling and rupee, foreign trade might have absolutely collapsed in India and Great Britain due to lack of money if the I.M.F. were not there. Though India is not yet out from the chaos, export trade has risen much in Great Britain and the month of November is a record in her history during last 20 years. Conditions are likely to grow more favourable to the success of the UNO. The International Wheat Agreement was signed under the auspices of the F.A.O. It has also taken upon the problem of food in many other countries of the world.

Before concluding, I must emphasise the importance and contribution of the I.L.O. to keep down, to a certain extent, the labour unrest in the World today, which is the most important problem of our time. In fact, the greatest virtue of the U.N.O. is that it organises the world citizens in their non-political and non-sectarian aspect. Let us not underrate this tremendous achievement, for revolution breaks out from dissatisfaction to fulfil the economic needs of man and Peace can exist if the people remain economically well-off. This is the lesson of history that Economic pros-

perity is the first essential for peace and absence of war. Let the U.N.O. be triumphant not forgetting the Economic Council.

* * * * * * *

The cold war between groups of civilized countries of the World today gives to the U.N.O. the justification for its existence. For even if it is to be regarded as a failure yet one can not but admit its enormous contribution to removing a diplomatic stuffiness in the World and to keep the windows open for ventilation. People of the World can know each other as they come into close contact with each other and thereby the relation is becoming more and more intimate.

We should not mistake the legal symbol of the United Nations for social and political reality. World Community should be established before World Government, because the later stage of World Community may be World Government.

And in the future making of the World through U.N.O., if it is ever possible, India which boasts of her spiritual idealism can transform theory into practice. The great thing is that India should be independent but not neutral.

The Metaphysical School Of English Poetry

SANATKUMAR BHATTACHARJEE—*4th year Arts*

NO important literary change takes place overnight. The rise of the Metaphysical School of English poetry was, like other significant alterations in outlook, thought, and feeling, a gradual development. Literary movements are usually born like rivers. Men in after-ages can discern a moment when a new outlook or attitude has come to the fore-front, but it is not possible to determine precisely when several streams of influence united to form a movement. The Metaphysical School of Poetry was not an organized campaign. No committee drew up a set of principles to which the literary men were asked to subsribe. It was not a conscious school; in point of fact, there has never been a conscious literary school or movement in England. The one thing that can be said of the Metaphysical School as a whole is that it was a reaction, and a reaction is, in itself, negative.

The dawn of the seventeenth-century England presents an interesting spectacle to the students of literature. Good Queen Bess was dead, and the glorious Elizabethan literature was over. The ebb-tide of Renaissance had begun, and the spring of an outlook which appeals to reason was already bubbling. The poetry of the new age reacted against the imaginativeness of the Elizabethan age. Intellect instead of imagination prevailed in Metaphysical poetry. Till then reason had been a hand-maid of fancy; but now Reason herself was enthroned, diverting imagination from its course. The predominance of intellect and a tortuous imagination are the chief characteristics of Metaphysical Poetry.

Before we proceed further, the term "Metaphysical" must be clearly explained. Johnson took this term from Dryden and used it with a touch of derision in his *Lives of Poets*. We must not understand "Metaphysical" here in its strict philosophical sense. But it is not inappropriately used for the habit, common to this school of poets, of "always seeking to express something after something behind, the simple obvious first sense and suggestion of a subject." Johnson's explanation of the term is excellent. The Metaphysical poets, he wrote, "were men of learning, and to show their learning was their whole endeavour . . . . . They neither copied nature nor life . . . . . Their thoughts were often new, but seldom natural; they are not obvious, but neither are they just . . . . ." Here, in brief, the salient features of this curious school are clearly indicated.

The first impressions made by the Metaphysical poets are generally not very encouraging. Their poetry is often violent, harsh, cold, and obscure, filled with affectations and conceits. They turned from the honeyed sweetness of Elizabethan lyric poetry, and in their effort to surprise by novelty, they indulged in strange metaphors and far-fetched similes. Crashaw describes the eyes of the sorrowing Mary Magdalene as "two walking baths, two weeping motions." They cultivated ingenuity at any cost. Herbert ransacked art and nature—from the game of bowls to the strange properties of the orange tree—and worked them out in the fashion of emblem poetry. Yet the Metaphysical poets possessed real poetic power. Their disguise did not hide their genius.

The Metaphysical poets displayed the characteristic features of their writing in their love poetry. The traditional pattern of love poetry took new form in their hands. For the conventional phrases of the Elizabethan love lyrics they substituted realism; for honey, harshness. Like modern poetry, Metaphysical poetry lacked a poetic diction.

"My face in thine eye, thine in mine appears,"
Donne writes in *The Good-Morrow*.

"Where can we find two better hemispheres
Without sharp North, without declining West?"

The epithets are scientific in their exactness. Again, an illustration of the novelty of themes and tortuous imagination is Donne's *The Flea.*

> "It suck'd me first and now sucks thee
> And in this flea our two bloods mingled be."

Donne is generally called the father of the Metaphysical School: this is an indication of the gradual development of the school, for Donne lived a generation before those who are usually classed with him. Donne was the epitome of the new age. Questions of a restless and powerful imagination struggled with one another in the labyrinths of his baffled thought. His divided spirit was reflected in his poetry, written in colloquial language with complex rhythms and grotesque imagery. For pages together he indulged in puzzling riddles, then suddenly comes a passage quivering and shining as a living flame.

Donne's influence on the later generation was profound. A host of writers appeared after him trying to follow his boldness of style and fantastic ingenuities of thought. They inherited a great part of his intensity. Among them were the religious poets, Herbert, Vaughan and Crashaw. Crashaw was an unbalanced genius, his poems were irregular bursts of fancy. Herbert rarely failed, but his successes were never as great as those of the others. Vaughan's attitude was the most mystical, but sometimes he was dull. In Cowley's work we have the last productions of the Metaphysical School, the structure and conceits of his Pindaric odes encouraged the Metaphysical manner. The influences of the Metaphysical School were very widely spread among the poets of the age in general.

The Metaphysical School is generally believed to be an abortive movement. The Metaphysical poets' love of imagery for its own sake is said to be one of the causes of their failure. But toying with imagery may result in very beautiful things. The Metaphysical poets failed not because they toyed with imagery, but because they toyed with it frostily, they cut it in shapes with a pair of scissors.

Nevertheless the achievement of the Metaphysical School cannot be minimised. In one way, the Metaphysical poets extended the whole range of poetry. In this respect, modern poetry serves as an interesting parallel to Metaphysical poetry. The first World War came as a shock and turned the whole scale of values. Emotions lost their permanence; vague complex desires and "a heap of broken images" disturbed the unity of ideas. Poetry reflected this restless mood, this "mortal distraction." The absence of concentration in modern poetry is filled by variety and novelty. To the modern poet nothing is unnatural as a poetic theme. The modern poet does not want to surrender his reason to imagination. This predominence of intellect also characterised Metaphysical poetry. Thus the Metaphysical poets were, in some respects, the remote vanguards of the Modern Age.

A Week Of Historical Conferences At Delhi

PROF. CHARU CHANDRA DAS GUPTA, M.A., P.R.S., Ph.D. (*Cal.*), Ph.D. (*Cantab*)

DELHI with its changed environment after the attainment of independence (on the 15th August, 1947) saw a week of historical conferences during the Christmas holidays of 1948. The Silver Jubilee Session of the Indian Historical Records Commission and the annual meetings of the Indian History Congress, the Numismatic Society of India and the Museums Association of India were held at Delhi University from the 23rd to the 28th December.

I went to Delhi to attend particularly the annual meeting of the Indian History Congress as a representative of the Government of West Bengal and a delegate from the Presidency College. The delegates were housed in the newly-built St. Stephen's College. It is a magnificent structure amidst the lovely surroundings of lawns and gardens of unforgettable beauty and charm.

On the 23rd December there was the inauguration of the Indian Historical Records Commission. Pandit Nehru, Maulana Azad and high government officials were there. It was an imposing sight because here we found the leading historians of India as well as the cream of the intellectual and political circles of Delhi assembled together.

Sir Maurice Gwyer, Vice-Chancellor of the Delhi University presided on this occasion. He warmly welcomed Pandit Nehru and requested him to inaugurate the meeting. Pandit Nehru delivered an extempore speech for nearly half an hour on the study of history in the world-context. He said, that as an amateur he was overwhelmed in the presence of a multitude of experts; but he had an advantage over the learned professors of history in as much as he was able to see more of the wood whereas the experts concentrated more on trees. Defining history as a record of the onward march of humanity he pleaded for the study of history in a wider context of world events. He said that history was sometimes defined as a record of the martyrdom of man—a record of repeated crucifixions and resurrections. He supposed that ultimately all the problems of the world could be reduced to two or three sentences. They were problems of the relationship of the individual with other individuals or a group, and the relationship of one group with another group or groups. All problems—cultural, economic and political—could be brought within this definition.

History was, thus, a record of the blending processes which sought to bring nations and groups together as well as of the disruptive and fissiparous tendencies which went on at the same time. He said that we must emphasise the constructive aspects of history and events rather than the disruptive forces. He further said that, far from being a mere record of events, history must always be a record of the social progress and development of countries and of the world.

After the address of Pandit Nehru, Maulana Azad delivered an excellent speech in Hindusthani as President of the Indian Historical Records Commission. He read out his script, and a verbatim English translation of it was given to those who assembled there. The superb way in which he delivered the address impressed all. He said that the aim of history was to find out the truth about the past. He further said that the Indian Historian Records Commission had done valuable work in creating a new spirit of research and enquiry among Indian historians. He suggested that it would be a great service to the cause of historical research if we framed a programme of work for filling up the gaps in our knowledge of the history of India. He made a personal appeal for the collection of all family documents, sanads, firmans and ancient manuscripts for the national archives of India. He said that many things must be done to make our national archives perform their proper functions. Of these, the collection and perservation of records and manuscripts is perhaps the foremost. The second task is that of cataloguing and analysis of those records.

Then His Excellency, the Chinese Ambassador to India read a very learned paper on the Chinese sources of Indian history.

In the afternoon papers were read. The Indian Historical Records Commission published in advance two booklets, one, a list of papers which were read and the other, a summary of these papers.

On the 25th December we had the inaugural meeting of the eleventh Indian History Congress at the University Convocation Hall. There was a speech of welcome by Dr. S. N. Sen, Director of Archives of the Government of India. On behalf of the University of Delhi Sir Maurice Gwyer welcomed the delegates and also gave his own conception of history. He said that Mr. Lytton Strachey once observed that an historian, to be a good historian, required three things—industry to collect his materials, ability to arrange them and put them into shape, and lastly, to have a point of view; but that the point of view should not by any means, be the same as propaganda and that the one was not to be confused with the other. A propaganda is usually dishonest and almost invariably inaccurate; but a book of history need not be uninteresting because it is accurate and scholarly and if historians desired, as presumably they all do desire, that their books should be read not only by the narrow circle of scholars but also read and enjoyed by a much wider audience, their contributions to history

have got to be not only full of scholarship but also to be works of art. Dr. Rajandra Prasad was to have iuaugurated the meeting of the Indian History Congress; but on account of his unavoidable absence Sir Srinivasan Varadachariar, ex-Chief Justice of the Federal Court of India did it. He gave an interesting address on the concept of the secular state. He said that the danger which lay in the conception of a secular state being msi-understood and misapplied could not be under-estimated. This conception, as a negative ideal, dissociating the machinery of the state from active encouragement of any particular form of religion, might be unobjectionable; but to give it a positive interpretation in favour of encouraging the exclusively secular and materialistic outlook on life is fraught with dangers. The problem before those who were interested in historical study was twofold. The two aspects were moral and practical. The writings of sociologists had recognised the fact that the real source of insecurity to democratic culture lay in the loss of respect on the part of men for ethical standards. The new era in India was in a dangerous state The transition from a place of inferiority to that of equality or superiority was a serious period in the life of a nation. A proper study of history always had a healthy effect in a state like this. He gave a warning against reading only the history of one's own country and not of others also. That would lead to the growth of narrow nationalism.

Then Mahamahopadhyaya Prof. Datta Varman Potdar of Poona delivered his presidential address. He said that there was no doubt that history was a respectable branch of learining in ancient India. The historical tradition of ancient India became decadent in the later age of ancient India. Under the Muhammadans the study of history was revived. The real scientific study of history commenced with the coming of the Europeans into India. The Europeans led the way and we must remain ever indebted to them for their most precious work. As time rolled on, Indian scholars also came forward first slowly and individually and later on in large numbers and through corporate bodies. To bring together these workers scattered over a wide area and to co-ordinate their efforts the Indian History Congress was ushered into existence. He believed that no history properly so-called of any part of India could be written without an intensive and first-hand study of the original sources of the respective periods in the Indian languages concerned. He further thought that serious students of Indian history would have to be multi-lingual. In spite of outward disunity there is a fundamental unity throughout the whole of India. Under the British we became united in a variety of ways. He further suggested that history, as it is now understood, must be a history of the people as a whole.

On the 26th December we met again and the presidents of different sections delivered their addresses. The president of Section I, Dr. N. Datta

spoke on a number of problems in the field of ancient Indian culture. He said that according to some there was a great similarity between Proto-Elamite and Indus Valley scripts and that according to others the Indus Valley civilization was a distinct culture-zone. He opined that more excavaions were needed in India and that some scholars should be deputed abroad to study Sumerian and Elamite civilisations. So far as Buddhist studies were concerned, he said that there should be a compilation of Buddhist texts which were found outside India. He also advocated the foundation of a society for Jaina studies in India. He further said that research in ancient Indian geography was desirable and that there should be a central library of Indology and that there should be more co-operation between the Indian Archaeological Department and the educational institutions in India.

The president of Section II, Dr. D. C. Sircar said that the currents of Indian history could not be isolated from the rest of the world. Then he put forward a few suggestions with a view to raising the standard of historical investigation. He further stated that the proper reviewing of books in periodicals was undoubtedly the best way of maintaining the standard of research and also of raising it.

The president of Section III was Rev. Father H. Heras. His address mainly dealt with the political history of South India nd practically with the history of the Vijayanagar kingdom.

The president of Section IV, Dr. P. M. Joshi spoke about the idea of political unity from Aśoka to Pax Britannica. He felt that a systematic study of Muslim rule in Southern India was a long desideratum and that the kingdoms which grew out of the Bahamani kingdom needed to be studied.

The president of Section V, Dr. K. N. V. Sastri spoke on the foreign affairs of India from 1765 to 1947. He showed how laws of nationality, contact and nature affected the foreign policy of India in this period.

On the 27th December papers were read. The reading of papers in different sections was done simultaneously and it was, therefore, difficult to attend all the meetings. However there were a number of interesting papers and a list and summaries of these papers submitted to the Congress were printed in advance.

On the same day in the afternoon the annual meeting of the Numismatic Society of India was inaugurated by Dr. N. P. Chakravarty, Director-General of Archaeology in India. Then Dr. Unwalla delivered his presidential address on Sassanian coins.

There was also the annual meeting of the Museums Association of India. Maulana Azad while inaugurating this meeting made an appeal to people to take a keen interest in the country's arts and museums. He said that national education could not be complete if their national arts and museums were not properly maintained. He

regretted the inadequate arrangements for maintenance of museums in India and urged the necessity of sending experts to foreign countries to study their methods of maintenance of museums and art—treasures and then reorganise Indian museums on similar lines. He said that during the last 200 years of foreign rule a considerable amount of national wealth such as antiquities and pieces of art had been sent away from the country. It was necessary that a committee should be formed to prepare a list so that steps could be taken to recover them. Dr. H. Goetz, Director of the Baroda Museum and Picture Gallery in his presidential speech said that Indian museums could not expect strong government support at this time to transform them into really nation-building institutions because the national government had to concentrate its energies on more fundamental problems. As in other countries, support must be found from the public. He said that the public programme of Indian museums was out of date and thus reforms failed for lack of co-operation and administrative handicaps. Local type—collections could be built up in close collaboration with local research scholars and amateurs, and national and international type-collections by common planning and exchange.

The delegates were taken to the Red Fort and to Rajghat. They were also taken to the New Delhi Municipal Hall where an exhibition of records, manuscripts etc. were arranged by the Indian Historical Records Commission.

The exhibits were classified under two different categories, viz., official documents and unofficial manuscripts. In this exhibition we saw the following kinds of materials, viz., (1) Manuscripts on palm leaf and birch bark, (2) Firmans, parwanas, sanads etc., (3) Pre-British India: Persian manuscripts regarding general history, history of Timur, Pathan kings, Mughal kings, Afghans, Kashmir and the Punjab, (4) Records of the National Archives of India regarding political history, some important treaties, judicial and administrative institutions, early growth of the Indian press, western education in India, postal system and economic history, (5) Miscellaneous records, (6) Records lent by Madras Record Office, Bombay Record Office, State Record Department, Baroda, (7) Tagore Manuscripts lent by the Rabindra Bhavan, Viśvabhāratī, Śāntiniketan, (8) Records from the Constituent Assembly of India, (9) Documents relating to World War II lent by the Combined Inter-Services Historical Section, Simla, (10) Maps and Charts, (11) Paintings, (12) Types of repair work done in the preservation branch of National Archives of India and also (13) the Exhibition to Indian Art at Government House.

In 1947 an exhibition of select specimens of Indian art was held at the Royal Academy in London. When this exhibition was over, they were taken to Delhi and were shown there in the form of an exhibition at the Government House. They were arranged in the following manner:—

(1) Finds from the ancient Indus Valley (C. 3000-2000 B.C.), (2) Sculptures of Maurya, Sunga, Kushan, Gupta, early mediaeval (8th-10th century A.D.), and later mediaeval (11th-13th century A.D.) ages, (3) Terracottas, (4) Bronzes, (5) Western Indian, Rajasthani, Pahari, Orissan, Bengali, Mughal and Deccani paintings, (6) Textiles, (7) Minor antiquities and (8) Carpets.

Two receptions were given to the delegates, one by the Governor-General at the Government House and the other by the Vice-Chancellor at the University.

It was really a week of great intellectual enjoyment at Delhi, and we, the delegates enjoyed our stay at Delhi very much.

Farewell Address

[After years of great service to the Presidency College, Professor Somnath Maitra went on leave preparatory to retiment on August 3, 1949.

The professors, honours and post-graduate students of the English department met Prof. Maitra at a farewell function in Room No. 22 on September 3, 1949. The meeting was presided over by the Vice-Principal, Prof. S. C. Sarkar.

At the meeting, a farewell address was presented to Prof. Maitra on behalf of the students by Sanat Kumar Bhattacharjee. The speakers for the afternoon were Prof. T. N. Sen, Prof. S. K. Indra, Prof. Gaurinath Bhattacharya, Sudhindranath Gupta (on behalf of the ex-students of Prof. Maitra), Jogesh Bhattacharya (on behalf of the post-graduate students), Tarun Sircar (on behalf of the present students) and the President.

After Prof. Maitra had given his reply in Bengali, the function ended late in the evening.]

To

SOMNATH MAITRA,
Senior Professor of English,
Presidency College.

Sir,

It was with a shock that we learnt on the 4th of August of your sudden departure on leave preparatory to retirement. Coming so soon after the retirement of Dr. Sreekumar Banerji, your departure is a grievous loss to the English Department of this College and creates a void it would be difficult to fill. We regard ourselves as fortunate in that we could sit at your feet during the last few years of your stay in this College. The cultured grace of your English, the ease of your exposition, your fine sense of literary values, your beautiful readings, in themselves an interpretation: all

these will be for us most precious memories. We shall also remember with deep gratitude, the unfailing kindness and courtesy we have received at your hands, the generous assistance you have always given us in our difficulties, the solicitude you have always shown on our behalf.

Your presence on the staff has, for many years, imparted a tone to this Institution which would now be sadly missing. During all the years we have known you, we have seen you bear yourself with such an easy dignity, carry with and about you such an air of refinement, set such an example to others by your high sense of duty and responsibility, speak at our periodical meetings and functions to such effect and purpose, that we do feel, Sir, that this College will be distinctly the poorer by your absence.

As you go into retirement, permit us, Sir, to offer you our best wishes for your health, and long life, and prosperity. But you can never be distant from us. You will for ever remain our guide and master.

We remain,
Sir,
Your affectionate pupils,
Honours and Post-Graduate Classes
of Presidency College.

Presidency College,
September 3, 1949.

English Seminar

The literary and cultural activities of the English Seminar have been revived this session. At one of its meetings Miss Latika Ghose spoke on "Manmohan Ghose: Life and Poetry." At two other meetings papers were read on "Realism in Literature" by Sanat Kumar Bhattacharjee and on "The Inter-war Period in English Poetry" by Tarun Sircar. The Seminar is holding a series of Readings from English Literature to encourage the practice of reading aloud—so desirable a practice in a proper study of literature. A proposal to hold an English Recitation competition is under consideration. Two American Information Services Films on "The University of California" and "The Library of the Congress" were recently shown under the auspices of the Seminar.

A new method is being followed in conducting the Seminar meetings. Presided over by a student, each Seminar meeting is held in two sittings, one for reading the paper, the other, at an interval of a few days, for discussion. The level of discussion is thus sought to be raised by the participants being allowed a little time to think out. Participants are also enabled to express themselves freely by being allowed to speak and write in either English or Bengali or a mixture of the two.

The Seminar library possesses over two hundred books on loan from the College Library. We propose to add more.

The Seminar met Prof. Somnath Maitra, the retiring Head of the English Department and President of the Seminar, at a farewell function. Details of the function are given elsewhere. We remain grateful to him for the encouragement and guidance he gave us.

RAMENDRA NATH RAY
SANAT KUMAR BHATTACHARJEE
Joint Secys., Eng. Seminar.

January, 1950.

FAREWELL GATHERING

at the retirement of PROF. SOMNATH MAITRA as Head of the Department of English, September 3, 1949.

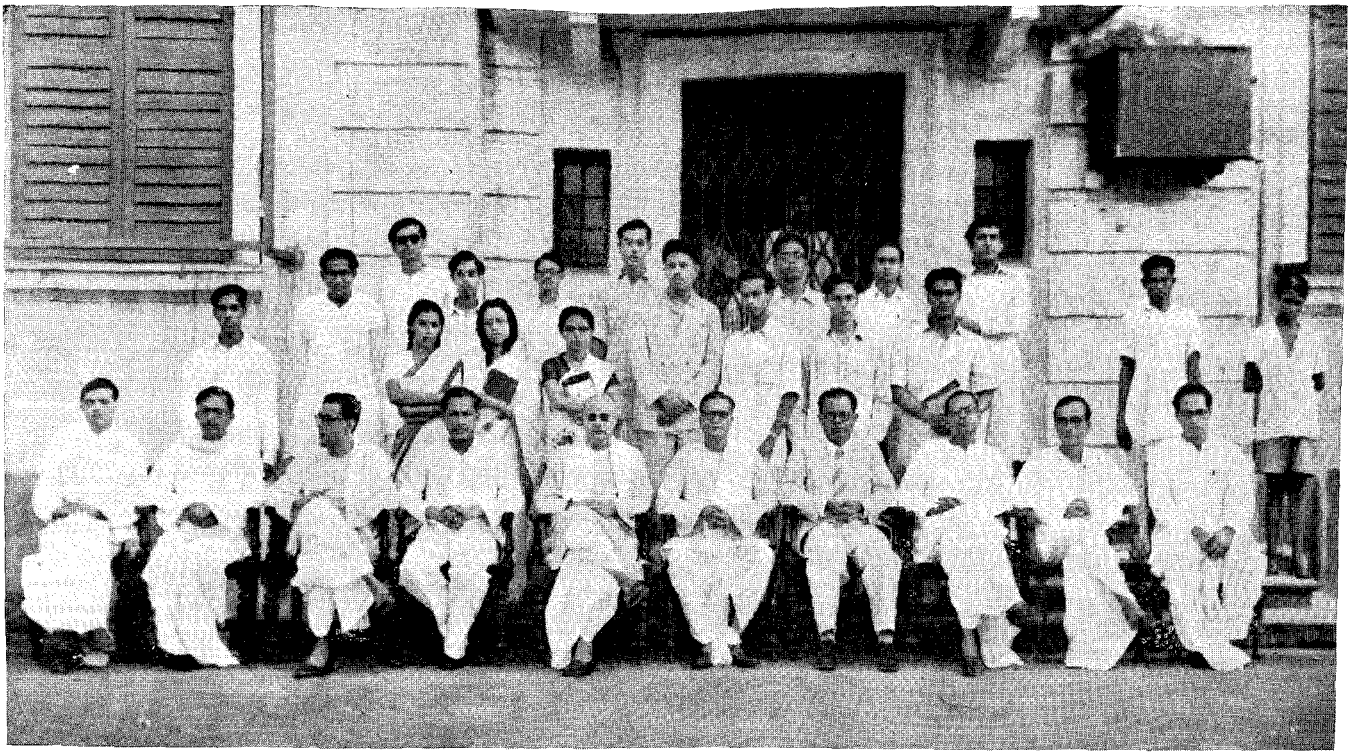

Row I (Sitting) L. to R : Prof. G. N. Bhattacharya, Dr. S. C. Sen Gupta, Prof. T. N. Sen, S. C. Sarkar, S. N. Maitra, T. P. Mukherji, S. K. *Indra*, K. P. *Das Gupta*, P. *Bagchi*, D. *Sen*.

Row II (Standing) L. to R : Sm. C. Saha, A De, L. Bose, Sj. S. Bhattacharya, K. Poddar, R. Ray, S. Bhattacharya.

Row III (Standing) L. to R : Sj. S. Gupta, A Das Gupta, D Lahiri Choudhury, D. Mustaphi, J. Bhattacharya, S. Sen, K. Bose, S. Mukherji, T. Sircar.

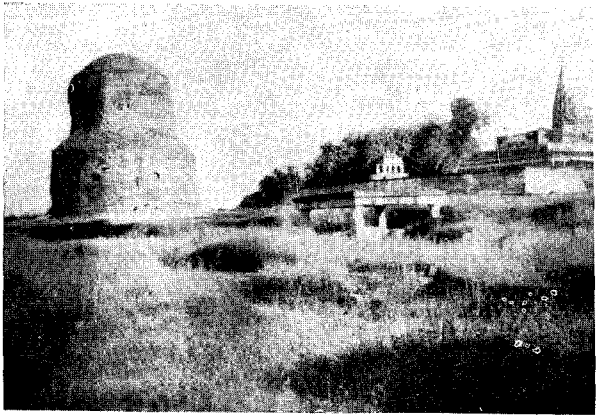

"সমাধিমন্দির এক ঠাঁই রহে চিরস্থির"

আলোক শিল্পী—
শ্রীনির্মাল্য মুখোপাধ্যায়
(চতুর্থ বর্ষ, বিজ্ঞান)

".....উত্তর-জোড়া তুষার-চূড়ায় খেয়ালী বিকেল
আগুন ছড়ায়।"
(বুদ্ধদেব বসু)

Reviews

SHAKESPEARIAN COMEDY: S. C. Sen Gupta. Oxford University Press. 18*s*. or Rs. 12/8.

In spite of the abundance of Shakespearian criticism Shakespearian comedy remains a subject to which full justice has not yet been done. No thorough and convincing study of the subject comparable to Bradley's monumental work on Shakespearian tragedy, has yet appeared, and even after going through all that has been written about Shakespeare's comedies one feels that the last word has yet to be said on the subject. A great critic like Coleridge can scarcely be said to have been as happy in his criticism of comedy as of tragedy, and perhaps the explanation may be found in the mental and temperamental limitations of the "subtle-souled psychologist." Lamb perhaps might have done the subject proper justice if he had stooped to formal theory and systematic criticism, but, as it is, Lamb remains a brilliant impressionist but not a theorist of the drama. Very fine things have also been said by other critics on the subject, noticeably by Priestley, Gordon and Charlton, but their works do not amount to a theory of Shakespearian comedy. Charlton has of course attenpted it as systematically as anybody, but, as he himself declares, he scarcely approaches the standard reached by Aristotle or even by Bradley in their studies of tragedy.

What is the explanation of this particular deficiency in criticism? If Shakes-tragedy has yielded to critical study, why does Shakespearian comedy remain yet unconquered? One explanation might be that the very spirit of comedy is one of protest against formularizing or, to quote a Bergosnion phrase, against mechanisation of life. For 'it is, as the air, invulnerable" and mocks our efforts to tie it down to a set formula or phrase. The scope of tragedy is narrower and more definable as tragedy means a frustration or repression of the free flow of life by antagonistic forces that surround it. These forces are—at least we feel them to be—more "mechanical", limited in character and function when compared to the spirit of man. At any-rate their relation to man is certainly more "mechanical" and better definable to our intellect, and it has not been found so elusive a pursuit to codify a theory of tragedy. Tragedy is closely connected with those human feelings which have a well-defined character unlike comedy which has more to do with what, for want of a better word, one might call "wit"—a thing so protean in nature as to defy all attempts to anatomise it.

Apart from the difficulty of formulating an adequate theory of comedy, there are special difficulties in the interpretation of Shakespearian comedy. It is practically *sui generis,* being really unlike classical comedy, unlike older English and contemporary Elizabethan and Jacobean comedy; it is unlike Moliere's, Congreve's or Shaw's comedy; it is even unlike Oriental types like the Sanskrit comedy. It is not farce, neither is it satire; it is not fantasy, romance or pastoral, though it has elements of all these. If it offers a criticism of life, that criticism follows a line of treatment different from what we have in Shakespeare's tragedies and histories. For both in his tragedies and in his histories Shakespeare keeps very close to the positive and realistic view of life though there might be a dominating comic element in some of his histories. But in comedies we have a different outlook on life altogether. It is Shakespeare looking at life through the other end of the telescope.

In comedy Shakespeare is "Fancy's child", how truly many critics fail to realise. To apply to comedy the canons of Shakespearian criticism based upon a study of Shakespearian tragedy, would be really misleading. For instance, Moulton's analysis of Shakespeare's dramatic art is not very helpful to our understanding of the appeal of a play like *The Tempest ;* it fails to take into account those elusive qualities that have evoked the rapturous admiration of a sympathetic mind like Sir Arthur Quiller-Couch's. Shakespearian comedy is not an "imitation of life" in the same sense as Shakespearian tragedy or history is. Shakespeare creates in his comedies a dome of many-coloured glass into which the white radiance of the truth of reality can enter only as broken lights. But on what principles does Shakespeare construct his dome? What particular aesthetic effect do these broken lights really seek to produce? Is there anything above and beyond the truth of reality that Shakespeare has here in view? And, lastly, is Shakespearian comedy an inferior or a superior form of Shakespearian art? These are some of the questions that remain yet to be properly tackled.

Professor S. C. Sen Gupta's *Shakespearian Comedy* is as serious an effort to understand the subject as any that has so far been made, and Dr. Sen Gupta deserves the gratitude of all students of Shakespeare for the stimulating study of a particularly difficult subject that he has placed in their hands. Dr. Sen Gupta has not in this volume included any detailed analysis of the art and technique of Shakespearian comedy, but so far as the essentials of the comic are concerned Dr. Sen Gupta has set about his task with remarkable insight, thoroughness and knowledge. He starts with an investigation into the nature of the comic and, after discussing the various authoritative views on the subject, seeks to offer his own explanation of the comic. According to Dr. Sen Gupta the comic implies a deviation from an accepted standard which involves an interplay between the real and the unreal. Though this definition may not be considered acceptable by all, it is certainly an ingenious suggestion that deserves a careful consideration. After enumerating the features of Elizabethan and Jacobean comedy outside Shakespeare Dr. Sen Gupta passes on to a study of the comic in Shakespeare. Dr. Sen Gupta rightly points out that Shakespeare's contributions to comedy include a synthesis of the various elements and vitalising of the characters. This, however, is no explanation of the distinctive quality of the Shakespearian comic. Trying to relate Shakespearian Comedy to his general theory of the comic, Dr. Sen Gupta opines that the distinctive feature of Shakespearian comedy is that here he "sets one attitude against another and shows how all approaches to life are equally living, but may be proved to be equally unreal". Perhaps these features are there in Shakespearian comedy, but we fear that in emphasising them Dr. Sen Gupta has missed the essence of the comic in Shakespeare in a strained effort to buttress his own theory of the comic. Pattern-weaving is not after all the thing that impresses and charms us most in Shakespeare's comedies, and Sir John Falstaff, whose character is so brilliantly discussed by Dr. Sen Gupta in the last chapter of his book, would interest us as he is, pattern or no pattern. Shakespear's philosophy of life in his comedies is, according to Dr. Sen Gupta, a philosophy of tolerance. But this "tolerance" deserves closer examination. Though Shakespeare shares this quality with writers like Chaucer and Fielding, he has a quality of tolerance that is above and beyond theirs. Perhaps Dr. Sen Gupta is guilty of a slight overstatement when he says that in comedies Shakespeare's vision expands into an all-inclusive and all-embracing view of life. Dr. Sen Gupta is usually so careful and conscientious in his statements that we did not expect his copy book to be tarnished by a touch of bardolatry.

Dr. Sen Gupta gives a series of brillant studies of Shakespeare's comedies in the subsequent chapters but their charm is due more to his sympathetic insight into

character and an imaginative appreciation of the world portrayed in Shakespeare's comedies than to any systematic philosophising in them. Happily, Dr. Sen Gupta is not always obsessed by philosophic theory, though he has a bias to it, and even those who demur to accept his theory of Shakespearian comedy would be benefited by going through the pages of this thoughtful and brilliant work.

A. D. M.

DEVALUATION: D. Ghosh. Price Annas Eight. p. 21.

DEVALUATION AND THE DOLLAR PROBLEM: Saroj Kumar Basu. Price Rupees Three. p. 69.

(*Khoj Parishad Publications*)

Seldom before have teachers of economics in the University of Calcutta been more intellectually alert than they are today. Indeed there are signs here of a distinct revival of intellectual interest in day-to-day economic problems and policies —a revival such as we have never seen since the days of the late Sir Jehangir Coyajee. The last decade, if we exclude the past few years, is almost a blank, save for some *seemingly important works, written more for dilettantes than for* serious students of affairs. Only in recent years is it beginning to be evident once again that our teachers of economics are fully alive to their quasi-public duties.

The crisis in international exchange following upon the simultaneous devaluation of a number of important currencies in terms of the American dollar has called out many economists of consequence to review the entire situation in relation to the new set of facts. The expression of contrary opinions here need not obscure our understanding, for it is quite possible to secure agreement on the question of the genesis and the nature of a problem even when opinions differ on the question of appropriateness (or uniqueness) of any one suggested solution. Once this is recognised, understanding becomes easy and examination of differences begins to be interesting.

It is thus that so long as Professors Ghosh and Basu are considering the dollar problem in retrospect, one will not part the company of the other. In discussions of the "dollar shortage" there is always some measure of common ground to be covered, because the ultimate frames of reference here are *facts*. But while Dr. Basu considers these facts in the light of evidence furnished by great many academic details, Prof. Ghosh does the same thing with comparative ease by directly relating the dollar problem to the two major economic factors, namely, the immense superiority of American mass production techniques in a wide range of products eagerly sought for in the modern world and also the much-neglected fact of high American tariffs. The popular purpose of Prof. Ghosh's pamphlet would not, however, allow him to go beyond the minimum of details, but then he is so blessed with a lively and critical intelligence that in passing on from one argument to another, he experiences, as it seems, not the least intellectual strain. His analysis of the nature and extent of the current international disequilibrium broaches this fundamental question: For countries in Western Europe, all committed to a policy of domestic full employment and anti-deflation, what possible way of escape is there—other than that by devaluation—from the ever-present danger of mounting foreign indebtedness? If during the war-years these countries have experienced adverse shifts in their cost and efficiency conditions at home and if, as a result, their domestic cost and price-structures have moved up to a position that

no longer justifies the maintenance of the pre-war rates of exchange with the dollar, the case for devaluation would seem much stronger than ever. Thus with Prof. Ghosh much depends on the starting point: If the national currency has been over-valued, devaluation is likely to mean that many products which could not previously be exported will move into the category of possible exports and thus help to restore equilibrium fairly quickly. But the optimism in this line of reasoning is born of an over-simplification which can best be pointed out in the words of Dr. Basu: "When the disequilibrium is of a structural character, a mere devaluation of currency will neither be a *speedy* nor a *decisive* solution. . . . When the volume of production is restricted by the country's inability to effect necessary structural changes, devaluation would have the effect of raising the domestic prices unnecessarily and aggravating latent inflationary forces without benefiting balance of payments position". One had hoped that Dr. Basu would not remain satisfied with the mere mentioning, as it were, of this and other mighty considerations, but, he chooses to observe reticence where clear formulations are called for. This, again, may indeed be the result of a sort of conscious self-restraint on his part, for, to pack inside the pages of a lean volume as many considerations of competing importance as a complete study would seem to warrant, is a task that can only be performed under conditions of deliberate intellectual restrictions. Yet his passing reflections have not been the less effective on that account—indeed they have their value in starting discussions and suggesting hypotheses—and the way in which he has warned us against cheap sentiments that sometimes pass of as arguments—gives to them a realism which is not much in evidence in other popular studies on the subject.

Prof. Ghosh, on the other hand, never forgetting for the moment that he is a pamphleteer addressing a wider public, would go only as far as logic would lead him. He considers the recent devaluation of the rupee in terms of the dollar as being nothing so much as a search for lost harmony—a harmony that is fundamental in the idea of purchasing power parities. In the case of India, this harmony, once it is achieved, makes for two things: first, it corrects a *technical* over-valuation of the rupee in terms of the dollar and secondly, it helps to preserve the traditional rupee-sterling link at the same old parity, thus securing to her advantages associated with each. It is the first set of advantages, supposed or real, about which Dr. Basu is frankly in doubt, and nothing is more convincing and penetrating than the way in which he proceeds to make his intuition seem almost true reason (e.g. "What is sauce for the British gander may not be sauce for the Indian goose.") It is here that his analysis transcends the narrow limits of a mere theoretical enquiry—the earlier chapters do indeed make for that presumption—and exhausts all possible considerations that could be included within its scope. The conclusions that it leads to are valuable apart from the way they are arrived at—because. in many cases, they constitute a challenge and a warning to official complacency. The same, however, cannot be said of Prof. Ghosh's conclusions which are, on the whole, more balanced but less documented. But whatever they are, it is difficult to detach them from his carefully enunciated premises. 'The ultimate solution of our balance of payments problem', he writes, 'lies in an increase of our efficiency' and 'the over-valuation of the rupee had been providing an undesigned protection to our industries and encouraging inefficiency'. One may question in the manner of Dr. Basu: Why rely upon magic remedies when structural rigidities stand in the way? But Prof. Ghosh is always looking to the future, without being unduly weighed down by what he calls "an immediate strain on our economy" because "in the long run it will do us good". There

is a wisdom here that is as rare as it is pleasant to encounter, all the pleasanter because it appears almost as *obiter dictum*. Without this wisdom and the optimism that goes with it we would miss the element that softens the grimness of criticism. The Khoj Parishad, Calcutta, deserves our thanks for placing before the public viewpoints which, because they are not identical, are eminently worth our attention.

DILIPKUMAR KAR.

THE TREND, Vol. I, No. 1, Editor: Dilipkumar Kar. Economics Seminar, University of Calcutta. 49 pp. Re. 1/-.

The Trend, Vol. I No. 1. is the first issue of a new economic journal sponsored by the Economics Seminar of the University of Calcutta It is a welcome sign of the times that our Post-graduate students have become serious enough to think of publishing a scientific journal on their own account for contributing to the formation of contemporary economic thinking. To the students and Professors of the Presidency College, it is a matter of special pride that the first Editor of this new experiment with scientific journalism happens also to be the Editor of the College Magazine.

Like most new-comers, *The Trend* makes its debut on the stage of scientific speculation by raising fundamental definitional, methodological and teleological issues. It also contains a number of review articles.

In his Editorial Note on "The Trends in Economic thinking" Mr. Kar has endeavoured to trace the operation of a dialectic process in the evolution of what may be described as *'bourgeois'* economic thinking and he finds in Keynesian Economics a partial fruition of a synthesis between the old *laisser-faire* individualism of the 19th century and the totalitarian economic systems associated with collectivistic economic thinking. But he does not appear to be satisfied with the type of synthesis achieved with the help of the new Keynesian technique of *macro*-dynamics (or, is it *macro*-statics?) A constructive intellectual synthesis, in his view, cannot be provided by an economic science working in 'neurotic' isolation. "It can only be secured by the organically united efforts of economics and political philosophy." While Marshall thought that the Mecca of the economist lies in economic biology rather than in economic mechanics, Mr. Kar thinks that the economist's ultimate salvation lies in economic philosophy. Mr. Kar's dissatisfaction with equilibrium analysis even of the *macro*-dynamic type is quite understandable. But what precisely does he mean by economic philosophy? Does he propose to go back to the original Smithian conception of Economics as "a branch of the science of a statesman or legislator"? In that event, how can he manage to retain the status of Economics as an independent discipline discovering universal, or at least general, laws in the economic affairs of mankind? Surely Economics can never hope to develop into an independent discipline, if it is tied to the apron-strings of a particular political philosophy. If mathematical economics is sterile, economic philosophy will be little more than a fashionable piece of dogma. We have, however, no difficulty in concurring with Mr. Kar's assertion that no constructive synthesis can be provided by an economic science working in 'neurotic' isolation. As Lord Keynes put

it, "the Master Economist must be a mathematician, historian, statesman and philosopher in some degree. . . . . He must be purposeful and disinterested in a single mood ; as aloof and incorruptible as an artist, yet sometimes as near the earth as a politician."

Mr. Amlan Dutt in his paper on " The Scope and Nature of Economics " has registered his protest against Robbins and his followers who propose to develop economics as a pure science on a purely amoral basis. A social science, he argues, can retain vitality, only if it does not tolerate long and continuous separation from the moral source of its inspiration and from the problems of policy-making. There is hardly any exponent of ' pure ' economics, including Robbins, who would hesitate to lend a helping hand to social navigators in search of a desired haven, but the real difficulty pointed out by Robbins, presented by the incomparability of inter-personal utility, remains unfortunately unsolved.

Mr. Dhruba N. Ghosh in his paper on ' Methodology in Economics ' has come to the conclusion that economic research should seek to find out the key positions of the social premises of economics. This is a much-needed warning to those modern economists who seem to believe that economic theory can only be developed with the help of formidable mathematical techniques like *Langrangean* multiplier or *Timbergenian* matrix. If Economics is to open up new frontiers of socially useful speculation, the boundaries between the different social sciences have to be broken down. The economic problems of mankind are so inextricably embedded in a mass of relationships which cut across purely economic considerations that the economist can play his appointed role in the installation of the welfare state of to-morrow only if he takes proper note of the whole social background of the economic reality

R. N. CHATTERJI.

OUR CONTEMPORARIES

The editor acknowledges with thanks the receipt of the following periodicals

Journal of the Geological Institute (Vol. XI. 1948-49), Presidency College, Calcutta.

St. Xavier's Magazine (two issues).

Scotish Church College Magazine.

Chaturanga (Edited by Humayun Z Kabir).

India—A monthly Review (Edited by Nihar Ranjan Roy)

Medinipur College Patrika.

Dacca College Patrika.

The Republic Day (Union Society)

Kidderpur Academy Patrika.

Serampore College Patrika.

The Trend Vol. I. No. I (Economics Seminar C. U.).